কিয়াকো জিঙশা

শৈলেন্দ্রবিজয় দাশগুপ্ত

উচ্চারণ

পরিবেশক

২/১. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

KRIYA YOGA JIJNASA

Sailendra Bijoy Dasgupta

প্রথম প্রকাশ / ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬

প্রকাশক / শ্রীযুক্তেশ্বর যোগ নিকেতন পক্ষে শৈলেন্দ্রবিজয় দাশগুপ্ত
৩১/৩২, সব্‌জি মহল, আর্দালী বাজার। বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

মুদ্রক / প্রভাসচন্দ্র অধিকারী / স্বপ্না প্রেস
৩৫/২/১এ বিডন স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

নিবেদন

অবশেষে বন্ধু, গুণগ্রাহী, শুভানুধ্যায়ী বহু মিত্রবর্গের আগ্রহ ও ইচ্ছা আজ ফলবতী হল; বাংলায় ক্রিয়াযোগ বিষয়ক গ্রন্থ "ক্রিয়াযোগ জিজ্ঞাসা" নাম নিয়ে ভূমিষ্ঠ হল। সন ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজী "ক্রিয়াযোগ ও স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর" (Kriyayoga and Swami Srijukteshwar) প্রকাশিত হওয়ার পর হতেই বাংলায় এরূপ একটি গ্রন্থ প্রণয়নের অনুরোধ বহু স্থান থেকেই পেয়ে এসেছি। কিন্তু এই বাসনা বাস্তবে পূর্ণ হবার ভরসা এতকাল হয়নি। প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বাধা অবশ্য বাংলায় লেখা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতনতা। তদুপরি পরিণত বয়সে কাগজ কলম নিয়ে ক্রিয়াযোগ জাতীয় গূঢ় বিষয় পাঠকের বোধগম্য করে প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়নি। বৎসরাধিক যাবৎ কতিপয় স্নেহভাজন যুবকের আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে কাগজ কলম নিয়ে বসতে বাধ্য হই। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে পরম-স্নেহভাজন শ্রীমান সাধনের নাম না করলে বিশেষ ত্রুটি তো হবেই, সত্যেরও অপলাপ হবে। প্রধানত তারই উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং নিরন্তর এই ব্যাপারে যাবতীয় সহায়তা এই কাজ সমাপনে সর্বাধিক কার্যকরী হয়েছে বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় বাধা ছিল আর্থিক। এই দুর্মূল্যের দিনে কাগজ এবং মুদ্রণ শুল্ক যখন অগ্নিমূল্য তখন নূতন পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা এক প্রকার বাতুলতা সদৃশ। তদুপরি বরাবরই শুনে আসছি বাঙালী পাঠক ইংরাজী পাঠকের মত নন; পাঠকের পরিধি সীমায়িত। অবশ্য বিগত কয়েক বৎসর বই মেলার খবর খুবই উৎসাহব্যঞ্জক বাংলা গ্রন্থকারদের পক্ষে। বাংলার পাঠক কেবল উদারই হননি, তাঁদের সর্ব বিষয়ে সত্য এবং গভীর তত্ত্বাবলী জানার বিশেষ আগ্রহ এই সব বই মেলার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত শুভ সংবাদ। বাঙালী যে ভাসমান থাকতে পছন্দ করছেন না, তত্ত্বান্বেষণা যে তাঁকে গভীরে আকর্ষণ করছে এ এক অতি আনন্দের সংবাদ। জাতি যে আবার উঠবে

তার সুনির্দিষ্ট সঙ্কেত। ৺ভগবানের তথা গুরুপরম্পরা আশীর্বাদই বলতে হয় যে আর্থিক সমস্যারও অযাচিত ভাবে সমাধান হয়ে যায়। কলকাতার "রাজগরিয়া চেরিটেবল ট্রাস্ট" স্বেচ্ছায় পুস্তক প্রকাশনের ভার গ্রহণ করে গ্রন্থকারের দায়িত্ব হাল্কা করে দিয়েছে। সব রকম ভাষায়—হিন্দি, বাংলা, ইংরাজী লিখিত সাংস্কৃতিক বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনে সহায়তা করে এই উদার প্রতিষ্ঠান সমাজের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয় সেবা করে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। মঙ্গলময় এবং শ্রীগুরুপরম্পরা এই ট্রাস্টের উদ্যোক্তাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধন করুন এই প্রার্থনা।

গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের নাম শুনলেই ভীত হবার কারণ নেই। বর্তমানের সামাজিক, রাজনৈতিক তথা অর্থ নৈতিক সমস্যাসঙ্কুল যুগে পাঠক সমুদায় নানা বিষয়ের অধ্যয়ন, আলোচনা, তর্ক, বিতর্কে অভ্যস্ত। কিন্তু একটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত না হলে সর্বপ্রচেষ্টা সুসফল হওয়া সম্ভব নয়। আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির গতি প্রকৃতির তত্ত্বালোচনা যতই হৃদয়গ্রাহী এবং চিত্তাকর্ষকই হোক না কেন, যে দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আকাশ পর্যবেক্ষিত হয় সে বিষয়কে উপেক্ষা করা চলে না। জাতির সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান প্রচেষ্টায়ও একই প্রকার যুক্তি প্রযোজ্য। জাতির প্রাচীন সংস্কৃতির কথারই উল্লেখ করছি। নব্য যুগে আমরা অনেক অগ্রগতি করেছি সন্দেহ নেই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি সামূহিক অগ্রগতি তথা সর্বজনের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রভাবিত ও সংগঠিত। সেই সংস্কৃতির বুনিয়াদ কি সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল না হলে সুষ্ঠু এবং যথাযথ অগ্রগতি সম্ভব নয়, তা ব্যক্তিগত জীবনেই হোক অথবা সমাজ জীবনে। ভারতের শাশ্বত বাণী সকলের মঙ্গল ও কল্যাণেচ্ছা বস্তুতঃ জাতির এক গভীর উপলব্ধির ফলশ্রুতি। প্রাতে গাত্রোত্থানের সময় তাই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার নিয়ম এই মৌলিক তত্ত্বোপলব্ধিরই পরিচায়ক।

"সর্বেষাং মঙ্গলংভূয়াৎ সর্বেসন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ।"

'সকলেরই মঙ্গল হোক, সকলে নিরাময় হোন, সকলেই যেন সুন্দর ও শ্রীমান দেখতে হন এবং কেউই যেন দুঃখী না হন', এই প্রার্থনা কেবল একটি শুষ্ক মনোবাঞ্ছাই নয়।

ভারতীয় তথা হিন্দু অধ্যাত্মবাদ জীবনকে বাদ দিয়ে সংগঠিত নয়, জীবন সমস্যা এড়িয়ে চলার পন্থা নয়—escapism নয়, সম্পূর্ণ জীবনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমুদায় মৌলিক শাস্ত্র পর্যালোচনা করলে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করেই হিন্দু সমাজে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম প্রচলিত হয়েছিল। বর্ণাশ্রমও গুণ ও কর্মগত রূপেই আদিতে বিভাজিত হয়েছিল; কিন্তু পরে সংস্কৃতির মূল বিস্মৃতির ফলে জাতিগত বিভাগ রূপে পর্যবসিত হয়ে যায়।

সামাজিক তথা অর্থনৈতিক কাঠামো চিরদিন অপরিবর্তিত থাকতে পারে না ; কালের পরিবর্তনের ফলে কাঠামোর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মৌলিক বুনিয়াদের পরিবর্তন হবে কেন ? হয়ও না। পরিবর্তে এক মিশ্রিত এবং ঠুনকো বুনিয়াদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।

যথাসম্ভব সুখে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করার ব্যবস্থাই সমাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। আমাদের ধর্মশাস্ত্রসমূহও এই মূল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছে অবশ্য সমকালীন পরিবেশের সঙ্গে তাল মিল রেখে। অধ্যাত্মজীবন সাধারণ সাংসারিক জীবনের পরিপন্থী ত নয়ই, বরং সুস্থ সবল জীবন যাপনের অনুপম কৌশল। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপ চতুবর্গের ফল লাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। জীবনের স্বাভাবিক ভাবে স্ফূরিত ক্ষুধা তৃষ্ণা রুদ্ধ করাকে, সর্বপ্রকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়াকে জীবনের লক্ষ্য প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি কখনও শ্রেয় বলে উপদেশ দেয়নি। পরন্তু সত্যিকারের ভোগের উপায়ই নির্ধারিত করেছে, বর্ণনা করে গেছে। ভোগ অর্থে আত্ম-তৃপ্তি, ইন্দ্রিয় দাসত্ব নয়—এই হল ভোগ বিষয়ে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। শাস্ত্রোক্তি উল্লেখ করলে কঠিন মনে হতে পারে, মনে হতে পারে চিন্তার বিলাস। পরন্তু ঈশোপনিষদের প্রসিদ্ধ বাণী "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা"—সর্বকালীন, সর্বস্তরের উপযোগী সুস্থ উপায় নির্দেশ। অনাসক্ত হয়ে ভোগ কর এই হল হিন্দু সংস্কৃতির শাশ্বত উপদেশ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও ঐ একই বাণী বহন করে আসছে—যোগস্থ হয়ে ভোগ করার সর্বযুগে প্রযোজ্য অমোঘ উপদেশ। গীতোপদেশের পরিবেশ পর্যালোচনা করলেও উপদেশের যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। তাৎকালিক ভারতের মহারণে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দুই বিপক্ষীয় বিপুল সৈন্য সমাবেশের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও মহাবীর অর্জুনকে বলছেন, "যোগস্থ কুরু কর্মত্বং"—তুমি যোগস্থ হয়ে কর্ম কর। কর্মত্যাগের উপদেশ নয়। এক মহাযোদ্ধার মহাপরীক্ষার সময় এই অপূর্ব উপদেশবাণী। ভগবদ্গীতাকে তাই "কর্মযোগ" বলা হয়। আবার যৌবন সায়াহ্নে ভোগের সমাপ্তি হলে, "দিল্লি কা লাড্ডু" খাওয়া হয়ে গেলে "জ্ঞানযোগ" এর উপদেশ দিলেন যা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে "উত্তর গীতায়" লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অন্তিম সময়ে যখন শরীর ত্যাগ করার সময় উপস্থিত তখন "লয় যোগের" উপদেশ দিয়ে শরীর ত্যাগের গুপ্ত কৌশল বিবৃত করে কি প্রকারে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তিন দেহই ত্যাগ করা যায় যাতে আর জন্মমৃত্যু লাঞ্ছিত পুনর্জন্ম পুনরায় না হয় তার উপদেশও প্রদান করেন।

প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরই ভারতের সুপ্রাচীন এই ঐতিহ্য বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। এর প্রভাব চিরন্তনী, সর্বদেশ ও সর্বজন প্রযোজ্য। ক্রিয়াযোগ সাধন পদ্ধতি এই ঐতিহ্যেরই উপায় বাহক। বর্তমানকালে ক্রিয়াযোগ প্রসারের আদিমূর্তি

বারাণসীর প্রসিদ্ধ মহাযোগী কাশী ঠাকুর যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিজ জীবন এই ঐতিহ্যের প্রকৃষ্ট প্রতিচ্ছবি। ত্রিকালদর্শী মহামুনি বাবাজী মহারাজ দ্বারা তিনি ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হন—তখন তিনি বিবাহিত, সংসারী, সরকারী কর্মচারী। সাধনার উচ্চতম শিখরে যখন প্রতিষ্ঠিত হন এবং শক্তিধর যোগী ও ক্রিয়া-যোগ গুরু রূপে যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখনও তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিবেষ্টিত ঘোর সংসারী। সংসারলীলা সংবরণ করে সজ্ঞানে যখন মরদেহ ত্যাগ করেন তখনও লোকচক্ষে সংসারীই থেকে গেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে বড়, ছোট, গৃহী, সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ স্থানীয় সর্বত্যাগী কত ব্যক্তি তাঁর স্পর্শ ও করুণা লাভ করে ধন্য হয়েছেন তার পূর্ণ হিসাব নেই। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর জীবন বৈদিক যুগের ঋষিদের জীবনের সমতুল্য ছিল। অধ্যাত্ম ভারতের এই এক অপূর্ব অবদান, অনুপম উদাহরণ।

গ্রন্থকারের এই সামান্য প্রচেষ্টা ঐ অলোকসামান্য মহাপুরুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি যা তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীমৎস্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী মারফৎ প্রাপ্ত এবং যেটুকু মাত্র হৃদয়ঙ্গম করার সামর্থ্য হয়েছে তা সাধারণ্যে পরিবেশন করার মানসে এই পুস্তক রচিত। তাঁদের গভীর এবং অমূল্য উপদেশ যথাযথ প্রকাশিত হয়েছে কিনা বলতে গ্রন্থকার অক্ষম—সহৃদয় পাঠকই তার মূল্যায়ন করবেন। পাঠকবর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা তাঁরা যেন একটু ধৈর্য সহকারে পুস্তকটি পাঠ করেন। ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু তথ্য নিশ্চয়ই লাভ করবেন।

এই নিবেদন শেষ করার পূর্বে এই পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ, উপদেশ ও সহায়তা করায় "উচ্চারণ" পুস্তক সংস্থার শ্রীরণজিৎ দেবের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন না করলে অন্যায় হবে। বস্তুতঃ তাঁর উৎসাহ ও সহায়তা না হলে এই পুস্তক এত শীঘ্র প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। সর্বশেষে শিল্পী শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্তকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর সুন্দর প্রচ্ছদপট অঙ্কন করে পুস্তকটির সৌন্দর্য পূর্ণ করার জন্য।

শৈলেন্দ্রবিজয় দাশগুপ্ত

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যুগে যুগে কত মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে এবং কত প্রকার ধর্মমত প্রচলিত হয়েছে তার হিসাব করা দুষ্কর। প্রতি ধর্মমতের উদ্দেশ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট আত্মার বা জীবাত্মার মুক্তিসাধন, দুঃখের চরম নিবৃত্তি এবং পরম শান্তিলাভ। প্রত্যেক মতবাদে ঐ লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, সাধনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়জয় এবং পরমাত্মায় আত্মার নিবিষ্টকরণ এইসকল পদ্ধতি দ্বারা সাধিত হয়—প্রতি ধর্মমতের এই হল প্রতিজ্ঞা। পরিদৃশ্যমান জগতের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক সামূহিক জ্ঞানলাভের দ্বারা এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় সকল শাস্ত্রেই এই কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। জ্ঞান পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ দুই প্রকার। এই জ্ঞানলাভের উপায়কে বিদ্যা বলা হয়। বিদ্যা পরা ও অপরা দুই রকমের। ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে অপরা বিদ্যা বলে ; এবং যে বিদ্যা দ্বারা পরমতত্ত্বে অধিষ্ঠান হয় তাকে পরা বিদ্যা বলে। ক্রিয়াযোগ তথা ক্রিয়া সেই প্রকার এক অতি সুপ্রাচীন গুপ্তবিদ্যা। বর্তমান সময়ে, বিগত শতাব্দীতে, কাশীধামে আবির্ভূত মহাশক্তিধর যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী প্রদর্শিত যোগসাধন প্রক্রিয়া ক্রিয়াযোগ নামে দেশে ও বিদেশে চিহ্নিত।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহে একমাত্র ঋষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে ক্রিয়াযোগ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এই দর্শনের প্রতিপাদ্য যোগ অবস্থা প্রাপ্তির উপায় বিশ্লেষণে সাধনপাদে প্রথম সূত্রেই ক্রিয়াযোগের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানরূপ কার্যই ক্রিয়াযোগ। তপস্যা শব্দে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, ক্লেশ, তাপ সহ্য করা বা তিতিক্ষা বোঝায় : স্বাধ্যায় শব্দে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান তথা শাস্ত্র অধ্যয়ন—সদ্‌গুরু উপদেশ শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন বলে ব্যক্ত হয়েছে। ঈশ্বরে বা পরমাত্মায় আত্মসমর্পণের নাম ঈশ্বর প্রণিধান। যোগ শব্দের সংজ্ঞা গ্রন্থের আরম্ভেই দেওয়া হয়েছে কিন্তু ক্রিয়া শব্দের পৃথক ব্যাখ্যা কোথাও নেই। অবশ্য তপস্যা,

স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান রূপ কার্যকে যদি ক্রিয়া শব্দের অর্থ ধরে নেওয়া যায় অন্য কথা। যোগীরাজ শ্যামাচরণ প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগ পরন্তু এক সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাযোগ্য বিশেষ পদ্ধতি। "ক্রিয়া" এবং "যোগ" এই দুই শব্দের সংযোগে ক্রিয়াযোগ শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং এই দুই শব্দের পৃথক পৃথক ভাবে মূল অর্থ অনুধাবন করলে ক্রিয়াযোগ শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি হওয়া সম্ভব। "যোগ" শব্দ বহুল ব্যবহৃত। সুতরাং যোগ শব্দের অর্থই প্রথমে বিচার করা যাক।

যোগ

ভারতীয় সাহিত্যে যোগ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ব্যবহার লৌকিক অর্থেও হয়, আধ্যাত্মিক অর্থেও। লৌকিক অর্থে ব্যবহারই অনেক প্রকার। যেমন—

লৌকিক অর্থে :

(১) এক বাহ্য বস্তুর সঙ্গে অন্য বাহ্য বস্তু সংযোগ করার নাম যোগ ;

(২) এক বস্তুতে অন্য বস্তু মিশ্রিত করার নাম যোগ ;

(৩) কার্যের কারণসমূহকে একত্রিত করার নাম যোগ ;

(৪) ছলনা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব গোপনপূর্বক কার্য সম্পাদনের নাম যোগ ;

(৫) শরীরকে সুস্থ ও সবল করার উপায় যোগ ;

(৬) কৌশলে কার্য হাসিল করার নাম যোগ ;

(৭) দুই বা ততোধিক বস্তুকে একত্রিত করে নূতন আকারের বস্তু প্রাপ্ত হওয়ার নাম যোগ। ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিক অর্থে :

(১) চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ ;

(২) বস্তু বা তত্ত্ববিষয়ক চিন্তাপ্রবাহ উত্থাপন করার নাম যোগ ;

(৩) চিত্তকে অথবা মনকে একাগ্রকরণের নাম যোগ ;

(৪) আত্মায় আত্মায় তথা আত্মা পরমাত্মার সংযোগের নাম যোগ।

শ্রীমৎ কালীবর বেদান্তবাগীশ তাঁর পাতঞ্জল যোগদর্শন গ্রন্থে তের প্রকার লৌকিক এবং চার প্রকার আধ্যাত্মিক প্রয়োগের উল্লেখ করেছেন।

লৌকিক অর্থে প্রয়োগের আদি উপদেষ্টা বলা হয়েছে পুরাণপ্রসিদ্ধ অসুরাচার্য উশনা, দেবগুরু বৃহস্পতি, দেবরাজ ইন্দ্র, পুনর্বসু প্রভৃতি। অধ্যাত্ম-যোগের আদি উপদেষ্টা হিরণ্যগর্ভ, মহেশ্বর, কপিল, পঞ্চশিখ মুনি, রাজর্ষি জনক, বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, যাজ্ঞ্যবল্ক্য, পতঞ্জলি প্রমুখ মুনিগণ।

পাতঞ্জল যোগসূত্রে যোগের সংজ্ঞা বলা হয়েছে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। যোগ শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে হলে সুতরাং জ্ঞাত হওয়া দরকার চিত্ত কি, চিত্তের বৃত্তি কাকে বলে এবং ঐ বৃত্তি নিরোধই বা কোন অবস্থাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এইসকল প্রশ্নের মীমাংসায় পতঞ্জলির পূর্বসুরী ভগবান কপিল মুনি কৃত সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবগতি প্রয়োজন। অনেক মনীষীর মতে পতঞ্জলি মুনি সাংখ্যকার কপিলের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। গবেষণা দ্বারা জানা যায় উভয়ের স্থিতিকালের দূরত্ব বা পার্থক্য দেড় শত বৎসরের। আপ্তপুরুষ মহাযোগী কপিলের পক্ষে এতাবদ্‌কাল জীবিত থাকা অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য মনে করার কারণ নেই। ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কপিলের সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যের পরেই পাতঞ্জল দর্শনের স্থান। এই উভয় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত।

সাংখ্যমতে পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে বিশ্বের সৃষ্টি; পুরুষ নির্বিকার—সৃষ্টি কার্যে কোনরূপ অংশগ্রহণ করে না। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী,—সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষ সন্নিধানে চৈতন্য উপহিত হওয়ার দরুন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়ে একে একে সৃজনকার্যের উপকরণের উদ্ভব হয়। সাম্যাবস্থার প্রথম বিকৃতির ফলস্বরূপ যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই মহৎ তত্ত্ব বা চিত্ত। চৈতন্য চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। চিত্তকে স্ফটিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্ফটিকের নিকটে যে কোন রংএর ফুল বা বস্তু স্থাপিত হলে স্ফটিক সেই রং-এ রঞ্জিত হয়; আবার উক্ত বস্তু বা পুষ্প অপসারিত হলে রংও বিদূরিত হয়। চিত্তের প্রকাশের পর বিকৃতি কার্যের ফলে পৃথক সত্তাবোধ প্রকাশ হয় যাকে অহংকারতত্ত্ব বলা হয়; অহংকার তত্ত্বাবস্থায় প্রকৃতি গুণান্বিত ভাব প্রকাশ করে এবং বুদ্ধি এবং মন প্রকটিত হয়। বুদ্ধিতত্ত্ব সত্ত্বগুণাত্মক প্রকাশধর্মী এবং মন তমোগুণাত্মক আবরণ-ধর্মী। মন, বুদ্ধি প্রকাশ হয়ে পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব হয় এবং বিস্ফুরিত এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি হতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র বা রূপ-রস-

শব্দ-স্পর্শ-গন্ধরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চ বিষয়ের প্রকাশ হয়। পঞ্চতন্মাত্র পুনঃ বিকৃত হয়ে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমাখ্য স্থূল বিশ্বের সৃষ্টি হয়। মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং চিত্তকে অন্তঃকরণ বলে। মন ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি এই কারণে মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বা অন্তরেন্দ্রিয়ও বলা হয়। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে সুখ. দুঃখরূপ যে অনুভূতি হয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার দ্বারা বাহিত হয়ে চিত্তে প্রতিফলিত হয় এবং চিত্ত সেই সুখদুঃখ রূপ রং-এ রঞ্জিত হয়ে যায়। পুরুষ বা চৈতন্য চিত্তে প্রতিবিম্বিত অবস্থায় চিত্তের সঙ্গে একাত্মরূপে প্রতিভাত হয়ে প্রতিফলিত সুখদুঃখরূপ ভোগের ভোক্তারূপে পরিগণিত হয়। প্রতিফলিত এইসকল অনুভূতিই চিত্তের বৃত্তি। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগঘটিত বৃত্তিসমূহের প্রবাহ রুদ্ধ হলে চিত্ত স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ থাকে এবং প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও দৃশ্যতঃ ভোগসম্পর্কছিন্ন হয়ে স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরই নাম চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ। সকল প্রকার যোগপ্রক্রিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য উল্লিখিত বিষয় সংযোগ প্রবাহ রুদ্ধ করা।

যোগ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য অবলম্বিত উপায়কেও যোগ নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ বহুপ্রকারের অধ্যাত্মযোগের নামে যোগ অবস্থা প্রাপ্তির বিভিন্ন উপায়কে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নাম উল্লেখ করা যায়। গীতা এক শ্রেষ্ঠ যোগশাস্ত্ররূপে গণ্য। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায়ের নাম এক একটা যোগ; প্রত্যেক অধ্যায়েই যোগাবস্থা প্রাপ্তির বিভিন্ন উপায়ের বর্ণনা আছে। পাতঞ্জল যোগসূত্রের মত এমন অনুপম সাধনশাস্ত্র ভারতে আর রচিত হয়নি। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নানা মতবাদ প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু আপন আপন তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য সকলকেই যোগের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এমন কি ব্রহ্মসূত্রে "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" সূত্রদ্বারা যোগদর্শনের তত্ত্বাংশ প্রত্যাখ্যাত হলেও সাধনাঙ্গ হিসাবে বেদান্তদর্শনে যোগ প্রত্যাখ্যাত হয়নি।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব হিন্দুর ধর্ম তথা ব্যবহারিক জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে। বহু সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে ও বাহ্যিকভাবে এইসকল তত্ত্বের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। যেমন নারী বা স্ত্রীলোককে বলা হয় "প্রকৃতি", অবশ্য পুরুষকে পুরুষই বলা হয় কারণ

তাত্ত্বিক পুরুষের সঙ্গে নামে পার্থক্য নেই। জগতকে বলা হয় বিশ্বপ্রপঞ্চ পঞ্চীকৃত মূল ভূতপঞ্চক। যোগীরাজের প্রধান শিষ্য স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী বাঙালী হিন্দুর বিবাহে শুভদৃষ্টি নামে প্রচলিত এক আচারের কথা উল্লেখ করে এই মতের পুষ্টি সাধন করে গেছেন। হাস্য, কৌতুক, নিষ্কলুষ আনন্দের এই আচারের মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত "যোগ" তত্ত্বের এক মনোমুগ্ধকর লৌকিক প্রকরণ।

বিবাহের বর যখন কন্যাগৃহে আগমন করেন, এবং যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের জন্য বিবাহ আসরে আনীত হন তখন তাঁকে এক উঁচু কাষ্ঠাসনে চৌকির উপর দণ্ডায়মান করান হয়। বস্ত্র দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত এবং দক্ষিণ হস্তে এক বড় যষ্টি ধরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর কন্যাকে পিঁড়িতে বসিয়ে পিঁড়িসহ যুবক আত্মীয়কুটুম্বগণ বরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করান সাতবার। প্রতিবার বরের সম্মুখে এসে পিঁড়িসহ কন্যাকে খানিকটা উঁচু করে ধরে বাহকগণ ঘোষণা করেন, "আমাদের কনে বরের চেয়ে বড়।" এইভাবে সাতপাক ঘোরা সাঙ্গ হবার পর পিঁড়িসহ কন্যাকে উঁচু করে বরের সম্মুখে ধরা হয়। বর ও কনের উপর এক বস্ত্রের আচ্ছাদন ধরা হয় এবং বরের মুখাবরণ অপসারণ করা হয়। মিত্র, বন্ধু, শ্যালক শ্যালিকা প্রভৃতির মহাকৌতুকের শুভদৃষ্টির সময় এখন। বর কনের চার চোখের প্রথম মিলনকে শুভদৃষ্টি বলে; এই সময় বরকে মাল্যদান করে কন্যা আত্মসমর্পণ করে।

এই আচার অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করা হয় যে সাধারণতঃ প্রকৃতি প্রবলা—(বরের চেয়ে কনে বড় ঘোষণা)—পরন্তু পুরুষকে দর্শনের পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুরুষে আত্মসমর্পণ করে—যার নাম যোগ। অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি উক্ত সামাজিক আচারের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

যোগের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা সম্বলিত পদ্ধতি বা মতবাদ বর্তমানে দেশে এবং বিদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। যেমন শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড যোগ (ইন্টিগ্রেল যোগ), মহর্ষি মহেশ যোগীর অতিন্দ্রিয় যোগ (ট্রান্সেণ্ডেণ্টেল যোগ), আচার্য রাজনীশের ছন্দযোগ (রিদ্‌মিক যোগ), শ্রীআইয়ারের কুণ্ডলিনী যোগ ইত্যাদি। বস্তুতঃ এইসকল বিভিন্ন যোগ নূতন কোন যোগের আবিষ্কার নয়। পূর্বোল্লিখিত শাস্ত্রবর্ণিত যোগের সঙ্গে মৌলিক কোন পার্থক্য

নেই। নূতন ভাষায় নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত সনাতন যোগকেই প্রকাশ করা হয়েছে। বরঞ্চ এর দ্বারা যোগ সহজবোধ্য, সহজলভ্য তো হয়ইনি, যোগ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা বর্ধিত হয়েছে।

যোগব্যায়াম পদ্ধতির সঙ্গে অধ্যাত্মযোগের কোন সঙ্গতি নেই। দেশে এবং বিদেশে বহু যোগাশ্রম স্থাপিত হয়ে যে যোগব্যায়াম শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে—অনেকেরই মনে হতে পারে যে ঐ ব্যায়ামই প্রকৃত যোগ। এ ধারণা নিতান্ত ভুল এবং এর নিরসন প্রয়োজন।

ক্রিয়া

ক্রিয়া শব্দে কাজ বা কর্ম বুঝায়। যদিও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই, ধরে নিতে পারা যায় যে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত সাধনপাদে বর্ণিত তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকেই "ক্রিয়া" বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা বর্তমান। গীতার একটি অধ্যায়েরই নামকরণ হয়েছে কর্মযোগ গীতায় বা অন্য কোন শাস্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে কোন কর্ম যোগাবস্থা প্রাপ্তির উপায় বলে বর্ণিত হয়নি, যদিও ফল ত্যাগরূপ কর্মদ্বারা যোগপথ প্রাপ্তির উপায় বলা হয়েছে। গীতার কর্মযোগ অধ্যায়ে কর্মকে ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত বলা হয়েছে, যে কারণে সকলপ্রকার যজ্ঞে ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বগত। (১) ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্মই মুক্তিপথের প্রকৃষ্ট উপায় বলে কথিত; কিন্তু কি সেই কর্ম প্রকৃষ্টরূপে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। যোগীরাজ শ্যামাচরণের মতে উপনিষদোক্ত "সুকৃত" ই প্রকৃতপ্রস্তাবে "ক্রিয়া", তৈত্তিরীয় উপনিষদের (২৪) মন্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে ॥"

সৃষ্টির পূর্বে এই নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ অব্যাকৃত—অপ্রকাশ ব্রহ্মরূপেই

(১) কর্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥"

ছিল। তিনি স্বয়ংই আত্মাকে বা নিজেকে সৃজন করলেন, প্রকাশিত হলেন। সেইজন্য একে সুকৃত বলা হয়।

ঐতরেয় উপনিষদে প্রথম মন্ত্রে পাওয়া যায় :

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন
মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥"

পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিল, স্পন্দনযুক্ত অন্যকিছুই ছিল না। তিনি ঈক্ষণ করলেন—অর্থাৎ অনিচ্ছার ইচ্ছা হল আমি লোক সৃষ্টি করব, বহু হব।

এই অনিচ্ছার ইচ্ছাই ক্রিয়া। গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে কর্মের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তদ্দ্বারা এই প্রকার কর্ম কি তার ধারণা হওয়া কিছুটা সম্ভব। বলা হয়েছে—ভূত ভাব উদ্ভবকারী বিসর্গকেই কর্ম বলা হয়। (১) শ্লোকে উক্ত হয়েছে পরব্রহ্মই অক্ষর, "স্ব" ভাব বা প্রকৃতিই অধ্যাত্ম এবং ভূতভাব সৃষ্টি-কারী বিসর্গঃ বা জীবোৎপাদক নাদব্রহ্ম বা প্রণবনাদই কর্ম। শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ প্রণব নাদের অভিব্যক্তিতে; সুতরাং উক্ত শ্লোকানুসারে ঈশ্বরবাচক প্রণবধ্বনিকেই বস্তুতঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বলা যায়। গীতায় উক্ত দুই শ্লোকে অভিব্যক্ত উপদেশকে একত্রে পর্যালোচনা করলে প্রতীতি হয় যে কর্ম, যজ্ঞ এবং ব্রহ্ম পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কোন কোন উপনিষদে স্পষ্টতঃই উক্ত হয়েছে প্রণবের দ্বারাই ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। প্রণবধ্বনি প্রকাশের ক্রিয়ারও বিবরণ পাওয়া যায়। গীতায় ঐরূপ প্রক্রিয়াকে যজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কয়েক প্রকারের যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে প্রাণায়াম যজ্ঞের নিয়ম স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে। প্রাণকে অপানে আহুতি দান এবং পুনঃ অপানকে প্রাণে আহুতি দানরূপ প্রক্রিয়াই প্রাণায়াম যজ্ঞ যদ্দ্বারা প্রাণ ও অপান উভয়ের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। (২) এই প্রাণায়াম প্রক্রিয়াই ক্রিয়াযোগীর সযত্নসাধিত "ক্রিয়া"; প্রাণকে অপানে এবং অপানকে প্রাণে আহুতি প্রদান ক্রিয়ার অতি গুহ্য কৌশল গুরুর

(১) "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবো অধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥

(২) "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে অপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতিরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।"

নিকট যা শিখতে হয়, প্রকাশ করার উপায় নেই। যোগীরাজ ঠাকুর শ্যামাচরণ প্রদর্শিত ক্রিয়া-পদ্ধতি এই শাস্ত্রীয় মৌলিক উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু এই প্রদর্শিত পদ্ধতির মধ্যে আরও কিছু তত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে; যেমন এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগধর্ম আবির্ভাবক চন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমা গতিরও অনুকরণ সমন্বয় করা হয়েছে। "ক্রিয়া" অনুষ্ঠানের দ্বারা উক্ত উভয় কার্যই যুগপৎ সংগঠিত হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে ব্রহ্মের অনিচ্ছারূপ ইচ্ছা যদ্দ্বারা সৃষ্টিকার্য সম্ভব হয় এবং যোগাবস্থা প্রাপ্তি দ্বারা মায়াবচ্ছিন্ন সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হবার অধ্যাত্ম সাধনায় প্রণব বা ওঁকার নাদ প্রকাশক প্রাণায়াম রূপ যজ্ঞ উভয়েই একার্থক এবং ক্রিয়া সংজ্ঞক।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী

যোগীরাজ শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগের উদ্ভাবক বা প্রবর্তক ছিলেন না; তিনি এই রহস্যবিদ্যা তাঁর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুরু মহামুনি বাবাজী মহারাজের নিকট লাভ করেছিলেন। বাবাজী মহারাজও এই অমূল্য সাধন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক সম্ভবতঃ ছিলেন না; তিনি তাঁর গুরুর নিকট হতেই এই বিদ্যা অধিগত করেছিলেন। অবশ্য অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পূর্বে তিনি এই ক্রিয়ালাভ করে থাকবেন; কারণ বাবাজী মহারাজের বর্তমান আয়ুষ্কাল পাঁচশত বর্ষেরও অধিক। বহু যুগ ধরে এই গুহ্য বিদ্যা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই গুপ্তভাবে কঠোরতপা যোগী, মুনিঋষিগণ দ্বারা সযত্নসেবিত হয়ে সাধারণের অন্তরালে প্রবাহিত ছিল। বিধাতার অমোঘ বিধানে, মহামুনি বাবাজী মহারাজের অপার করুণায় এবং সর্বোপরি দয়াল ঠাকুর যোগীরাজ শ্যামাচরণের অসীম দয়ায় আজ শ্রদ্ধাবান জনসাধারণের এই সুপ্রাচীন মহান্ যোগসাধন প্রক্রিয়া লাভের পথ সুগম হয়েছে। এক অভিনব পরিবেশে এবং এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে শ্যামাচরণ এই ক্রিয়াযোগ পদ্ধতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরই প্রবল ইচ্ছা এবং প্রার্থনায় বাবাজী মহারাজ এই সাধনপদ্ধতি অধ্যাত্ম সম্পদের অধিকারী আগ্রহী সাধারণ সংসারী নরনারীকে প্রদান করার অনুমতি দান করেছিলেন।

সমসাময়িক ভারতবর্ষে যোগীরাজ শ্যামাচরণ এক অসাধারণ জীবনের

নিদর্শন রেখে গেছেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই একমাত্র মহাপুরুষ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এই ধারণাই যখন দেশের সর্বত্র প্রচলিত সেই সময়ে আজীবন সংসারী এক গৃহস্থের পক্ষে সর্বোচ্চ মহাপুরুষের সম্মান লাভ যে এক অসাধারণ এবং অপূর্ব ঘটনা সন্দেহের অবকাশ রাখে না। যখন তিনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রীগুরুর শ্রীচরণে স্থান পান তখন তিনি বিবাহিত, সংসারী এবং সামান্য সরকারী কর্মচারী; সাধনার উচ্চশিখরে উপনীত হয়ে যখন শত শত আশ্রিত শিষ্যের আরাধ্য, গুরুরূপে পূজিত, তখনও তিনি গৃহী, সংসারী—কর্তব্যপরায়ণ স্বামী এবং পিতা এবং সুহৃৎ বন্ধুবৎসল বিশিষ্ট নাগরিক। পুত্রকন্যার জন্ম হয়েছে, তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং প্রাপ্ত বয়েসে বিবাহাদি দান করে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার যখন নরদেহ ত্যাগ করেন তখনও তাঁর আদর্শ গৃহস্থের রূপ। এই অদ্ভুত জীবনের বিষয় চিন্তা করলে কল্পনায় ভেসে ওঠে প্রাচীন ভারতের পর্ণকুটিরনিবাসী সর্বত্যাগী গৃহী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মূর্তি। সংসারের সমস্ত দায়িত্বই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্বাহ করে গেছেন, চাকুরীর সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন —কিন্তু কি জাগরণে কি বিশ্রাম সময়ে সর্বদাই পরমেশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পিত। তিনি নিজেকে সর্বনিয়ন্তা যন্ত্রীর হাতের এক যন্ত্ররূপে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য, সফলতা সেইখানেই। এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা কঠিন। প্রত্যহ সকালে গিন্নি মাতার প্রয়োজনীয় কাঁচা বাজার করার এক দায়িত্ব ছিল। যোগীরাজ নিজেই এই দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু কিভাবে? এই ঘটনায় তারই এক নিদর্শন পাওয়া যায়। মাতা ঠাকুরাণী সকালে বাজারের থলি এবং পয়সা স্বামীর হাতে দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিতেন। স্বামী দেবতাও থলি হাতে নিয়ে বাজার অভিমুখে যেতেন। বাজারে এক ফল বিক্রেতা ছিল; সে লাহিড়ী মশাইকে অত্যন্ত ভক্তি করত। তাঁকে দেখামাত্র দৌড়ে এসে হাত থেকে থলি ও পয়সা নিয়ে বাজারে গিয়ে সব বাজার করে দিত। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে কি কি দ্রব্য দরকার সে বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সকলপ্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় তরকারী এবং তৎসহ গিন্নিমার দোক্তাটি পর্যন্ত ক্রয় করতে ভুলত না। বাজার এনে অপেক্ষমান ঠাকুরের হাতে দিলে ঠাকুর সেটা বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতেন।

বাজার দেখে গিন্নি মা তো আত্মতৃপ্তিতে ও আনন্দে গদগদ। সবদিকে সুনজ এমন স্বামীর হাতে পড়ায় নিজের সৌভাগ্যের জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতেন তাঁর দোক্তাটির কথাও ভোলেননি! অথচ স্বামী দেবতাটি বাজার বাহকে কাজটুকু মাত্র করতেন, সদা আত্মসমাহিত শিবতুল্য পুরুষ। ভগবান ভক্তে জন্য যোগক্ষেম বহন করেন শাস্ত্রের এই প্রতিশ্রুতির এই নিত্য ঘটনাও যে প্রচারের প্রমাণ।

মহামুনি বাবাজী মহারাজের বিষয় অতি অল্পই জানা আছে। যদিও তাঁ বিষয়ে অনেক আজগুবি কাহিনী প্রচারিত হতে দেখা যায়—যার অধিকাংশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কোনপ্রকার মতলব হাসিল করার অভিপ্রায়ে কল্পিত গ্রন্থের শেষভাগে এই মহাশক্তিধর ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বক্তব প্রকাশ করা হয়েছে।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা জালাঙ্গী নদীর তটবর্তী ঘূর্ণি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গৌরমোহ লাহিড়ী সরকার এক নৈষ্ঠিক, সম্পন্ন এবং সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকর্ম এবং সৎ ও পবিত্র জীবনের জন্য এই অঞ্চলে লাহিড় সরকার বংশীয়দের অশেষ খ্যাতি ছিল। শ্যামাচরণ গৌরমোহনের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান ছিলেন। শৈশব থেকেই শ্যামাচরণের মধ্যে অবালকোচি স্থির সৌম্যভাব লক্ষিত হত; লাহিড়ী বংশের প্রতিষ্ঠিত ঘূর্ণির শিবমন্দিে অনেক সময় দেখা যেত খেলার সাথীদের ছেড়ে বালক শ্যামাচরণ অনেকক্ষ ধরে চোখ বুজে বিগ্রহের সামনে বসে আছে। কল্লোলিনী জালাঙ্গী কীর্তিনাশ পদ্মার ন্যায়ই মাঝে মাঝে দুকূল ভাসিয়ে সংহারলীলার সৃষ্টি করত। এব বৎসর এই নদী সেইরূপ এক ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে এবং লাহিড়ীদের বসত বাটীর কিছু অংশ সহ গ্রামের এক অংশ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শ্যামাচরণ তখন বালক মাত্র। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে পিতা গৌরমোহন সরকার সপরিবা কাশীধাম চলে যান এবং প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের গৃহে বাস করে থাকেন। সেই অবধি শ্যামাচরণ কাশীবাসী। ভূসম্পত্তির ব্যাপারে দু-একবা ঘূর্ণিতে এলেও পাকাপাকিভাবে কাশীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। কাশীধামে লেখাপড়া করেন; তখনকার নিয়মানুযায়ী স্কুলে হিন্দি, ফারসী, ইংরাজ

শিক্ষা করেন এবং গৃহে বাংলা শেখেন। সাধারণ সরকারী চাকুরী পাবার পক্ষে ঐ শিক্ষা যথেষ্ট ছিল। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁদেরই মত কাশীবাসী এক বাঙালী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কাশীমণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে সামরিক পূর্ত বিভাগে শ্যামাচরণের চাকুরী হয়। বেতনের যা ব্যবস্থা ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট। ইতিমধ্যে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। সংসার পরিচালনার গুরুভার তখন শ্যামাচরণের অনভ্যস্ত স্কন্ধে ন্যস্ত হয়।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে যখন শ্যামাচরণ ঐ পূর্তবিভাগে কর্মরত—এক অফিসের ভুলক্রমে তাঁকে উত্তর-প্রদেশের হিমালয়-সংলগ্ন রাণীখেতে সাময়িকভাবে বদলি করা হয়। এযাবৎ তিনি বিভিন্ন কেনটনমেণ্টে স্থানান্তরিত হলেও পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে হয়নি। কিন্তু এবার তাই ঘটল। তাঁকে একাই রাণীখেত যেতে হয়। রাণীখেতে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রস্তুত হচ্ছিল। সেকারণে গৃহাদি নির্মাণের কাজ চলছিল। অফিসের ঐ ভুল অবশ্য পরিশেষে কেবল শ্যামাচরণের জীবনেই নয় সারা বিশ্বের জনগণের এক পরম আশীর্বাদ —পরম সৌভাগ্যের রূপে পরিণত হয়।

রাণীখেত তখনও ভারতীয় রেলপথে সংযুক্ত হয়নি ; রেল, গরুর গাড়ি আদি বিভিন্ন রকমের পরিবহণের সাহায্যে শ্যামাচরণকে নূতন কর্মস্থলে পৌঁছাতে হয়। তাঁর অবস্থানের জন্য সাময়িক আবাসের ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে একটি ভৃত্যকে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেই তাঁর সাময়িক প্রবাসের যাবতীয় কাজকর্ম করত। অফিসের কাজকর্ম অতি অল্পই থাকত ; অধিক সময় নিজ আবাসে বিশ্রাম করেন এবং হিমালয়ের অপূর্ব শোভা দর্শন করেন কার্যতঃ। ক্রমে হিমালয় যেন তাঁকে আকর্ষণ করতে লাগল। শ্রমিকদের প্রশ্ন করে জানলেন যে পাহাড়ের উপর কিছু গুহাবাসী সাধুমহাত্মা থাকেন। একদিন ভাবলেন পাহাড়ে চড়ে সব দেখবেন ; এবং যেমন ভাবা মনে মনে স্থির করেন পরের দিনই পাহাড়ে চড়বেন। ভৃত্যটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে পরের দিন সকাল সকাল পাহাড়ের পথে যাত্রা করেন। গ্রামাঞ্চল পার হয়ে গ্রাম্য রাস্তা পার্বত্যদেশের চড়াই উৎরাইএর পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। ক্রমশঃ নির্জন প্রদেশে এসে পৌঁছলেন—গ্রামের বাড়িঘর লোকজন কিছুই আর দেখা যায় না ; পথও

আস্তে আস্তে অরণ্যের মধ্য দিয়ে প্রসারিত দেখা গেল। বনাঞ্চলে প্রবেশ করে গা যেন একটু ছম্ ছম্ করে উঠল, শ্বাপদ সঙ্কুলের ভয় হতে লাগল এবং বিশেষ ভয় লাগল এই ভেবে যদি বনচারী কাপালিকের মুখে পড়ে যান। সমগ্র উত্তরভারতে বিশেষ করে বন ও পাহাড় অঞ্চলে কাপালিকের সম্বন্ধে বহু সত্য অসত্য কাহিনী প্রচলিত ছিল। কাপালিক একজাতীয় সাধু—ভয়ঙ্কর সাধু যারা দলছুট কোন লোককে একান্তে বনজঙ্গলে দেখতে পেলে ধরে নিয়ে যায় এবং যথা সময়ে দেবীর সম্মুখে তাকে বলিদান করা হয় এই ছিল কিংবদন্তী। এই নির্জন অরণ্য প্রদেশে তিনিও তো হঠাৎ কাপালিকের হাতে পড়ে যেতে পারেন—এই ছিল মনে ভয়ের কারণ। অবশ্য অগ্রগতি বন্ধ করলেন না, এগিয়েই চললেন।

শ্যামাচরণের পথ তখন গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। হঠাৎ শুনতে পেলেন কোন লোক তাঁর নাম ধরে "শ্যামাচরণ শ্যামাচরণ" করে ডাকছে শুনেই তো ভয়ে শ্যামাচরণের চক্ষুস্থির; যে ভয় তিনি মনে মনে করছিলেন তা যেন সত্যে পরিণত হল। এই অজ্ঞাত বিদেশ বিভুঁই-এ তাঁর নাম কে বা কি করে জানতে পারল! এ নিশ্চয়ই কোন সন্ধানী কাপালিকের কাজ। কানে এখন আর আওয়াজ আসছে না, শ্যামাচরণ ভাবছেন ফিরে যাবেন কি? না কি এগিয়ে দেখা যাক কপালে কি আছে। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। আরও বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর পথের চড়াই শুরু হয়েছে দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। এমন সময় আবার সেই "শ্যামাচরণ শ্যামাচরণ" ডাক ভীত শ্যামাচরণ দেখতে লাগলেন। হঠাৎ দূরে চড়াইএর উপর দেখলেন এক সাধু তাঁর দিকে হস্ত প্রসারিত করে তাঁকে নিকটে যেতে আহ্বান করছে এবং মুখে "শ্যামাচরণ" ডাক। এখন তো আর সন্দেহের অবকাশ নেই: তিনি এখন কাপালিকের খপ্পরে। ভয়ে শরীর হিম হয়ে গেল। শরীরের লোম যেন খাড়া হয়ে উঠল। সমস্ত শরীর ভারী বোধ হতে লাগল। পা গতিরুদ্ধ। ভীত শ্যামাচরণ সাধুজীর দিকেই তাকিয়ে আছেন। অবশ্য তাঁর অজ্ঞাতেই যেন পা চলতে লাগল সামনের দিকে, শ্যামাচরণ কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে সাধুটিকে দেখছেন নিকটে যেতেই সাধু সস্নেহে প্রশ্ন করল, "কি শ্যামাচরণ, চিনতে পারছ? শ্যামাচরণ কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন—কিছুই জানেন না, কিছু

বুঝতে পারছেন না। অঙ্গুলি নির্দেশে সাধুটি তখন তাঁকে অনুসরণ করতে ইসারা করল। শ্যামাচরণও যন্ত্রের মত সাধুর পিছন পিছন চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর সাধু এক গুহায় প্রবেশ করল—শ্যামাচরণও। গুহার চতুর্দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে সাধুটি আবার জিজ্ঞাসা করল, "শ্যামাচরণ চিনতে পারছ ?" শ্যামাচরণের মুখে কোন কথা নেই ; কিছুই বুঝতে পারছেন না, কেবল চতুর্দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখছেন। শেষে গুহার এক কোণে একটি আসন, একটি কমণ্ডলু ও কয়েকটি কৌপিন দেখিয়ে পুনরায় সাধু জিজ্ঞাসা করেন, "কি শ্যামাচরণ, চিনতে পারছ ?" শ্যামাচরণ হতবুদ্ধি। কিছুই বুঝতে পারছেন না—কেবল চতুর্দিকে দেখছেন। এমন সময় সাধুটি নিকটে এসে শ্যামাচরণের মস্তকে নিজের হাত রাখলেন। বিদ্যুৎ চমকের মত যেন তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল ; তাঁর সবই স্মৃতিগোচর হল এবং তৎক্ষণাৎ সাধুটির চরণে পতিত হয়ে হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করতে লাগলেন। সাধু তাঁকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। এই সাধুটি হচ্ছেন শ্যামাচরণের পূর্বজন্মের পরাৎপর গুরু সর্বশক্তিধর পরমদয়াল বাবাজী মহারাজ। এ যে এক অকল্পনীয় অভূতপূর্ব মহামিলন ; কেবল শ্যামাচরণের জীবনেরই নয়—বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক পথ উন্মেষের পরম শুভলগ্ন।

বাবাজী মহারাজের মুখেই শ্যামাচরণ প্রথম জানতে পারেন যে তাঁর রাণীখেত আগমনের নির্দেশ অফিসের ভুলের জন্য সংঘটিত হয়েছে ; অপর এক সহকর্মীরই আসার কথা ছিল এবং তিনিই শীঘ্র আসবেন। শ্যামাচরণের বুঝতে দেরী হল না যে ঐ ভুল স্বাভাবিক ভুল নয় ; বাবাজী মহারাজের কৃপায় যোগশক্তি প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে। মনে মনে শ্যামাচরণ শঙ্কিত হলেন—হয়তো তাঁকে পরমদয়াল শ্রীগুরুর চরণ থেকে আবার দূরে চলে যেতে হবে। শ্যামাচরণ যথাবিধি ক্রিয়াযোগ দীক্ষায় দীক্ষিত হলেন। পূর্বজন্মে অর্জিত এবং সাধনায় লব্ধ অগ্রগতির ফলে ক্রিয়াযোগে উন্নতি তাঁর সহজে এবং ত্বরিতগতিতে আয়ত্ত হয়ে গেল। তিনি এখন সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসছেন।

রাণীখেতে কর্মস্থলে ফিরে এসে জানতে পারেন যে বাবাজী মহারাজ কথিত উপর অফিসের নির্দেশনামা এসে গেছে ; অপর লোক শীঘ্রই আসছেন তাঁর কার্যভার গ্রহণ করতে এবং তাঁকে তাঁর পূর্ব কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে। শ্যামাচরণ মনঃস্থির করে ফেললেন—ফিরে তিনি যাবেন না। চাকরী থাক আর যাক!

পরমকরুণাময় গুরুর কৃপায় যখন গুরুর সঙ্গে অভাবনীয় মিলন সম্ভব হয়েছে, তাঁকে তিনি কিছুতেই ছেড়ে যাবেন না। পরদিন বাবাজী মহারাজের কাছে গিয়ে অফিসের প্রাপ্ত শেষ সংবাদ জানিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা নিবেদন করেন। তিনি কিছুতেই শ্রীগুরুকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। সস্নেহে বাবাজী মহারাজ উত্তর দিলেন, "সে হয় না বেটা ; তোমাকে ফিরে যেতে হবে।" কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। শ্যামাচরণ ফিরে যেতে নারাজ। এই নিয়ে সর্বজ্ঞগুরু এবং প্রিয় শিষ্যের মধ্যে অনেক মান-অভিমানের পালা হল। অবশেষে শ্রীগুরুর অভিপ্রায় অনুধাবন করে ফিরে যেতে শ্যামাচরণ সম্মত হলেন। পরন্তু দুই শর্ত সাপেক্ষে। প্রথম শর্ত হল প্রয়োজনবোধে যখন শ্যামাচরণ স্মরণ করবেন গুরুদেবকে এসে দর্শন দিতে হবে। গুরুদেব বিনা আপত্তিতে এই শর্ত মেনে নেন। দ্বিতীয় শর্ত হল যে অমূল্য সাধন-ধন কৃপা করে তাঁকে দান করেছেন অনুমতি হোক তিনি যেন সংসারে ত্রিতাপে তাপিত নরনারীকে সেই সাধন দান করতে পারেন। গুরুজী এই শর্তের ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন দেহমনের সাধ্যের কথা ছেড়ে দিলেও সংসারের সাধারণ মানুষ এই গভীর সাধনপদ্ধতির মর্ম বুঝতে পারবে না। ফলে সুফল তো পাবেই না উপরন্তু এই মহামূল্য ধন উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। শ্যামাচরণ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তিনি ধরে বসলেন জগতের মঙ্গলের জন্যেই গুরুদেবের এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নতুবা এই দুঃখী নরনারী কোথায় যাবে। তিনিই কেবল এই সাধনরত্ন পেলে কি হবে ; সাথী নরনারীর তো কোন লাভ হবে না। গুরুজী খানিক চিন্তা করে প্রিয় শিষ্যের আন্তরিক অনুরোধে বললেন, "দিতে পার যদি তার বিনিময়ে সাধনপ্রার্থী তার সর্বস্ব দান করতে স্বীকৃত হয়।" শ্যামাচরণ প্রতিবাদ করেন, "গুরুদেব, ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে এও কি সম্ভব! করুণা করুন গুরুদেব ; শর্ত শিথিল করুন।" অতঃপর দর কষাকষির পর বললেন, "ঠিক আছে, দিতে পার যদি দেখ প্রার্থীর মৌলিক অধ্যাত্ম সম্পদ বিদ্যমান এবং ক্রিয়াসাধন পাবার অত্যন্ত আগ্রহ। তবে কিছু দানের কথা যে হয়েছে—প্রার্থীকে প্রায়শ্চিত্তের দক্ষিণাস্বরূপ পাঁচ টাকা দিতে হবে ; সেই টাকা তুমি ব্যবহার করতে পারবে না, আমিই কোন সময় এসে নিয়ে যাব।" সর্বস্ব দানের আদেশটি প্রিয় শিষ্যের আন্তরিক অনুরোধ ও প্রার্থনায় দয়ালগুরু পরিমাণ কমিয়ে পাঁচ টাকায়

ংসা করতে রাজী হলেন। শ্যামাচরণ সানন্দে গুরুর আজ্ঞা লাভ করে পূর্ব স্থলে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। গিরিকন্দর গুহাবাসী কঠোরতপা গী মুনিগণের সযত্নসেবিত গুপ্ত সাধনপদ্ধতির সাধারণ মানুষের প্রাপ্তির াগের এই হল মূল তথ্য। দয়াল ঠাকুর যোগীরাজ শ্যামাচরণের সংসারের ারণ জীবের প্রতি অতি অশেষ করুণা না হলে এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবাজী রাজের কৃপা না হলে ক্রিয়াযোগ সাধনপদ্ধতি আজও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ই গিরিগহ্বরেই নিবদ্ধ থাকত।

শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করে এবং আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে শ্যামাচরণ নিজ পূর্ব স্থলে ফিরে আসেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সহকর্মী দেখলেন সেই মাচরণই তো ফিরে এসেছে। কিন্তু তার জীবনে কি মহান পরিবর্তন সাধিত ছে তার খবর কেউ জানলে না। প্রচারবিমুখ শ্যামাচরণ অধ্যাত্ম অনু- ভর সূত্র অতি গোপন রাখতেন, সাধন প্রক্রিয়া গোপনেই করতেন। নকি নিজের স্ত্রীও জানতে পারেননি স্বামী দেবতাটি অল্পদিনেই সমর্থ যোগী াপুরুষে উন্নীত হয়ে গেছেন। কিন্তু অধ্যাত্ম বৈভব কতদিন গোপন থাকে? প প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাচরণও অধিকদিন গুপ্ত থাকতে পারেননি। তাঁর অধ্যাত্মজীবনের ারভও ক্রমশঃ প্রকাশ হয়ে পড়ল। অধ্যাত্মপিপাসু নরনারী তাঁর কাছে ক একে আসতে শুরু করেন এবং তাঁর আশ্রয়লাভে ধন্য হন। ক্রিয়াদান য়ে শ্যামাচরণ জাতি, ধর্ম, স্ত্রীপুরুষ, সমাজের উচ্চস্তর নিচুস্তর কিছুরই র্থক্য করতেন না। তাঁর প্রথমদিকের ক্রিয়াযোগ শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন চ অফিসের সাধারণ পিওনও; তিনি পরে খুব উন্নত মহাসাধক যোগীতে রিণত হন এবং সকলে তাঁকে বৃন্দা ভকত বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। প্রায় রক্ষর এই ক্রিয়াযোগী পরিণত বয়সে যখন শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করতেন সর্ব- মান্য পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হয়ে যেতেন। অপর দিকে কাশীনরেশ ঈশ্বরীনারায়ণ ংহ এবং তদীয় পুত্রও ক্রিয়াদীক্ষায় দীক্ষিত হন। উচ্চবর্ণের হিন্দু যেমন লেন আব্দুল গফুর নামের এক মুসলমান মহাত্মাও ক্রিয়াযোগী শিষ্য হয়ে- লেন। অনেক মহিলাও ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গোপন- ভাব শ্যামাচরণের বিভিন্ন কৃপাদানের সব খবর হয়তো পাওয়াও যায়নি।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ শিষ্যদের গোপনে বিনা আড়ম্বরে ক্রিয়াযো সাধনের উপদেশ দিতেন। শিষ্যগণও শ্রীগুরুর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে চেষ্টা করতেন। শোনা যায় একই পাড়ার প্রতিবেশী দুই গুরুভ্রাতা প্রায় বি বৎসর কাল একই গুরুর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও উভয়েই জানতেন না যে তাঁ একই গুরুর চরণাশ্রিত। যখন তিনি পরাৎপর গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত তাঁর জানতেন না যে কত বড় মহাপুরুষের তিনি সহধর্মিণী। শোনা যায় একরাে একই শয্যায় উভয়ে শায়িত। অধিক রাত্রে ঘুম ভাঙলে দেখতে পান স্বামী দেহ শূন্যে শায়িত। ভয়ে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। পরদিন ভো প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে স্বামীকে যখন প্রণাম করেন যোগীরাজ প্র করেন, "কাল রাত্রে তুমি কিছু দেখতে পেয়েছিলে? স্ত্রী অধোমুখে নী রইলেন। তখন যোগীরাজ বলেন, "তোমাকে আজ ক্রিয়া দীক্ষা দেব।" তাঁ অনেক সমর্থ যোগী শিষ্য ছিলেন। সকলের নাম পাওয়া গেছে কিনা সন্দেহ নিম্নে কয়েকজন প্রধান শিষ্যের নাম প্রদত্ত হল যাঁরা প্রত্যেকে ক্রিয়া দীক্ষা দানের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং শত শত নরনারীকে ক্রিয়াযোে দীক্ষিত করেছিলেন, এবং ক্রিয়াযোগ প্রসারে সহায়তা করে গেছেন।

যোগীরাজের প্রধান শিষ্যগণ

আচার্য পঞ্চানন ভট্টাচার্যের নাম প্রথমেই স্মরণ হয়। তিনিই সম্ভব প্রথম শিষ্য যাঁকে যোগীরাজ ক্রিয়া দীক্ষা দানের অনুমতি প্রদান করেন তিনি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক বংশের সন্তান ছিলেন। কলকাতার আর্য মিশ ইনস্টিটিউট স্থাপন করে ভারতের সনাতন ধর্মের মহিমা প্রচার এবং যোগীরা প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগ জাতিধর্মনির্বিশেষে শত শত নরনারীকে দান ক ক্রিয়াযোগ প্রসারে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। পরজীবনে তিনি বিহারে বৈদ্যনাথ ধামে দেওঘরে বাস করেন। ভক্তরা যোগীরাজকে যেমন কাশী ঠাকুর বলতেন, আচার্য পঞ্চাননকে দেওঘরের ঠাকুর বলতেন।

(২) ব্রহ্মচারী কেশবানন্দ পরমহংস: উত্তর ভারতে, বিশেষ করে বৃন্দাবনে এবং ঋষিকেশের প্রসিদ্ধ যোগী মহাপুরুষ। বহু লোকের ক্রিয়াযোগ ও ছিলেন। দীর্ঘ জটাজুটধারী বিশালদেহী এই মহাপুরুষকে দেখে অনেকে

পাঞ্জাবের লোক ভাবতেন ; তাঁর বৃন্দাবন ও ঋষিকেশে স্থাপিত কাত্যায়নী মন্দিরে অধিকাংশ যোগী সাধুই পশ্চিমদেশীয় ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি বাঙালী ছিলেন এবং হাওড়া জেলার এক গ্রামে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁর জন্ম। যোগীরাজ লাহিড়ী বাবার তিনি অতি প্রিয় ছিলেন। যোগীরাজের পার্থিব জীবনের অন্তিম দিনে গুরুর সেবা করে সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

(৩) পরমহংস স্বামী প্রণবানন্দ গিরি ঃ বাংলার হুগলী জেলায় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। প্রথম জীবনে তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন ; পরে যোগীরাজের চরণে আশ্রয় পেয়ে—কৃতার্থ হয়েছিলেন। বাংলা, উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের বহু স্থান ভ্রমণ করে বহু নরনারীকে ক্রিয়া দীক্ষা দান করেন। উদয়পুরের মহারাণা তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং মহারাণার আগ্রহে কয়েক বৎসর উদয়পুরে বাস করেন।

বস্তুতঃ উদয়পুরে থাকাকালে পরমারাধ্য গুরুদেব লাহিড়ী মশাই দেহত্যাগ করেন। এই বিষয়ে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল। উদয়পুরে খবর পান যে গুরুদেব কঠিন রোগশয্যায়। ব্যস্ত হয়ে পরদিন কাশীধাম যাত্রা করছেন। হঠাৎ লাহিড়ী বাবার অশরীরী মূর্তি সামনে এসে বললেন, "আর তাড়া কেন, সব শেষ হয়ে গেছে।" মহারাণার কাশীধামস্থ রাণা মহলে শেষজীবন অতিবাহিত করেন এবং প্রণবাশ্রম স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ "প্রণবগীতা" স্বামীজী প্রণীত এবং তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি দ্বারা প্রকাশিত।

(৪) আচার্য আশুতোষ শাস্ত্রী (হংসস্বামী কেবলানন্দ মহারাজ) ঃ খুলনা জেলার নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসেন। বিদ্যাসাগরের মতই পরম মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি লাহোরের শাস্ত্রী উপাধী লাভ করেছিলেন। লাহোরের শাস্ত্রী পরীক্ষা সেই সময় খুব কঠিন ছিল। এই উপাধি লাভ করায় বিদ্বৎসমাজে শাস্ত্রীমশাই বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। যোগীরাজের অতন্ত প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং প্রায় আট বৎসরকাল কাশীধামে যোগীরাজের সঙ্গেই বাস করেন। ক্রিয়াযোগে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। এক সময় তিনি পরমহংস যোগানন্দের গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং শাস্ত্রীমশাইয়ের কাছেই যোগানন্দজীর ক্রিয়াযোগের প্রথম পরিচয়।

যোগানন্দজী যখন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন শাস্ত্রী মশাইকেই আশ্রমের ধর্মাচার্য নিযুক্ত করেন। আশ্রমে কি আচার্য, শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থী ছাত্র সকলেই অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। তাঁর প্রভাবে সারা আশ্রমে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হত। বয়োপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষার্থীকে ঐ সময় বা পরে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেন। শাস্ত্রী মশাইয়ের মত অমায়িক, নিরহংকার, নির্লোভ, অর্থ ও পদবিমুখ যোগী মহাসাধক বিরল। হঠযোগে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মূত্রদ্বার দিয়ে ঘৃত আকর্ষণ দেখে কাশিমবাজার অধিপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।

(৫) আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল : যোগীরাজের বয়োকনিষ্ঠ শিষ্যদের মধ্যে আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ একজন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি দীক্ষিত হন তাঁর আদর্শ চরিত্র, মধুর ব্যবহার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। শান্তিনিকেতনের সকলে তাঁকে মাস্টারমশাই বলতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। মাস্টারমশাই বললে তাঁকেই সকলে বুঝত। কবিগুরু তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতেন। শান্তিনিকেতন ছেড়ে এলেও উভয়ের সম্পর্ক পূর্বের ন্যায়ই ঘনিষ্ঠ এবং মধুর ছিল। সান্যাল মশাই বহু নরনারীকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেন। পুরীধামে ও বিন্ধ্যাচলে আশ্রম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজা উৎসবাদির ব্যবস্থা করেন। তিনিই প্রথম যোগীরাজের মর্মর মূর্তি পুরীধামস্থ আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত ভোগপূজাদির নিয়ম প্রবর্তন করেন। ক্রিয়া, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর তিন খণ্ডে প্রকাশিত ভগবদ্গীতা পণ্ডিত ভক্ত সকলের দ্বারা প্রশংসিত। তাঁর শিষ্যগণ সুসংগঠিত এবং যথাসাধ্য গুরুদেবের উপদেশ অনুসরণ করে চলেছেন।

(৬) আচার্য ব্রজলাল অধিকারী : অধিকারী মশাইও প্রচারবিমুখ ছিলেন। গুপ্তভাবেই আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে গেছেন। বহু নরনারী তাঁর কাছে ক্রিয়া লাভ করে ধন্য হয়েছেন। কলকাতার সিংহী পার্কের বাহাদুর সিং সিংহী তাঁর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। অধিকারী মশাইএর স্ত্রীও লাহিড়ী বাবার ক্রিয়াযোগের শিষ্যা ছিলেন।

(৭) আচার্য রামদয়াল মজুমদার : মেদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইচ্ছা করলেই কলেজে ভালো অধ্যাপনার কাজ করতে পারতেন। কিন্তু সমাজ ও ধর্মসংস্কার তাঁর অধিক আকর্ষণের বিষয় ছিল। আচার্য পঞ্চানন ভট্টাচার্যের আর্য মিশনের কলেজ বিভাগের যখন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন তখন তাঁর প্রভাবে ক্রিয়াযোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। আচার্য পঞ্চাননের সহযোগিতায় তিনি যোগীরাজ লাহিড়ী বাবা দ্বারা ক্রিয়াযোগ প্রাপ্ত হন। তিনি "উৎসব" নামে এক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এক সময় "উৎসব" কার্যালয় প্রায় এক ধর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। ঠাকুর সীতারাম ওঙ্কারনাথ এই সময় তাঁর সংস্পর্শে এসে উপকৃত হন এবং তাঁকে গুরুজ্ঞান করতেন। এক স্থানে ঠাকুর ওঙ্কারনাথ লিখেছেন, "আমি লাহিড়ী মশাই-এর নাতিশিষ্য।"

(৮) স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ : যোগীরাজের সমর্থ ক্রিয়াযোগী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী। সাধারণের মধ্যে ক্রিয়া-যোগ প্রসারণের যে-ভূমিকা যোগীরাজের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সফলতার মধ্যে তার এক প্রশস্ততর এবং উদাররূপ দৃষ্ট হয়। বিশেষ করে তাঁরই অবদানকে ভিত্তি করে এই পুস্তকের প্রস্তুতি। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর

শ্রীযুক্তেশ্বরজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল প্রিয়নাথ কড়ার। জন্ম ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে ; জন্মস্থান কলকাতার উপনগরী হুগলি জেলার শ্রীরামপুর শহর। তিনি অব্রাহ্মণ পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিলেন। পিতা ক্ষেত্রনাথ কড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, শ্রীরামপুরে এক বড় অট্টালিকা নিজ বাসস্থান ছিল, ছোটখাট একটি ব্যবসায়ও ছিল। গ্রামে ছিল কিছু আবাদী ভূমি। মাতা কাদম্বিনী দেবী এক-মাত্র পুত্রের লালন-পালনে যত্ন পরিচর্যায় ব্যস্ত। ছোট সচ্ছল সুখী পরিবার। ছোটবেলা থেকেই প্রিয়নাথ সুঠাম, সুস্থ, সবল এবং অমায়িক বালক রূপে কেবল পিতামাতার আদরের ছিলেন না—পাড়াপড়শী সকলেরই। স্থানীয় স্কুলে যখন পাঠরত তখন তাঁর মেধা, লেখাপড়ায় আকর্ষণ এবং বুৎপত্তি তথা চরিত্রের মাধুর্যে স্কুলের যাবতীয় ছাত্র ও শিক্ষকদেরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

সুগঠিত সবল দেহ, সচ্চরিত্র আবার পড়াশুনায় শীর্ষস্থান অধিকারী প্রিয়নাথ অসৎসঙ্গ বর্জন করে চলতেন। গণিতে বরাবরই আগ্রহী ছিলেন। পরিণত বয়সে বলতেন, অন্য বিষয় যেমন তেমন অঙ্কে পূর্ণ নম্বরের এক নম্বরও কম পেতেন না। তাঁর চরিত্র মাধুর্যে ও সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের জন্য ছোট শহরের সকল শ্রেণীর বয়স্কদের তিনি প্রিয় ছিলেন। রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে ফার্স্ট আর্ট ক্লাসে ভর্তি হন। বিজ্ঞান বিষয়ের উপরই তাঁর অধিক অনুরাগ ছিল। সম্পন্ন পিতামাতার একমাত্র পুত্র অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর পড়াশুনার প্রয়োজন ছিল না। জ্ঞানার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য। যা জানব ভালোভাবে এবং পূর্ণরূপে জানব এই ছিল জীবনের আদর্শ। পরিতাপের বিষয় এই যে এই আদর্শাতিশয্যেই তাঁর কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। ক্লাসে অধ্যাপক "আলোক" বিষয়ে ব্যাখ্যা করছিলেন, বলছিলেন মানুষের চোখের ক্রিয়া ফটোগ্রাফ ক্যামেরার মত। বাইরের জিনিসের প্রতিচ্ছবি চোখের কাঁচের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ভিতরের পর্দা রেটিনার উপর বিপরীতভাবে উল্টাভাবে পতিত হয় কিন্তু দ্রষ্টা সেই বস্তুকে সোজা দেখে। উল্টা প্রতিচ্ছবি কি করে সোজা দেখা যায় প্রিয়নাথ বুঝতে পারেন না। অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পান, "দেখার অনুভবের দরুন।" উল্টা প্রতিচ্ছবি কিভাবে সোজা অনুভব হবে তাই ব্যাখ্যা করলেন। প্রিয়নাথ পুনরায় অধ্যাপককে প্রশ্ন করেন। একটু উষ্মা প্রকাশ করে অধ্যাপক একই উত্তর দিলেন এবং কোপের সঙ্গে বললেন আমার ব্যাখ্যায় যদি সন্তুষ্ট না হও আমার ক্লাস ছেড়ে যেতে পার; মেডিকেল কলেজে যাও। আত্মাভিমানী প্রিয়নাথের আত্মসম্মানে ঘা পড়ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কলেজ পরিত্যাগ করেই চলে যান। পরে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষকে অনেক অনুনয় বিনয় করে কলেজের বিজ্ঞান বিষয়ের ক্লাসে উপস্থিত হয়ে অধ্যাপকদের অধ্যাপনা শ্রবণ করার অনুমতি লাভ করেন। ডাক্তার হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বিজ্ঞানের নানা শাখায় জ্ঞানলাভ করার প্রবল ইচ্ছাই ছিল এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। প্রথম দুই বৎসর কাল তিনি মেডিকেল কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা

দেহতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক ক্লাসের অধ্যাপনা শ্রবণ করে এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। কোন কোন বিষয়ে একই বক্তৃতা তিনি প্রয়োজন বোধ হলে বার বার শুনতেন। তাঁর জ্ঞান পিপাসা যথাসম্ভব পূর্ণ হলে মেডিকেল কলেজ যাওয়া বন্ধ করেন।

সে কালের রীতি অনুযায়ী পিতামাতা একমাত্র পুত্রের অল্পবয়সেই বিবাহ দিয়েছিলেন। একটি কন্যার জন্মের পর সহধর্মিণী মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতাও হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। সদাসুখী প্রিয়নাথের অনভ্যস্ত স্কন্ধে সংসারের বোঝা এসে চাপল। স্নেহপ্রবণ পিতা অবশ্য কোন প্রকার ঋণের অথবা অন্য কোন খরচের বোঝা রেখে যাননি। উপরন্তু একটি চলতি ব্যবসায়, গ্রামের ভূসম্পত্তি এবং নগদে যা রেখে গিয়েছিলেন প্রিয়নাথের জীবনে আর অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন ছিল না। পিতৃপ্রদত্ত সম্পদ থেকে ক্ষুদ্র পরিবারের ব্যয় সচ্ছলভাবেই নির্বাহ হত। কিছুকাল পিতার ব্যবসায় চালাবার পর প্রিয়নাথ ব্যবসায় উঠিয়ে দেন। মাতা ঠাকুরাণীর ইচ্ছায় কলকাতার এক সওদাগরী অফিসে কিছুদিন হিসাব রক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কাজও করেন। কিন্তু অফিসের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জীবন কাটান তাঁর পোষাত না। তাই সেই কাজও ছেড়ে দিলেন। মাতা ঠাকুরাণী পীড়াপীড়ি করতেন পুনরায় বিবাহ করতে ; তাঁর বংশধর তো চাই কিন্তু প্রিয়নাথ সে কথায় কান দিতেন না। তিনি এখন জীবনের গূঢ় অর্থ কি জানবার ইচ্ছায় চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। নানা বিষয়ে পড়াশুনাও করলেন। অঙ্কশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল ; জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে পড়লেন এবং সহজেই জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। কোষ্ঠী বিচার করে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বেদবাক্যের মতই ফলে যেত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর জ্যোতিষ বিষয়ে পারদর্শিতা সহজে এবং অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনের ধর্মযাজকদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন ; কয়েকজনের সঙ্গে মিত্রতাও হয়েছিল। মিশনের আশ্রমে যাতায়াত করতেন, খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল আদি অধ্যয়ন করতেন এবং যাজক ও খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন। অপরদিকে সেইকালে দেশে যে সমাজ তথা ধর্ম সংস্কারেও যে বহুলপ্রসারী আন্দোলন চলছিল তার খবরও গভীরভাবে চিন্তা করতেন। মনে রাখতে

হবে যে প্রিয়নাথের জন্মের মাত্র দুই বৎসর পরে সিপাহী বিদ্রোহ নামের ভারতের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সেই সংগ্রামের সূত্রপাত হয় শ্রীরামপুরের অতি নিকটে গঙ্গার অপর পারে ব্যারাকপুরে। সমগ্র দেশে এই সংগ্রামের উত্তরপর্ব স্বরূপ যে দেশপ্রেম ও দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের প্লাবন শুরু হয়েছিল প্রিয়নাথ বাল্যকাল থেকেই সেই বৈপ্লবিক প্লাবনে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সাহিত্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজের কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার অথচ হাস্যকৌতুকোদ্দীপক লেখনী তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

ক্রিয়াযোগে দীক্ষালাভ

স্নেহময় পিতা এবং অর্ধাঙ্গিনীকে অল্প বয়সেই হারিয়ে প্রিয়নাথ জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠেন। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তাঁর স্বভাবজাত জ্ঞানপিপসায় এখন জীবন সম্বন্ধে গূঢ় জ্ঞান অর্জনের বাসনা তীব্র আকার ধারণ করল। সাধুসন্তদের সংবাদ তাঁকে উৎসুক করে, কিন্তু তথাকথিত সাধুদের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে অব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও তৎকালীন শ্রীরামপুরের শীর্ষস্থানীয় গোস্বামী পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এদের এক-জনকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তাঁর উজ্জ্বল সৌম্য মূর্তি, স্নেহপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করত। একদিন জানতে পারেন যে ঐ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি একপ্রকার "হুড়কো" সাধন করতেন—হুড়কো দিয়ে ঘর বন্ধ করে গোপনে সাধনা করতেন, এবং কাশীধামের এক অতি শক্তিধর যোগী তাঁর গুরু। কিন্তু সেই যোগীর নাম বা ঠিকানা জানতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল ঐ অজ্ঞাতনামা মহাপুরুষের কাছে তাঁকে যেতে হবে; তাঁর কাছেই হয়তো তাঁর চঞ্চল প্রাণের শান্তির চাবিকাঠি পাওয়া যাবে। যতই ভাবেন বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে ঐ যোগী মহাসাধকই একমাত্র তাঁর হৃদয়ের সমস্ত উত্তর দিতে পারবেন। নাম ঠিকানা নাই বা পেলেন; কাশীধামে গিয়ে খোঁজ করে নিশ্চয় তাঁর সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হবেন। একদিন আত্মীয়, বন্ধু, মাতা ঠাকুরাণী কারুকে কিছু না জানিয়ে চুপিসারে কাশীধাম যাত্রা করেন। সাময়িক থাকবার

মত আস্তানা যোগাড় করে কাশীর পথে অজানা মহাত্মার খোঁজে নেমে পড়লেন। পথে কোন কোন পথিককে শ্রুত বর্ণনা দিয়ে মহাপুরুষের সন্ধান জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সৌভাগ্য এঁদের একজন আন্দাজ করে একটি ঠিকানা দিলেন এবং বললেন হয়তো ঐ স্থানেই যাঁর অনুসন্ধান করছেন তাঁকে পাবেন। বিলম্ব না করে সেই ঠিকানার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তখন অপরাহ্ন বেলা। পথে জিজ্ঞাসা করতে করতে প্রাপ্ত ঠিকানার সন্ধান পেলেন। গৃহের সদর খোলাই ছিল। শঙ্কিত মনে সদরে প্রবেশ করে পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে দেখতে পেলেন এক নিচু চৌকির উপর উপবিষ্ট উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তেজমণ্ডিত করুণাঘন মূর্তি; দরজার দিকে মুখ করেই বসে আছেন; সম্মুখে পাতা সতরঞ্চির উপর পাঁচ-সাতজন উক্ত মহাত্মার দিকে মুখ করে শ্রদ্ধাবিনম্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। প্রিয়নাথ নম্রপদে সকলের পিছনে সতরঞ্চির উপর বসে পড়লেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর মনে হল তিনি তাঁর প্রার্থিত স্থানে উপস্থিত হয়েছেন এবং ঐ দিব্যকান্তি মহাপুরুষ তাঁর সমুদায় বিভ্রান্তির ও দুঃখের পথ নিরসন করতে পারবেন; ইনিই তাঁর ভাগ্যনির্দিষ্ট কল্যাণ পথপ্রদর্শক গুরু।

উপস্থিত ভক্তগণ ভক্তিভরে মহাপুরুষকে প্রশ্ন করছেন এবং স্মিতহাস্যে স্নেহভরে মহাত্মা প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রিয়নাথের কানে সবকিছু প্রবেশ করছে না; তিনি একদৃষ্টে মহাপুরুষকে এক দৃষ্টি নিরীক্ষণ করছেন। ভাবছেন মহাপুরুষ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন তো? তাঁকে শ্রীচরণে স্থান দেবেন তো? সন্ধ্যা সমাগমে একে একে উপস্থিত ভক্তগণ মহাত্মাকে প্রণাম নিবেদন করে চলে যান। অবশেষে মহাপুরুষের সম্মুখে একমাত্র প্রিয়নাথ উপবিষ্ট। তাঁর দিকে দৃষ্টি দিতেই প্রিয়নাথ সশঙ্কিত মনে উঠে দাঁড়ালেন এবং এগিয়ে মহাপুরুষের চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম নিবেদন করেন। অতঃপর নিজ পরিচয় প্রদান করে করজোড়ে সানুনয় প্রার্থনা করেন তাঁকে যেন শ্রীচরণে স্থান দেন। মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করে পরদিন প্রাতে শুদ্ধ হয়ে আসার নির্দেশ দেন। প্রিয়নাথের প্রার্থনা মঞ্জুর হল। বলাবাহুল্য ঐ মহাপুরুষই ছিলেন কাশীর প্রসিদ্ধ মহাযোগী যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী। পরদিন ভোরে প্রিয়নাথ যথানির্দিষ্ট ভাবে উপস্থিত হলেন এবং যোগীরাজ সানন্দে তাঁকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেন। এই ঘটনা ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে কোন এক সময়ে

সংঘটিত হয়। ক্রিয়াযোগ প্রসারের উদার পথ উন্মুক্তির সম্ভাবনার ভিত্তিস্থাপন হয়

গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রণয়ন

প্রিয়নাথ শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন করেন এক যোগীরূপে। এসেই গভীর সাধনায় নিমগ্ন হন। অবসর সময় অফুরন্ত, সুতরাং ক্রিয়ার অভ্যাসও দুরন্ত গতিতে চলতে লাগল। উন্নতিও হল ত্বরিতগতিতে। স্বামীজী মহারাজের প্রধান ক্রিয়াযোগী শিষ্য ৺অমূল্যচরণ সাঁতরা বলতেন, "যোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মেছিলেন; স্বামীজীকে কি আর বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছে?" অতি অল্প সময়েই ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করেন। প্রিয়নাথ নিয়ম করেছিলেন বৎসরের তিন মাস কাশীতে থাকবেন এবং বাকী সময় শ্রীরামপুরে। কাশীতে অবস্থানের জন্য রাণামহলে এক বাসাও ভাড়া করেন। কাশীতে গেলে ঐ রাণামহলের বাসায়ই থাকতেন। কাশীতে থাকা কালে প্রতিদিন শ্রীগুরুদর্শনে যেতেন এবং অধিক সময় শ্রীগুরুসন্নিধানে থাকার চেষ্টা করতেন। যোগীরাজ যে সকল কথাবার্তা, ক্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ এবং গীতা বা অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতেন মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং বাসায় ফিরে তার সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। অল্প কয়েক বৎসর বাদে শ্রীগুরুর অনুমতি লাভ করে শ্রীরামপুরের নিজ ভবনে সাপ্তাহিক এক গীতা সভার আয়োজন করেন। ঐ সভায় প্রিয়নাথই গীতার ব্যাখ্যাতা ছিলেন। শ্রীগুরুর মুখে শোনা ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই তিনি নিজ বক্তব্য রাখতেন। প্রথমে সভায় বেশী লোকের সমাগম হত না। একে তো অব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহ তদুপরি প্রিয়নাথ সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলে কেউ জানতেন না; সেই কারণে শহরের গণ্যমান্য পণ্ডিত সমাজের বিশেষ কেউ সভায় যোগ দিতেন না। কিন্তু প্রিয়নাথের ব্যাখ্যার সুনাম ক্রমশঃই বহুল প্রশংসা লাভ করতে লাগল, এবং সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত সমাজের ব্যক্তিরাও সভায় যোগ দিতে লাগলেন। প্রিয়নাথের ব্যাখ্যার অপূর্ব যুক্তি এবং শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তথ্য পরিবেশনের কৃতিত্ব দর্শন করে সকলেই মুগ্ধ হতেন। সভায় প্রত্যেক অধিবেশনের পর প্রিয়নাথের ব্যাখ্যার অনুলিপি করে রাখা হত প্রবন্ধাকারে। এই প্রকারে এক এক করে গীতার প্রথম নবম অধ্যায় পর্যন্ত

মাপ্ত হয়। এক অধ্যায়ের অনুলিপি পূর্ণ হলে প্রিয়নাথ কাশী যাবার সময় গ সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং সুযোগমত গুরুদেবকে পড়ে শোনাতেন। গুরুদেবের মতানুসারে প্রবন্ধের কোন কোন স্থান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিতেন। এইভাবে গীতার নবম অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যা গুরুদেবের অনুমোদন লাভ করে। পরে গীতার আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা নামে উক্ত নবম অধ্যায় পর্যন্ত ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। পরজীবনে স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বর বলতেন গীতার মুখ্য উপদেশ প্রথম নয় অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে—বাকি নয় অধ্যায়ে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বেরই বিস্তার এবং পুষ্টিসাধন করা হয়েছে। যোগীরাজের সমর্থ উন্নত যোগী শিষ্যদের মধ্যে প্রিয়নাথই একমাত্র অব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন। গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশের পর তাঁর খ্যাতি ব্রাহ্মণ সমাজ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে মনে হয় না, তাঁদের চোখ টাটান সমাজের তাৎকালিক অবস্থায় আশ্চর্যের কথা নয়। শোনা যায় কেউ কেউ যোগীরাজের কাছেও ঐ পুস্তক বিষয়ে সমালোচনার প্রয়াস করেছিলেন। যোগীরাজ কিন্তু ঐ সবে কর্ণপাত করেননি। ঐ ব্যাখ্যায় প্রিয়নাথ কেবল গতানুগতিক পদ্ধতিই অবলম্বন করেননি; আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের বিস্তারে লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য-সমূহেরও সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেছিলেন। বস্তুতঃ সমাজের সকল স্তরেই এই গ্রন্থের বিশেষ আদর হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এইরূপ ব্যাখ্যা বাংলা সাহিত্যে তথা ভারতের অন্যান্য সাহিত্যে এক অপূর্ব অবদান।

মহামুনি বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভ

অচিরে প্রিয়নাথের জীবনে আর এক সৌভাগ্যের উদয় হয়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রিয়নাথ এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলা দর্শনে যান। অধ্যাত্ম রাজ্যের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত প্রিয়নাথের কুম্ভদর্শন পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়নি; ভারতের চিরন্তন সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ দর্শনের কৌতূহলই প্রধান ছিল। যমুনা নদের যে পারে এলাহাবাদ শহর সেই পারেই সাময়িক আস্তানা যোগাড় করেছেন। এলাহাবাদের দিকে সাধু, সন্ত, যোগী, সন্ন্যাসী—নাগা সন্ন্যাসী, আবালবৃদ্ধবণিতা পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীর প্রচণ্ড ভিড়; চলাফেরায়ও অসুবিধা হয়। এত ভিড় দেখে এক অপরাহ্ণে প্রিয়নাথ নৌকাযোগে যমুনা পার হয়ে

অপর পারে ঝুসির দিকে বেড়াতে যান। এপারে লোকজন তীর্থযাত্রীর ভিড় নেই—ইতস্ততঃ মাঝেমধ্যে সাধুদের শিবির—তাঁবু খাটান চোখে পড়ে। কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবী পরিহিত, মাথায় দীর্ঘ বাবরী কেশ শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত হাতে ভ্রমণের লাঠি এক বাঙালী গৃহস্থের বেশে প্রিয়নাথ যমুনা তীর বরাবর প্রসারিত পথ ধরে বেড়াতে বেড়াতে অগ্রসর হতে লাগলেন। মনে মনে ভাবছেন এই তো সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী—নাগা সন্ন্যাসী কুম্ভে সমবেত পুণ্য স্নানের অভিলাষে; আমেরিকা বা ইউরোপে নিশ্চয়ই বহু সাধারণবেশী সাধারণ সাংসারিক জীবনযাপন করেন এরূপ ব্যক্তি আছেন—যাঁরা অধ্যাত্ম পথের সন্ধান পাননি, অথচ মৌলিক অধ্যাত্ম সম্পদে এঁরা হয়তো অনেক সাধু সন্ন্যাসী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নন। এই সঙ্গে তাঁর নবলব্ধ ভগবান যিশুর বাইবেলোক্ত বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থের আবিষ্কারের কথা মনে হয়। বাইবেলে উক্ত বহু বাণী হিন্দুর মৌলিক অধ্যাত্ম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রচিত। ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হবার পর নিবিষ্টভাবে বাইবেল পাঠের সময় তাঁর এই যুগান্তকারী তথ্য আবিষ্কৃত হয়। মনে মনে এইসব কথা চিন্তা করছেন, এমন সময় কানে এলো কে যেন এক ব্যক্তি পিছন থেকে "স্বামীজী মহারাজ! স্বামীজী মহারাজ!" করে ডাকছে। তাঁর সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তি ছিল না, আশেপাশেও না; কাকে ডাকছে বুঝতে পারলেন না। তাঁকে ডাকছে না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ তিনি সন্ন্যাসী নন, সাধারণ বাবু বেশধারী বাঙালী গৃহস্থ। পিছনে না তাকিয়ে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। পুনরায় সেই ডাক। এবার পশ্চাৎ ফিরে দেখলেন এক সাধু তাঁর দিকেই হস্ত প্রসারিত করে তাঁকে আহ্বান করছেন এবং মুখে "স্বামীজী মহারাজ! স্বামীজী মহারাজ!" উচ্চারণ করছেন। তিনি তো সন্ন্যাসী নন। নিশ্চয়ই সাধুটি ভুল করছেন। যাই হোক তিনি সাধুর কাছে উপনীত হলেন এবং উষ্মার সুরেই বললেন, "আমি তো সন্ন্যাসী নই! আমাকে স্বামীজী মহারাজ বলছেন কেন?" সাধুটি একটু বিব্রত বোধ করলেন। কিন্তু আঙুল দিয়ে অদূরে এক তাঁবু দেখিয়ে বললেন, "বাবাজী আপনাকে ডাকছেন।" বলেই তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলেন। প্রিয়নাথও তাঁর পিছন পিছন গেলেন। তাঁবুতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তেজস্বী জ্যোতির্ময় মূর্তি সাধু সহাস্যে অভ্যর্থনা করে বলে উঠলেন, "স্বামীজী মহারাজ! আসন

গ্রহণ করুন।" প্রিয়নাথ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম নিবেদন করে সাধুর সম্মুখে রক্ষিত আসনে উপবিষ্ট হয়ে একটু বিরক্তির ভাবে বললেন, "মহারাজ! আমি তো সন্ন্যাসী নই; তবে আমাকে স্বামীজী মহারাজ বলে কেন সম্বোধন করছেন?" মহাত্মা তাঁর প্রতিবাদ শুনে বালকের মত উচ্চহাস্য করে বলে উঠলেন, "আমার মুখ থেকে যখন বেরিয়ে গেছে আপনি স্বামীজী মহারাজ তখন আপনি নিশ্চয়ই স্বামীজী মহারাজ!" এই বলে তিনি পুনরায় উচ্চহাসিতে প্রিয়নাথের সকল প্রতিবাদ ভাসিয়ে দিলেন। এরপর প্রিয়নাথ ইতঃপূর্বে পথে যে চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন সেই চিন্তার সূত্র ধরে বললেন, "মহারাজ! এই তো কুম্ভে শত সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ হয়েছে। আমার মনে হয় আমেরিকা বা ইউরোপে এমন বহুলোক আছেন যাঁরা অধ্যাত্মপথের সন্ধান পাননি এবং বস্তুবাদে নিমজ্জিত আছেন। কিন্তু অন্তরের মৌলিক অধ্যাত্ম সম্ভাবনায় সমবেত সাধু-সন্ন্যাসীগণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।" এই অভিমত শোনামাত্র মহাত্মা স্মিতহাস্যে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ।" সম্মতিসূচক উত্তর শুনে উৎসাহিত হয়ে প্রিয়নাথ এবার তাঁর আবিষ্কৃত যিশুখ্রীস্টের উপদেশসমূহের বিষয় উত্থাপন করেন। এক একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বোঝাতে লাগলেন কিভাবে ঐসব উপদেশ ভারতীয় মৌলিক অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া। এবারও সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে মহাত্মা বলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ।" একটু পরেই বলে ওঠেন, "গুরুর কথায় গীতা লিখেছ এবার আমার কথায় একটি পুস্তক লেখ—এই যে বিষয়ে আলোচনা হল সেই বিষয়ে।"

প্রস্তাব শুনে তো প্রিয়নাথ হতভম্ব। বলে ওঠেন, "একি আদেশ করেন মহারাজ! আমি তো শাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ নই; ভাষারও দখল সীমিত। আমার দ্বারা কি এই গুরুভার বহন করা সম্ভব?" এবারও মহাত্মাটি উচ্চ অট্টহাস্যে সমস্ত তাঁবুর অভ্যন্তর ভরে দিলেন; বললেন, "আমার কথা তো কেউ ঠেলে না! আমার মুখ থেকে যখন বেরিয়ে গেছে, তখন এও জানি এ কাজ সম্পন্ন হবেই!" বলে অট্টহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত করে তুললেন। প্রিয়নাথ অবাক, হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিছু না ভেবেই বলে ফেললেন, "মহারাজ! যদি পুস্তক লেখায় সফল হই আপনার দর্শন পাব তো?" "নিশ্চয়" বলে মহাত্মা আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করলেন।

এরপর মহাত্মা নিজে থেকেই যোগীরাজ শ্যামাচরণের কথা তুললেন। শ্যামাচরণের ভূয়সী প্রশংসা করে একটি মন্তব্য করলেন যার অর্থ শ্যামাচরণ বেশীদিন আর বর্তমান দেহে থাকবেন না। প্রিয়নাথের কাছে তাঁর গুরুদেব ভগবদ্‌তুল্য। মনে মনে ভাবেন এইসকল তরুতলবাসী চিমটি বাবারা তাঁর গুরুর মহিমা কি জানে। অতঃপর প্রণামান্তে প্রিয়নাথ বিদায় নেন।

সন্ধ্যা সমাগমে এলাহাবাদে নিজ আস্তানায় ফিরে এসে পরদিনই কাশীধাম যাত্রা করেন, এবং কাশী পৌঁছে প্রথম সুযোগেই শ্রীগুরুদর্শনে যান। তাঁকে দেখে যোগীরাজ বলেন, "প্রিয়নাথ, কুম্ভমেলা কেমন দেখলে শোনাও।" উৎসাহভরে প্রিয়নাথ কুম্ভমেলার সমুদয় বিবরণ নিবেদন করতে আরম্ভ করলেন। বিবরণ শেষ হবার পূর্বে বললেন, "ঠাকুর! এক মজার ব্যাপার হয়েছিল কুম্ভে।" এই বলে ঐ সাধু মহাত্মার সঙ্গে তাঁর অদ্ভুতভাবে মিলন এবং কথোপকথনের বিবরণ প্রকাশ করেন। সবশেষে মহাত্মার শ্যামাচরণ সম্বন্ধে ইঙ্গিতটি প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাচরণ গম্ভীর হয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। শরীর স্পন্দনহীন। শরীরের দুধে আলতা রং নীল হয়ে গেল। অনর্গল ঘর্ম প্রবাহিত হতে লাগল। আরও পাঁচ-সাতজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেবের এই অবস্থা দেখে সকলে ভয়বিহ্বল। সকলেরই কি হল কি হল চিন্তা। প্রিয়নাথ ভাবেন—কিবা অপরাধ করে ফেলেছি জানি না। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর শ্যামাচরণ প্রকৃতিস্থ হলেন। শরীরের দুধে-আলতা রং ফিরে এল। মুখে প্রশান্তি বরাভয় স্মিত হাসি। প্রিয়নাথের দিকে চেয়ে বললেন, এত গল্প শুনেছ, চিনতে পারলে না? ঐ তো আমার গুরুদেব বাবাজী মহারাজ।" শুনে প্রিয়নাথ স্তম্ভিত। তাহলে পরমারাধ্য পরম-গুরুদেব বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। পুস্তক লেখার প্রস্তাব তবে তরুতলবাসী কোন চিমটে বাবার অসংলগ্ন হাল্কা অভিপ্রায় নয়। এ যে তাঁর ঐশী শক্তিসম্পন্ন পরমগুরু মহারাজের অলঙ্ঘনীয় আদেশ!

কৈবল্য দর্শন (Holy Science) প্রণয়ন

শ্রীরামপুরে ফিরে প্রিয়নাথ গভীরভাবে প্রস্তাবিত পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারছেন না। যতই ভাবেন

ততই বিষয়বস্তু সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। নানা শাস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থ ঘাঁটতে লাগলেন; বিষয়বস্তু তবুও অপ্রকাশ। কখনও বা কোন ভাব মনে এল, আবার পরক্ষণেই গোলমাল মনে হতে লাগল। অবশেষে একদিন স্থির করলেন কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়বেন—যা-ই কলমের ডগায় আসে লিখে ফেলা, দেখাই যাক কি হয়। বাড়ির তথা পাড়ার সকলে যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, গভীর নিশীথে কাগজ কলম কালি নিয়ে শয্যার উপর বসলেন, এবং লেখবার চেষ্টা করলেন। অনেক সময় যাবৎ কাটাকুটি করার পর কয়েক ছত্র লিখে ফেললেন। মনে হল মন্দ হয়নি। অতঃপর কলম চালাতে লাগলেন; মনে হল যেন ভাব সব কলমের ডগায় এসে হাজির হচ্ছে। রাত্রি ভোর হওয়া অবধি এইভাবে লেখা আস্তে ধীরে চলল। ভোর হলেই লেখা বন্ধ করে গঙ্গাস্নানে যেতেন। এবং পুনরায় নিশি রাত্রি পর্যন্ত কলম হাতে করবেন না। নিশীথে পূর্বের ন্যায় আবার চেষ্টা। রাত্রির পর রাত্রি এইভাবে পুস্তক প্রণয়নের কাজ চলছে। যতই অগ্রসর হচ্ছেন মনে হল যেন লেখা সহজতর হয়ে আসছে। এইভাবে এক সময় পুস্তকের শেষ পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হলে বাইরে কাকের ডাক রাত্রি অবসান ঘোষণা করল। পাণ্ডুলিপি শয্যার উপর রেখেই প্রিয়নাথ দৈনিক অভ্যাস মত গঙ্গাস্নানে চলে গেলেন। গঙ্গা বাড়ির নিকটেই ছিল—বেশী দূর পথ চলতে হয় না। গঙ্গায় ডুব দিয়ে অবগাহন শেষ করে ঘাটের সিঁড়ি ধরে যখন উপরে উঠছেন হঠাৎ নজর পড়ল নদীর তীরে ঘাটের সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষের নিচে বাবাজী মহারাজের হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি, তাঁরই দিকে চেয়ে আছেন। দেখামাত্রই প্রিয়নাথ চিনতে পেরেছেন; ত্বরিতে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নিকটে এসে মহাপুরুষের চরণস্পর্শ করে নিবেদন করেন, "মহারাজ! দয়া করে যখন এসেছেন, তবে আর একটু দয়া করে গরীবের গৃহে আগমন করুন। নিকটেই আমার পর্ণকুটির—আমার বড় ইচ্ছে—আপনাকে কিছু দুধ আর ফল দিয়ে সেবা করব।" বাবাজী মহারাজ উত্তর করেন, "আমরা গাছতলার জীব। গাছতলাই আমাদের ভালো।" এই উক্তি কুম্ভমেলায় প্রিয়নাথের মনের কথারই শ্লেষ কিনা প্রিয়নাথ বুঝতে পারেননি। প্রিয়নাথ ত্বরিতগতিতে গৃহে এসে একটি ঘটিতে কিছু দুধ এবং কয়েকটি পাকাকলা সংগ্রহ করে দৌড়ে স্নানের ঘাটে ফিরে এলেন। কিন্তু কোথায় বাবাজী মহারাজ! ঘাটের কাছাকাছি কেউ

কোথাও নেই ; দু-একজন স্নানার্থীকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরাও জবাব দিলেন কোন সাধুসন্তকে তাঁরা দেখেননি। তবে বাবাজী মহারাজ গেলেন কোথায়। প্রিয়নাথ পাগলের মত সর্বত্র খুঁজতে লাগলেন ; প্রথমে ঘাটের কাছাকাছি, তারপরে নিকটস্থ পাড়ায় এবং সমগ্র শহরে। একবার দৌড়ে রেলস্টেশনে গেলেন—ভাবলেন হয়তো বাবাজী রেলে অন্যত্র যাবার মানসে স্টেশনে এসেছেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা, সব খোঁজাখুঁজি বৃথা হল। বাবাজী মহারাজের দেখা কোথাও মিলল না। সূর্য তখন অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। রৌদ্রের তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। অবশেষে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত দেহে বাড়ির মুখে ফিরতে লাগলেন। মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ। ভাবলেন সাধুদের কিরকম ব্যবহার। অপেক্ষা করার ইচ্ছা যদি না-ই ছিল বললেই পারতেন। মনে এই-রকম চিন্তা করতে করতে বাড়ি পৌঁছলেন। দুধ ও জল রেখে দিয়ে যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন পুস্তকের শেষ পাণ্ডুলিপি তখনও শয্যার উপর ছড়ান। সেগুলির উপর নজর পড়তেই বিদ্যুতের মত স্মৃতি ফিরে এল। বাবাজী তো পুস্তক লেখা সম্পূর্ণ হলে দর্শন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই দর্শন তাহলে তো সেই অঙ্গীকারের স্বীকৃতি। ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় প্রিয়নাথের হৃদয় মন পূর্ণ হয়ে গেল। মহাশক্তিধর মহাপুরুষের উদ্দেশে শত শত প্রণাম নিবেদন করতে লাগলেন। কৈবল্য দর্শন প্রণয়ন অধ্যায় সমাপ্ত হল। ভবিষ্যতে ক্রিয়াযোগের প্রসারণ যে আরও উদার ও প্রশস্ততর গতিলাভ করবে এই পুস্তক প্রণয়ন তারই পটভূমি। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে খ্রীস্টধর্মের মৌলিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্রিয়াযোগ সাধনপদ্ধতির মূলতঃ কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু খ্রীস্টধর্মাবলম্বীগণ যিশুর উপদেশের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারেন না। নিজ ধর্মে অবিচলিত থেকেও কোন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ক্রিয়াযোগ গ্রহণ করলে ভগবান যিশুর উপদেশ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে পরমলাভের প্রাপ্তি হতে পারে।

যদিও প্রিয়নাথ বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বহু বৎসর পরে ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে বাবাজী মহারাজ কর্তৃক "স্বামীজী মহারাজ" সম্বোধনের স্মৃতির সম্মানে নিজের নামের সঙ্গে "স্বামী" শব্দ যোগ করতেন ; নিজ নাম লিখতেন

প্রিয়নাথ কড়ার স্বামী। এই অদ্ভুত রকমের নাম দেখে কেউ কেউ কটু মন্তব্যও করতেন। কিন্তু ক্রমশঃ এই নাম প্রচলিত হয়ে যায় এবং "কড়ার স্বামী" নামে প্রিয়নাথ পরিচিত হন। শিষ্যভক্তগণ অবশ্য "স্বামীজী মহারাজ" সম্বোধন করতেন।

সংস্কার আন্দোলন সংগঠন

প্রিয়নাথের জ্যোতিষশাস্ত্রে বুৎপত্তির বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জ্যোতিষচর্চার সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানেও প্রিয়নাথ আকর্ষিত হন। পঞ্জিকা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসন্ধানের ফলে প্রিয়নাথের চোখে ধরা পড়ল পঞ্জিকানির্দিষ্ট কয়েকটি হিন্দু পার্বণের তারিখ ভ্রান্তধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ বিষুবসংক্রান্তি, মকরসংক্রান্তি, কর্কটসংক্রান্তি পরবের উল্লেখ করা যায়। এই কয়েকটি পার্বণের দিন নির্ধারণে কোন বিশেষ গণনা করতে হয় না, প্রত্যক্ষে বোঝা যায়। বিষুবসংক্রান্তি দুইটি—মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং জলবিষুব সংক্রান্তি। বিষুবসংক্রান্তির দিন-রাত্রি ও দিনের দৈর্ঘ্য সমান হয় মকর-সংক্রান্তিতে বৎসরের সর্বাপেক্ষা বড় রাত্রি এবং সর্বাপেক্ষা ছোট দিন হয়ে থাকে, আবার কর্কটসংক্রান্তির দিন ঠিক বিপরীত—সর্বাপেক্ষা দীর্ঘদিন এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রাত্রি। সুতরাং এইসকল দিন নিরাকরণে ভুল হওয়ার সুযোগ নেই। অথচ পঞ্জিকাতে এইসব পর্বের যে তারিখ নির্দিষ্ট থাকে বর্তমানে তার প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে ঐসব সংক্রান্তি হয়ে যায়। সূর্যের দুই প্রকার গতি বলা হয়—আহ্নিক এবং বার্ষিক। বস্তুতঃ সূর্যের এই প্রকার কোন গতি নেই। পৃথিবীর গতির কারণেই পৃথিবীস্থ জীবের ঐ প্রকার অনুভব হয়ে থাকে। পৃথিবীই চব্বিশ ঘণ্টায় একবার নিজ অক্ষরেখার চতুর্দিকে ঘুরে আসে ফলে দিনরাত্রির উদ্ভব হয়; অথচ পৃথিবীর লোকের মনে হয় যেন সূর্যই পূর্ব গগনে উদিত হয়ে পশ্চিম গগনে অস্ত যায়। আবার পৃথিবী নিজ কক্ষপথে সূর্যকে এরূপভাবে প্রদক্ষিণ করে যে মনে হয় যেন সূর্য বৎসরে একবার উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পুনঃ দক্ষিণ থেকে উত্তর মুখে গতিশীল হয়। নভোমণ্ডলের বহু উপগ্রহাদির নিরন্তর গতির ফলস্বরূপ কিছু ঘটনার অল্প-স্বল্প পরিবর্তন হয়ে থাকে—যেমন বিষুব সংক্রমণ বিন্দু। হিন্দু পঞ্জিকা গণনায় এই পরিবর্তনানুগ

তারিখ পরিবর্তনের প্রথার প্রচলন নেই। সেই কারণে বহু বৎসর পরে বর্তমানের সংক্রান্তির তারিখের বৎসর ভ্রান্ত তারিখের উল্লেখ হয়। পাশ্চাত্য গণনায় এইসব ভুল হয় না। যদিও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সংক্রান্তি পরব অনুষ্ঠানের কোন বিধান নেই ; একটি ব্যাপারে তার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেটা হল খ্রীস্টানদের বড়দিনের উৎসব পালন। মকরসংক্রান্তিতে বৎসরের সর্বাপেক্ষা ছোট দিন হয়ে থাকে এবং সেটা বর্তমানে সংঘটিত হয় ২৪শে ডিসেম্বর। ২৫শে ডিসেম্বর হতে দিন বাড়তে থাকে এবং ঐ দিনই বড়দিন উৎসব পালিত হয়। এই কারণে প্রিয়নাথ হিন্দু পঞ্জিকা শুদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অপর ঘটনা হল যুগের আয়ুষ্কাল বিষয়ে। পঞ্জিকা মতে কলিযুগের আয়ুষ্কাল ৪৩২০০০ বৎসর। এবং এই যুগের সন্ধির কাল ৩৬০০০ বৎসর যার মাত্র ৫০০০ বৎসর গত হয়েছে। শ্রীযুক্তেশ্বরজী মনুস্মৃতির উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন এ বিষয়ে প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত। প্রধানতঃ এই দুই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্তেশ্বরজী দেশময় প্রচার অভিযান শুরু করেন। কলকাতা, পুরী ও কাশীধামে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষীগণের সঙ্গে আলোচনা, সভাধিবেশনের ব্যবস্থা করে নিজ মত প্রকাশ করেন। তাঁর যুক্তি ও বিচার সম্বন্ধে কেউই আপত্তি করতে পারেন না। কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন মত প্রকাশে অস্বীকৃত হন।

এর মধ্যে অনেকে স্বামীজীর কাছে ক্রিয়াযোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন শ্রীরামপুরের চাতরার কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান আচার্য মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরজীবনে স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে খ্যাত), খিদিরপুরের ভাণ্ডার-হাটির জমিদার রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্র চৌধুরী, অমূল্যচরণ সাঁতরা, অমূল্য-চরণ দাস, চারুচন্দ্র মিত্র, শেওড়াফুলির ডাক্তার বিজয়গাঙ্গুলি প্রভৃতি। হাওড়া হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার বহু গ্রামবাসীও তাঁর কাছে ক্রিয়াদীক্ষা লাভ করে ধন্য হন।

স্বামীজীর গণনায় ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে কলিযুগের অবসান হয়ে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে দ্বাপর যুগের সূচনা হয়েছে, এবং ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বাপর সন্ধিও শেষ হয়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে শিষ্য ভক্তদের ডেকে বললেন—দেখ যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এখন পূর্ণ দ্বাপরযুগের আরম্ভ হয়েছে। এখন সকলের কর্তব্য যুগোপযোগী

কর্মপন্থা অবলম্বন করা। সকলেই উৎসাহিত হলেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে "সৎসঙ্গ" সভা প্রতিষ্ঠিত হল। পরে ঐ নামীয় অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাতে গোলমাল না হয় সেইজন্য প্রতিষ্ঠানের নাম যোগদ সৎসঙ্গ করা হয়। কড়ার স্বামীই প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষ, প্রাণ ও নায়ক। নানা স্থানে যোগদ সৎসঙ্গ সভাকেন্দ্রও স্থাপিত হয়।

সন্ন্যাসগ্রহণ

এই সময় যখন কাশীধামে উক্ত বিষয়ে প্রচারকার্যে পরিভ্রমণরত ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের অধ্যক্ষ পরমহংস জ্ঞানানন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রচারিত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়, তাঁর বিশ্লেষণে জ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রভাবিত হন। তিনি প্রস্তাব করেন যে যেহেতু ভারতবাসী সাধারণতঃ সন্ন্যাসীর কথা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে কড়ার স্বামী যদি বিধিমত সন্ন্যাসগ্রহণ করেন তবে তাঁর উপদেশ দেশের লোক সাগ্রহে গ্রহণ করতে পারে। প্রস্তাবটি প্রিয়নাথের মনে লাগল। সর্বপ্রকারে তো সন্ন্যাসীর জীবনই যাপন করছেন; বিধিমত সন্ন্যাসী হলে প্রচারের যদি সুবিধা হয় মন্দ কি। যথা চিন্তা তথা কাজ। কাশীধাম থেকেই সোজা গয়াধাম চলে যান এবং বুদ্ধগয়ার মোহান্ত মহারাজের অতিথি হয়ে তিনদিন অবস্থান করেন। এই সময় তদানীন্তন মোহান্ত মহারাজ পরমহংস কৃষ্ণদয়ালগিরি মহারাজের সঙ্গে প্রিয়নাথ তাঁর বিভিন্ন কার্য ও প্রচারের বিষয় সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেন। সৎসঙ্গ সভা প্রসঙ্গে বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে সভার নিয়ম অনুযায়ী কোন সভ্য নিজ নামের পূর্বে "বাবু" শব্দ যোগ করতে পারবে না—"শ্রী" বা "শ্রীযুক্ত" যোগ করতে হবে। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে "বাবু" শব্দ শাসকগোষ্ঠী ইংরাজদের দেওয়া যার অর্থ অফিসের কেরাণী। ইংরাজী অভিধানে এই অর্থই "বাবু" শব্দে দেখান আছে। সব দেশের স্বাধীন জাতি নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুসারে মিস্টার ইত্যাদি শব্দ যোগ করেন, যেমন ইংরাজ লেখেন "মিস্টার", জার্মান লেখেন "হের", ফরাসী লেখেন "মঁসিয়ে"। আমাদেরও নিজ জাতির ঐতিহ্য অনুসারে নামের পূর্বে "শ্রী" বা "শ্রীযুক্ত" লেখা কর্তব্য। এই বিবরণ শুনে কৃষ্ণদয়ালগিরি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং সৎসঙ্গ সভার সভ্যদের পালনীয় এই নিয়মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অবশেষে প্রিয়নাথ পরমহংসজীকে অনুরোধ করেন যেন তাঁকে সন্ন্যাসপ্রদান করেন। তিনি প্রিয়নাথের উপর প্রসন্ন তো ছিলেনই; তথাপি তৎকালীন শঙ্করাচার্যের দশনামী সন্ন্যাসীদের রীতি ছিল অব্রাহ্মণকে সন্ন্যাস না দেওয়া তাই নিম্নস্বরে প্রিয়নাথকে তাঁর জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। সন্ন্যাসীদের রীতি সম্বন্ধে প্রিয়নাথ অবহিত ছিলেন। বুদ্ধি করে উত্তর দেন, "মহারাজ ব্রহ্মচারীদেরও কি জাতি হয়?" উত্তর শুনে কৃষ্ণদয়ালজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং সন্ন্যাসদানে স্বীকৃত হয়ে গেলেন। সন্ন্যাসদান প্রক্রিয়ায় গুরু নবীন শিষ্যকে গেরুয়া বস্ত্র দান করেন এবং নূতন সন্ন্যাসীর নামকরণ করেন বস্ত্র প্রদান করে নামকরণের সময় বলেন, তোমার শ্রী ও শ্রীযুক্ত বিষয়ে বিবরণ আমার অত্যন্ত সুখপ্রদ হয়েছে; তোমার নাম দিলাম শ্রীযুক্তেশ্বর।" গিরি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুন প্রিয়নাথের পূর্ণ সন্ন্যাস নাম হল স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি। অবশেষে কড়ার স্বামী পরিপূর্ণ স্বামীজী মহারাজে পরিণত হলেন। মহাপুরুষের অমোঘ বাণী সত্য প্রমাণিত হল।

সন্ন্যাসী হওয়ার পর শ্রীযুক্তেশ্বরজী নিজমত প্রচারে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। পুরীধামে গোবর্ধন মঠের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের অধ্যক্ষতায় সমুদয় মঠাধীশ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তেশ্বরজী এই সভার আহ্বায়ক ও উদ্যোক্তা ছিলেন। সভায় তিনি তাঁর পঞ্জিকা শুদ্ধি ও যুগ বিষয়ক প্রচলিত ধারণার উপর জোর দেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ বিচার সকলকেই প্রভাবিত করে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শঙ্করাচার্য মহারাজকে সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত করে "অখিল ভারতীয় সাধু সমাজ" নামে এক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়, এবং উক্ত সাধু সমাজের কার্য পরিচালনার জন্য "সাধুসভা" নামে এক কার্যকরী সমিতিও গঠিত হয়। স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর এই কার্যকরী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় হতেই শ্রীযুক্তেশ্বরজী "সাধুসভাপতি" নামে পরিচিত হতে থাকেন। শ্রীরামপুরস্থ তাঁর পৈতৃক ভবন প্রিয়ধামে সাধুসভার প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়; এবং আচার্য মতিলাল মুখোপাধ্যায় সাধুসভার প্রধান কর্মসচিব নিযুক্ত হন। পুরীর কড়ারাশ্রমও সাধুসভার এক কেন্দ্রে পরিবর্তিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল সৎসঙ্গ সভা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল সব কেন্দ্রই সাধুসভার অনু-

মোদিত কেন্দ্রে পরিণত হয়। সাধুসভার কর্মধারার মধ্যে "সাধুসম্বাদ" নামে এক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। ধর্মবিষয়ক পুস্তকাদি প্রকাশের সুবিধার জন্য ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সভাদির আয়োজন করে সাধুসভার উদ্দেশ্য ও কর্মধারা প্রচার করা হতে থাকে। সাধুসম্বাদ পত্রিকায় শ্রীযুক্তেশ্বর প্রণীত গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, অপ্রকাশিত কৈবল্যদর্শন গ্রন্থের বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশিত করা হয়। এইভাবে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর জীবনপ্রবাহ একপ্রকার গতানুগতিক রূপ পরিগ্রহ করে। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কন্যাও এক কন্যা সন্তান প্রসব করার পর মৃত্যু মুখে পতিত হন। সংসারের একমাত্র বন্ধন তখন বৃদ্ধা মাতা।

স্বামী যোগানন্দের আবির্ভাব

গতানুগতিক কর্মপ্রবাহে ছেদ পড়ে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে। এই ঘটনাও এক আকস্মিক মিলনে সংঘটিত হয়। একদিন পূর্বাহ্ণে স্বামীজী বারাণসী ধামের এক রাজপথে হেঁটে যাচ্ছিলেন। অপর এক রাস্তার মিলনস্থান—চৌরাস্তার মোড়ে যখন উপস্থিত হয়েছেন দেখতে পান এক অতি সৌম্যদর্শন যুবক অপর রাস্তা ধরে মোড় পার হচ্ছে। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল ; শ্রীযুক্তেশ্বরজী যুবকটিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। যুবকটি কিন্তু নিজপথে অগ্রসর হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে শ্রীযুক্তেশ্বরজী ঐ স্থলেই দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরেই দেখা গেল যুবকটি দ্রুত তাঁর দিকেই ফিরে আসছে। নিকটে এসে তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। তাকে সস্নেহে তুলে আলিঙ্গন করতে করতে স্বামীজী বলেন, "বেটা! অবশেষে তুমি এলেই!" তাকে সঙ্গে করে নিজ বাসস্থান রাণামহলে নিয়ে যান এবং প্রশ্ন করে সব বৃত্তান্ত অবগত হন। ঐ যুবকটি ছিলেন ভবিষ্যতের আমেরিকা খ্যাত যোগধর্মপ্রচারক পরমহংস যোগানন্দজী। তখনকার নাম মুকুন্দলাল ঘোষ। স্বামীজীর গুরুভাই সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ভগবতী-চরণ ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দলাল আই, এ, পরীক্ষা পাশ করে সন্ন্যাস গ্রহণের মানসে বাড়িতে না বলে চুপিসারে কাশীধামে পালিয়ে এসেছেন এবং সাময়িক ভাবে ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের অধ্যক্ষ পরমহংস স্বামী জ্ঞানানন্দের

আশ্রমে আছেন। দেখেই শ্রীযুক্তেশ্বরজীর প্রতীতি হল এই যুবককে দিয়েই মহামুনি বাবাজী মহারাজের ইচ্ছা ফলবতী হবে। রাণামহলেই মুকুন্দলাল আশ্রয় পেলেন এবং স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বর কর্তৃক ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হন। মুকুন্দলালের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঐ সঙ্গেই সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া, কিন্তু শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁকে বোঝালেন যে ঠিক সময়ে সন্ন্যাসী হবেনই, তবে এখন সেই জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাঁর জন্য অনেক মহৎ কাজ অপেক্ষা করছে। সামান্য চিমটা বাবা সন্ন্যাসী হয়ে কি লাভ; তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দের মত বিশ্ববিখ্যাত হতে হবে। এ প্রস্তাব মুকুন্দলালের মনঃপুত হয়। কারণ তখনকার স্বদেশপ্রাণ এবং ধর্মপ্রাণ শিক্ষিত সকল যুবকেরই আদর্শ দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী বললেন তাঁকে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত হতে হবে; তারপরই সন্ন্যাসজীবন। মুকুন্দলাল রাজী কিন্তু পুনরায় কলেজের পড়াশুনা আর কলকাতায় নয় শ্রীরামপুরস্থ মিশনারী কলেজে। স্বামীজীর সুপারিশক্রমে পিতা ভগবতীচরণ রাজী হয়ে গেলেন এবং কলেজে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সদা নিরবচ্ছিন্ন শ্রীগুরুর সঙ্গে যোগাযোগও চলতে লাগল। পড়াশুনা যাই হোক শ্রীগুরুর আশীর্বাদ পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ. ডিগ্রীও যথা সময়ে লাভ করলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন তাঁর ডিগ্রীলাভ বস্তুতঃ তাঁর পূজ্য গুরুদেবের যোগশক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছে। পড়াশুনা তিনি কিছুই করেননি। এবার আর দেরী নয় স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর মুকুন্দলালকে সন্ন্যাস দীক্ষা দান করে তাঁর নতুন নামকরণ করলেন স্বামী যোগানন্দ গিরি।

সন্ন্যাসী হয়েই স্বামী যোগানন্দ গুরুর যোগদ সৎসঙ্গ সভার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। কিন্তু সর্বদাই তাঁর মনে হতে লাগল বড় কিছু তাঁকে করতে হবে। তখনকার দিনে স্বদেশপ্রেমী সকল ভারতীয় যুবকের জাপানই ছিল তীর্থভূমি। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে যোগানন্দ জাপান যাত্রা করেন। জাপানে গিয়ে সে দেশের নৈতিক জীবনের চিত্র তাঁর অতিশয় বিরূপ মনে হল; তিনি স্বল্পদিন পরেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যাত্রায় প্রধান বা একমাত্র লাভ হয় ক্যাপ্টেন রসিদের সঙ্গে জাহাজে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। জাহাজেই রসিদ যোগানন্দজীর নিকট ক্রিয়া দীক্ষা আদায় করেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কাশিম-

বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শ্রীগুরুর আশীর্বাদ লাভ করে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই বিদ্যালয় বিহারের রাঁচি শহরে স্থানান্তরিত হয়ে রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্বামী যোগানন্দ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ থাকাকালে যোগানন্দজীর এক অলৌকিক অনুভূতি হয়। সেদিন রবিবার, আশ্রমে পাঠের সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। আহারের পর যোগানন্দ শয়নকক্ষে বিশ্রাম করছিলেন। অপরাহ্ন হয়ে গেছে, আশ্রমের আবাসিক ছাত্রেরা মাঠে খেলাধুলা করছে, স্বামীজী তন্দ্রাভঙ্গ হতে ভাণ্ডারঘরের দিকে গেলেন। ভাণ্ডারে আশ্রমের বিজয়দা (বিজয়কৃষ্ণ দত্ত), পাচকদের সঙ্গে নৈশ আহারের ব্যবস্থাদি করছিলেন। যোগানন্দজী বিজয়দাদাকে জিজ্ঞাসা করছেন নৈশ আহারের কি ব্যবস্থা হচ্ছে। এমন সময় তাঁর দৃষ্টি ভাণ্ডারঘরের বিপরীত দিকে জানালার উপর পড়ল। তিনি অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, একটু পরেই বলে উঠলেন, "বিজয়দা, আমি আমেরিকা চললুম। এই মাত্র দেখলাম আমি শত শত মার্কিন নরনারীর সম্মুখে বক্তৃতা করছি।" উপস্থিত পাচক দুজন এবং বিজয়দাদা তো এই কথা শুনে অবাক। কিন্তু যোগানন্দজীর কোন দ্বিধা নেই। তাঁর নিশ্চিত ধারণা তাঁকে আমেরিকা যেতে হবে। দ্রুত নিজ প্রকোষ্ঠে গিয়ে কলকাতা রওনা হবার প্রস্তুতি শুরু করলেন —জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন। এ খবর দ্রুত খেলার মাঠে ছাত্রদের কাছে পৌঁছাল। সকলে খেলা ছেড়ে প্রিয় স্বামীজীর ঘরের সামনে সমবেত হল। দেখে সত্যিই স্বামীজী আমেরিকার উদ্দেশ্যে কলকাতা যাত্রা করছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই কলকাতাগামী ট্রেন রাঁচি স্টেশন ত্যাগ করে; স্টেশনও বিদ্যালয়ের সন্নিকটেই। প্রিয় স্বামীজীকে অশ্রুজলে বিদায় দিল আশ্রমের সমুদায় অধিবাসী —শিক্ষক, ছাত্র, সেবক—সকলে।

কলকাতায় এসে পিতৃদেবকে আমেরিকা যাবার সিদ্ধান্ত জানালেন। পিতা প্রশ্ন করেন, টাকা কোথায় পাবে? সন্ন্যাসী পুত্র উত্তর দেয় ভগবান দেবেন। পরিচিত সহপাঠী বন্ধু, অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারেন ঐ বৎসরই বোস্টন শহরে হিন্দুধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ঐরূপ চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ আত্মপ্রকাশ করেন। ঘোরা-

ঘুরি করে ঐ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার প্রয়োজনীয় দলিলও যোগাড় করে ফেলেন। কিন্তু সমস্যা হল এখন টাকাপয়সার। অনেক চেষ্টা করেও টাকার যোগাড় হল না। পিতা আর একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "কি রে, টাকার যোগাড় হল ?" "ভগবান নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবেন" ; যোগানন্দ উত্তর দেন। "দেখি তোর কোন ভগবান ব্যবস্থা করেন," উক্তি করেন পিতা। যোগানন্দ কোন প্রত্যুত্তর করেন না। এদিকে সময় তো বয়ে যাচ্ছে। যোগানন্দের উৎসাহে কিন্তু কোন ভাঁটা নেই। একদিন পিতার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন ; কোন কথা না বলে বালিশের নিচে রাখা একটি কাগজ বার করে পুত্রের হাতে দিলেন। ঐ কাগজ একটা মোটা অঙ্কের চেক ছিল। চেক হাতে পেয়ে যোগানন্দ আনন্দে অধীর। পিতার পায়ে পড়ে বলে, "ভগবান আপনাকে দিয়েই আমার পাথেয় যোগাড় করে দিয়েছেন।" সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ; অল্পদিন পরে কলকাতা বন্দর থেকে এক জাহাজও আমেরিকার পথে যাত্রা করবে। সেই জাহাজে একটিমাত্র প্রথম-শ্রেণীর কামরা ছিল, সেটি যোগানন্দজীর নামে নির্দিষ্ট করা হল।

তাঁর জীবনে যে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে এসেছে—যাঁর যত্নে, উৎসাহে, শিক্ষায়, আশীর্বাদে তিনি ঐ জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন সেই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা অতি আদরের এবং পূজ্য গুরুদেবের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন। প্রতি কাজেই যে ব্যক্তি গুরুকে না জানিয়ে এগুতেন না, এবার কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। তাঁর এখন আবেগোন্মাদ অবস্থা। তিনি ভুললে কি হবে—পরমদয়াল গুরু তো ভুলতে পারেন না। তিনি না জানালে কি হয় ; তাঁর প্রতি পদক্ষেপের সংবাদ গুরুজী রাখতেন। তাই তাঁর জাহাজ ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে দেখা যায় স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। শিষ্য এবং কলকাতা বন্দরের প্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্র চৌধুরীর চেষ্টায় জাহাজ ঘাটে প্রবেশ এবং জাহাজে ওঠবার অনুমতি পত্র পূর্বাহ্ণেই যোগাড় করা হয়েছিল। চিরপূজ্য জীবনের কর্ণধার গুরুদেবকে জাহাজে উঠতে দেখে যোগানন্দ কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর দুঃখ রাখার স্থান নেই ; কারণ গুরুদেবকে যে তাঁর আমেরিকা যাত্রার ইচ্ছা প্রথম ব্যক্ত করার কথা সে কথা তাঁর মনেই আসেনি কিন্তু অত্যন্ত আনন্দও হল এই কারণে যে তিনি ভুল করলে কি হবে ; দয়াল

গুরু তো ভুল করতে পারেন না। গুরুচরণে পতিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। হৃদয়বৃত্তির দৌর্বল্য প্রকাশের সময় ছিল না। শ্রীযুক্তেশ্বরজী প্রিয় শিষ্যকে জাহাজের কেবিনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন; গুরুশিষ্যের মধ্যে কি হল কেউ জানতে পারল না। শ্রীযুক্তেশ্বরের হাতে সেই বৎসরেই প্রকাশিত কৈবল্য-দর্শন গ্রন্থের এক খণ্ড ছিল। প্রিয় শিষ্যের হাতে সেই খণ্ডটি দিয়ে তাঁর আমেরিকায় প্রচারকার্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন নিদর্শন এবং গুরু পরস্পরা আশীর্বাদ প্রদান করেন। অল্প পরে উভয়ে কেবিন থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী প্রত্যাবর্তন করেন। মনে মনে তিনি নিশ্চয়ই পরমগুরু ত্রিকালদর্শী মহামুনি বাবাজী মহারাজের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাচ্ছিলেন; প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে তিনি যে ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁর সেই অনুচ্চারিত ইচ্ছাই আজ পূর্ণ হতে চলল।

যোগানন্দজীর প্রচারকার্যের আলোচনার স্থান এ নয়; যথাস্থানে এ বিষয়ে কিছু তথ্য নিবেদন করা হবে। তবে সংখ্যার দিক থেকে বলতে হলে বহু আমেরিকাবাসী তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে যখন ভারতে আসেন এক পরিসংখ্যানে বলেছিলেন আমেরিকায় তাঁর ক্রিয়াশিক্ষা গ্রহণকারী দেড় লক্ষেরও অধিক হবে। যে গুপ্তসাধন পদ্ধতি এতকাল নিভৃত অরণ্য ও গুহাবাসী যোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তা সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়ে গেল। এই সম্প্রসারণে তিনটি শুভলগ্ন, তিন আশ্চর্য মিলন পরিস্ফুটভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। একটি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে রাণী খেতের সন্নিকটে হিমালয়ের শিখরে—বাবাজী মহারাজের সঙ্গে শ্যামাচরণের মিলন; দ্বিতীয় পুনরায় বাবাজী মহারাজের সঙ্গে প্রিয়নাথের ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলায় মিলন এবং তৃতীয় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে বারাণসী ধামে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরের সঙ্গে মুকুন্দলালের মিলন। এইসব মিলন মহাশক্তিধর বাবাজী মহারাজের অদৃশ্য হস্তের অদৃশ্য সঙ্কেতে সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বাভাষ

১৯৪৮-৪৯ খ্রীস্টাব্দে রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ আচার্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরের বাংলায় এক সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থকার দ্বারা শ্রীযুক্তেশ্বরজী সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি পুস্তক প্রণয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সত্যানন্দজী গ্রন্থকারের রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে কেবল অধ্যক্ষই ছিলেন না, তাঁর পরমহিতৈষী অভিভাবক এবং অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শকও ছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর সাহচর্যে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর চরণাশ্রিত হওয়ার সৌভাগ্য গ্রন্থকারের হয়। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা পূরণের ইচ্ছা বরাবরই পোষণ করা ছিল। পরন্তু কোন না কোন কারণে তা কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে যখন সত্যানন্দজী ইহধাম ত্যাগ করেন গ্রন্থকারের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হল। অনেক চেষ্টায় ও পরিশ্রমে অবশেষে ১৯৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজীতে "ক্রিয়াযোগ ও স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর" (Kriyayoga and Swami Sri Yukteswar) নামে গ্রন্থ প্রণীত হয় এবং ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থকারের অগণিত সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী অনুরক্ত বন্ধুগণ এই পুস্তকের বাংলা সংস্করণ প্রণয়নের অনুরোধ জানান। তারই ফলস্বরূপ এই পুস্তক প্রণীত হয়। ইংরাজী সংস্করণের অনুবাদ এ নয়; যদিও ঐ পুস্তকের ছায়া অবলম্বনেই রচিত। কোন কোন স্থানে বিষয়বস্তুর পরিবর্জন এবং কিছু কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

যোগীরাজের প্রধান শিষ্য এবং ক্রিয়াযোগ সম্প্রসারণে এক মুখ্য ভূমিকার অধিকারী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরের উপদেশাবলীকে কেন্দ্র করে এই পুস্তক রচিত হয়েছে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর মুখ থেকে শোনা উপদেশ ছাড়াও তাঁর প্রণীত গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও কৈবল্যদর্শন গ্রন্থদ্বয়—এই পুস্তক রচনার ভিত্তি। সত্যানন্দজী যখন শ্রীযুক্তেশ্বর সম্বন্ধে লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন, গভীর চিন্তার পর সিদ্ধান্ত হয়, এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু লেখার ক্ষমতা অধম শিষ্যের কোথায়? তাই গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজার আয়োজন।

পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরজীর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। গীতা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ; এই গ্রন্থ একটি

তিহাসের কাহিনী নয়; সামাজিক শিক্ষা ও উপদেশের জন্য এ গ্রন্থের শিষ্টতা নয়। মনোরম কাহিনীরূপে হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব কি পরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে—সেই দৃষ্টিতেই গীতা গ্রন্থ হিন্দুর এক অমূল্য ত্ন। স্বামীজী মহারাজ গীতার প্রথম নয় অধ্যায়ই প্রকাশ করেছিলেন; তাঁর ক্তব্য ছিল প্রথম নয় অধ্যায়েই গীতার মূল উপদেশ পরিবেশিত। ১৯৩৬ স্টাব্দে স্বামীজী মহারাজের অন্তর্ধানের পর তাঁর শ্রীরামপুর ভবনে লোহার সিন্ধুকে রক্ষিত তাঁরই হস্তলিখিত শেষ নয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত নোট গ্রন্থকার আবিষ্কার করেন। ঝাড়গ্রামের সেবায়তন আশ্রম থেকে স্বামীজী মহারাজের গীতার যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে শেষের নয় অধ্যায়ের নোটও ছাপা হয়। সেই সময় গ্রন্থকার সেবায়তন আশ্রমের এক ট্রাস্টি ছিলেন। এই পুস্তকে গীতার সমুদয় অষ্টাদশ অধ্যায়ের উপরই চর্চা হয়েছে।

পুস্তকের দ্বিতীয় প্রবন্ধ কৈবল্যদর্শন (হোলি সায়েন্স) গ্রন্থকে ভিত্তি করে। কৈবল্যদর্শন এক বিচিত্র গ্রন্থ। গ্রন্থের মূল বক্তব্য, অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত, সংস্কৃত ভাষায় সূত্রাকারে লিখিত। এইসকল সূত্রে ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব নতুনভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ইংরাজিতে। ব্যাখ্যার সময় স্থানে স্থানে বাইবেল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত উপযোগী ভগবান যিশুর বাণী সন্নিবেশিত করে প্রদর্শিত হয়েছে যে যিশুর বাণী বস্তুতঃ হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতির ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত—উপদেশ অনেক স্থলে একার্থক। এই প্রবন্ধের শিরোনাম—"হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতি ও ভগবান যিশুর বাণী।"

তৃতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম "যুগ ও যুগধর্ম।" এই প্রবন্ধেরমূল তথ্য গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তথা কৈবল্যদর্শন এবং সাধু সম্বাদ পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। যুগ বিষয়ক স্বামীজী মহারাজের অভিমত এক বৈপ্লবিক এবং যুগান্তকারী ঘটনা। মূল মনুস্মৃতি গ্রন্থ থেকে উপযোগী শ্লোকের উদ্ধৃতি করে স্বামীজী মহারাজের মতের পুষ্টিসাধনের চেষ্টা হয়েছে। যুগ ও যুগধর্ম প্রকাশক সৌরমণ্ডলের আবর্তন গতির অনুকরণ ক্রিয়াপদ্ধতির যে এক গুপ্ত কৌশল এই প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা আছে।

পুস্তকে শেষ প্রস্তাবনা—"ক্রিয়া"। ক্রিয়া এক গুপ্ত এবং রহস্য সাধন

পদ্ধতি। স্বয়ং গুরুর কাছে এই সাধন পদ্ধতি শিখতে এবং জানতে হয়। ক্রিয়া বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা নিষেধ; কারণ পড়ে বা শুনে ক্রিয়াসাধন সম্ভব নয়—বরং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্রিয়া সাধনেচ্ছু সকলের মঙ্গলের জন্যই এই নিষেধ প্রচলিত এবং সর্বজনমান্য। ক্রিয়া সম্বন্ধে নির্ভয়ে যতদূর আলোচনা করা যায়—এই প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে।

পুস্তকের শেষ অংশে পরিশিষ্টে (১) ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় ক্রিয়াযোগ (২) ক্রিয়াযোগের প্রসার—আমেরিকা ও ইউরোপে ক্রিয়ার প্রচার এবং (৩) মহামুনি বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মতামত জ্ঞাপন।

পুস্তকের ভালোমন্দ বিচার পাঠকের। গ্রন্থকার তাঁর সীমিত বিদ্যাবুদ্ধি, অধ্যাত্ম অনুভূতি ও সামর্থ্যের অভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। শোনা যায় যোগীরাজ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে তাঁর তিরোধানের একশত বৎসর পরে দেশে ও বিদেশে ক্রিয়াযোগের বন্যা বয়ে যাবে। পরমদয়াল যোগীগুরু গত হয়েছেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং একশত বর্ষ পুর্তির সময় এবং সেই শুভলগ্ন সন্নিকট। তাই সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েও রামায়ণ কথিত সেতু-বন্ধের কার্যে কাষ্ঠবিড়ালীও দেহের বালুকা সেতুর উপর ঝেড়ে যথাসাধ্য শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার কথা মনে রেখে অধমের এই দুর্বল প্রচেষ্টা, ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট পূর্বাহ্নেই মার্জনা ভিক্ষা জানাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। যুগ যুগ ধরে সকল ধর্মসম্প্রদায় এই অপূর্ব গ্রন্থ থেকে নিজ নিজ মতবাদের সমর্থন লাভ করে আসছে। পাশ্চাত্যের মনীষীরাও গীতাকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। পৃথিবীর বহুভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। সম্রাট আকবরের সময় আরবী ভাষায়ও এই গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। যোগীগণের তো গীতা নিত্যসঙ্গী। বেদান্তশাস্ত্রে গীতাকে তিন প্রস্থানের—প্রস্থানত্রয়ের—এক প্রস্থান নামে মান্যতাপ্রাপ্ত; গীতাকে স্মৃতি প্রস্থান বলা হয়। অপর দুই প্রস্থান হল উপনিষদ—শ্রুতি প্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্র—ন্যায় প্রস্থান। এক প্রস্থানের কোন অসঙ্গতি মনে হলে অপর দুই প্রস্থানে তার সমর্থন অনুসন্ধান করতে হয়।

এই অনুপম ধর্মগ্রন্থ বস্তুতঃ মহাভারত মহাকাব্যের অংশ; মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হতে বিয়াল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ী গীতা। ভীষ্মপর্বের এক শ্লোক অনুযায়ী গীতার সর্বমোট শ্লোকসংখ্যা সাতশত পঁয়তাল্লিশ; কিন্তু প্রচলিত গীতাগ্রন্থের সর্বমোট শ্লোকসংখ্যা সাত শত। এই কারণে এই গীতাকে সপ্তশত শ্লোকী গীতাও বলা হয়। আরবী ভাষায় অনূদিত গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শতের অধিক (সাত শত চল্লিশ) ছিল জানা যায়। অবশ্য গবেষকগণ সাতশত পঁয়তাল্লিশ শ্লোকযুক্ত গীতার এক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছেন শোনা যায়। মোট শ্লোকসংখ্যার ন্যূনাধিক তারতম্য যাই হোক না কেন হিন্দু জীবনে গীতার মাহাত্ম্য এবং প্রভাবের কোন তারতম্য হয়নি। ভগবদ্‌গীতাকে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যা, যোগশাস্ত্র উপনিষদ। এই গ্রন্থে যোগের সবিস্তার এবং গূঢ় যোগতত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। মহাভারতের প্রাচীন-কালের টিকাকার নীলকণ্ঠ সুরী যথার্থই বলেছেন যে মহাভারতে সমগ্র বেদের

সারাংশ নিহিত আছে, এবং মহাভারতের সমুদায় গূঢ়তত্ত্ব গীতায় পাওয়া যায় : যে কারণে গীতাকে সর্বশাস্ত্রময়ী বলা হয়ে থাকে। (১)

মহাভারতকে পঞ্চম বেদও বলা হয়। যারা দ্বিজজাতি নয় শূদ্র, যাদের প্রণব উচ্চারণে অধিকার নেই চতুর্বেদেও তাদের অধিকার নেই। বলা হয় মহর্ষি বাদবায়ন বেদব্যাস প্রধান শিষ্যদের সাহায্যে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব সংকলনের পর এদের অবগত্যর্থে বেদের নিহিত তত্ত্ব সমূহ ইতিহাস পুরাণরূপে মহাকাব্য মহাভারত রচনা করেছিলেন। তাঁর কথায়, "ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছ, তাহাতে বেদ বেদান্ত উপনিষদ এই সকলের ইতিহাস পুরাণের অনুসরণ করিয়াছি।" বেদান্তর্গত সমুদায় মৌলিক তত্ত্ব এক মনোমুগ্ধকর এবং চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে প্রোথিত হয়ে সর্বজনবোধ্য এই কাব্যগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নাম প্রাপ্ত হয়।

বেদে তথা প্রণব উচ্চারণে শূদ্রের আধিকার নেই বলে যে উক্তি করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। বেদান্তে চারটি অনুবন্ধের-অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের কথা আছে ; এই চারটি হল অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন। এই অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের পরিমাপে বেদান্ত তথা যে কোন শাস্ত্রপাঠের যোগ্যতা বিচার হয়। এর মধ্যে প্রথম অনুবন্ধ অধিকারী বিচার্য বিষয়। বলা হয় এই অধিকার জন্মগত বা জাতিগত। বস্তুতঃ হিন্দুধর্মের মৌলিক ব্যবস্থা তা নয়। সকল মানুষ শূদ্ররূপেই জন্মগ্রহণ করে ; উপবীত গ্রহণ বা দীক্ষা সংস্কারের দ্বারা দ্বিজ হয় : বিপ্র হয় বেদপাঠ দ্বারা এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে ব্রাহ্মণ হয়। (২) জাতি বা জন্মগত অধিকারের কোন উল্লেখও এই সিদ্ধান্তে নেই। সামাজিক ব্যবহারেও দেখা যায় ব্রাহ্মণ সন্তান যতদিন উপবীত না হয় ততদিন পূজা-পার্বণের তথা শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করার অধিকার প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণীর তো কথাই নেই, তিনি ব্রাহ্মণের জন্মদাত্রী হতে পারেন, ব্রাহ্মণ ঘরণী হতে

(১) "ভারতে সর্ববেদার্থ বেদার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ম্ সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥"

(২) "জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠে ভবেৎ বিপ্রব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণ॥"

পারেন কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকর্মের অধিকার তাঁর হয় না। এই দিক থেকে শূদ্রাণী এবং ব্রাহ্মণীর মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। দ্বিজ হওয়ায়ও একটু গূঢ় ব্যাপার আছে। পক্ষী, সরীসৃপ আদিও দ্বিজজাতি। তাদের দুবার জন্ম হয়। একবার ডিম্বরূপে এবং দ্বিতীয় বার ডিম্ব থেকে শাবকরূপে। মনুষ্য জন্মের পর এটি আপন, এটি পর, এটা সুখদায়ক অপরটা দুঃখজনক ইত্যাদি যে জ্ঞানলাভ করে প্রকৃত প্রস্তাবে সে সব অজ্ঞানসম্ভূত—ডিমের খোলের মত। উপনয়ন সময়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত হলে ঐ অজ্ঞানসঞ্জাত আবরণ অপসারিত হয়ে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দেয়। দীক্ষার মূল উদ্দেশ্য এইখানেই। দীক্ষা শব্দের "দী" অর্থে অনন্তজ্ঞান দান এবং 'ক্ষা' অর্থে সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হওয়া। এই মৌলিক তত্ত্বে নির্ভর করেই দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বিজ হন। অর্থাৎ দুবার জন্ম-গ্রহণ করেন। একবার মাতৃগর্ভ হতে, আর একবার অজ্ঞানরূপ আবরণ থেকে। যোগীরাজ শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগ দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিষ্যকে দ্বিজ জ্ঞান করতেন—তিনি যে কুলেই জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন, এবং তাঁর ছোঁয়া জল খেতে আপত্তি করতেন না। যে সময়ে যোগীরাজের আবির্ভাব সেই সময়-কার নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের পক্ষে এই ব্যবহার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দ্বিজত্বের প্রকৃত অধিকারী কে হতে পারে।

বেদপাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব অর্জিত হয় বলা হয়েছে। এখন বেদ কি এবং বেদ-পাঠও বা কি প্রকার বিচার করতে হয়। বেদের মন্ত্র তথা পাঠ আরম্ভ ওঁকার উচ্চারণ দ্বারা করতে হয়। ওঁকার উচ্চারণটি কি ব্যাপার? ওঁকার উচ্চারণ হলেই তো বেদপাঠের অধিকার হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে উপনিষদে-শ্রুতিতে ওঁকার বা প্রণবের বহু বিবরণ পাওয়া যায়। সেই বিবরণই প্রামাণ্য। বেদব্যাস-কৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উত্তরগীতায় বলা হয়েছে—তৈলধারার মত অচ্ছিন্ন দীর্ঘ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অবাচ্য বা মুখে উচ্চারিত হওয়া অসাধ্য প্রণবধ্বনি; যে জানে সে বেদজ্ঞ। (১) মুখে যে ওঁ ওঁ ধ্বনি করা হয় তাতে ওঁকার ধ্বনি হয় না; স্বতঃউৎসারিত ফোয়ারার জলস্রোতের মত এই নাদ আপনাআপনি শ্রুত হয়। এবং সে নাদ নিরবচ্ছিন্ন টানা ঘণ্টাধ্বনির মত। সদ্‌গুরু কৃপায় সাধন

---

(১) "অচ্ছিন্নং তৈলধারমিব দীর্ঘঘণ্টা নিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবব্যঙ্গং যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥"

পথ অবগত হয়ে সযত্নে নিরন্তর দীর্ঘকাল সেই সাধনাভ্যাস করলে শরীর অভ্যন্তর হতে এই ধ্বনি স্ফুরিত হয়। এই অনাহত ধ্বনি, বাক্‌যন্ত্র দিয়ে আঘাত করে এই ধ্বনির প্রকাশ হয় না। এই ধ্বনি প্রকাশিত হলে তাতে নিমজ্জিত হওয়ার প্রচেষ্টাই প্রকৃত বেদপাঠ। ওঁকার ধ্বনি বা প্রণবই মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পন্থা—এই হল শ্রুতির বিধান। প্রণবধ্বনিতে পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং এইরূপ সিদ্ধ সাধকই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। মুণ্ডকোপনিষদে আছে প্রণবই যেন ধনুক, এবং নিজ বোধরূপ আত্মাই তীর; এই তীরের লক্ষ্য ব্রহ্ম। যিনি অচঞ্চল, স্থির তিনি এই লক্ষ্য ভেদে সমর্থ। সুতরাং নিজেকে তীরের মত প্রণবে তন্ময় হয়ে থাকতে হবে (১) প্রণবধ্বনি যে দেহাভ্যন্তরে শ্রুত অনাহতধ্বনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তার প্রমাণ আছে। বলা হয়েছে—নিজের দেহকে অধর অরণি এবং প্রণবকে উত্তর অরণি স্বরূপ ধ্যান দ্বারা মন্থন করলে গূঢ়রূপে নিহিত দেব বা ব্রহ্মের দর্শন হয়। (২) পূর্বকালে অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্য একজোড়া কাষ্ঠখণ্ড থাকত; তাদের অরণি কাষ্ঠ বলা হত। একখণ্ড নিচে স্থিরভাবে রাখা হত যাকে বলা হত অধর অরণি; আর একখণ্ড ঐ নিচে রক্ষিতখণ্ডের উপর ঘর্ষণ করা হত তাকে বলা হত উত্তর অরণি। এই ঘর্ষণের দ্বারাই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠত এই স্থানে প্রণবধ্যানকে উক্ত অরণিকাষ্ঠের ঘর্ষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় উচ্চবর্ণ প্রাপ্তির সোপান কর্ম ও গুণগত বেদপাঠের অধিকারও গুণকর্মগত। জন্ম হওয়ার পর সদ্‌গুরু দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দ্বিজত্ব হয়, বেদপাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব এবং প্রণবধ্বনিতে আত্মসমর্পণ দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। সোপানে আরোহণের প্রথম সোপান সদগুরুলাভ, অজ্ঞান অন্ধকার দূর করা। ভক্ত তুলসীদাস যথার্থই লিখে গেছেন—

> "সদ্‌গুরু পাবে ভেদ্ বাতাবে জ্ঞান কর উপদেশ।
> তব কোয়েলাকি ময়লা ছুটে জব আগ করয় প্রবেশ॥"

---

(১) "প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥" (মুণ্ডক—৫।২।২।৩৬

(২) "স্বদেহং অরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যান নির্মহনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ।" (শ্বেতাশ্বতর ১।১৪

সদ্‌গুরু দ্বারা জ্ঞান উপদেশ প্রাপ্ত হলে অজ্ঞানরূপ কালিমা দূরীভূত হয়, যেমন অগ্নি সহযোগে কয়লার কালিমা দূরীভূত হয়। বেদপাঠের অধিকার একটি গুণ; সেই গুণ যথাযথ কর্ম দ্বারা অর্জন করতে হয়। যে কোন বর্ণের মানুষই এই গুণ অর্জন করতে পারে যদি নির্ধারিত কর্ম অনুসৃত হয়। সমাজে প্রচলিত রীতি শাস্ত্রোপদেশের মর্মবাণীর অর্থ উপলব্ধি না হওয়ার জন্য—বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ বলে হয়েছে।

গ্রন্থকার একবার গুরু স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরকে গীতাপাঠের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রস্তাব শুনে স্বামীজী মহারাজ বলেছিলেন, "গীতাপাঠ করতে চাও ভালো। কিন্তু কেবল পাঠ করলে তো কিছু বুঝবে না। গীতাপাঠের পূর্বে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন দুটি পড়ে নাও। ঐ দুই দর্শনের ধারণা না হলে গীতার উপদেশের মর্মার্থ বোঝা যায় না।" স্বামীজী মহারাজের এই অমূল্য উপদেশের অর্থ উপলব্ধি হয়েছে বহু বছর পরে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গীতার ভিত্তি সাংখ্য ও পাতঞ্জলোক্ত তথ্যাদির উপর। স্বামীজী মহারাজের অপর এক উপদেশ ছিল গীতার কোন শ্লোকের কোন কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হলে যেন গীতা গ্রন্থের অপর স্থানে সেই শব্দের অর্থ অন্বেষণ করা হয়। গীতাতেই সেই শব্দের যথার্থ অর্থ পাওয়া যাবে। অন্যত্র খুঁজলে গোলমাল হয়ে যাবে।

সাধারণতঃ হিন্দুশাস্ত্র তথা ধর্মগ্রন্থের তিন প্রকার ব্যাখ্যা হয়: আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। বস্তুতঃ শেষোক্ত ব্যাখ্যাই হিন্দু আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশে মহাভারত কাহিনীর বিবরণও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; কারণ মহাভারত আখ্যায়িকাই গীতোপদেশের ভিত্তি।

মহাভারত কাহিনী

পুরাকালে হস্তিনাপুরে মহারাজা শান্তনু নামে এক সূর্যবংশীয় নরপতি ছিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে পরিভ্রমণ সময়ে মহারাজা এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীকে গঙ্গাতীরে দেখতে পান। যুবতীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে যুবতীর নিকটে গিয়ে তার পাণিপ্রার্থী হন। যুবতী অপর কেউই নয়—মানবী রূপধারিণী

স্বয়ং গঙ্গাদেবী ছিলেন। মহারাজার প্রস্তাব শুনে যুবতী বলেন যে তিনি রাা হতে পারেন এক শর্তে। মহারাজা কখনও তাঁর যে কোন কাজে বাধা দি পারবেন না; যদি বাধা দেন তিনি তৎক্ষণাৎ মহারাজাকে ত্যাগ করে চ যাবেন। রূপমুগ্ধ মহারাজা শর্ত মেনে নিলেন। এবং গঙ্গাদেবী হস্তিনাপুরে রাণীরূপে অধিষ্ঠিত হলেন। অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে পত্নীরূপে লাভ ক শান্তনু আনন্দে অধীর। কিন্তু এই আনন্দ অধিকদিন স্থায়ী হয় না। প্রথ পুত্রের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখের অন্ধকার নেমে এল। ভূমিষ্ঠ হবা পরই নবজাত শিশুটি কোলে নিয়ে গঙ্গাদেবী গঙ্গাতীরে চলে যান এবং গঙ্গা বক্ষে নিক্ষেপ করেন। ঘটনার ত্বরিতপ্রবাহে শান্তনু হতচকিত হতভম্ব এ মর্মবেদনায় পীড়িত। কিন্তু পাণিগ্রহণের শর্তস্মরণে মুখ খুলতে সাহস করে না। এইভাবে যথা সময়ে আরও ছয় পুত্রের জন্ম হয় এবং প্রত্যেক বার গঙ্গাদেবী শিশুটিকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করে আসেন। শান্তনু গঙ্গাদেবীে বুঝতে পারেন না; মা হয়ে কোন প্রাণে এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ বারবার করতে পারেন। গঙ্গাদেবীর অষ্টম গর্ভে পুনরায় একপুত্র সন্তান লাভ করেন। এবং পূ পূর্ব বারের মত এবারও গঙ্গাদেবী নবজাতককে কোলে নিয়ে গঙ্গাতীে গমনোদ্যতা। শান্তনু কিন্তু আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। গঙ্গাদেবীর পথরো করে বলেন—"একি করছ? এবার ক্ষান্ত হও!" গঙ্গাদেবী শান্তনুর উপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, "আপনি বিবাহের শর্ত ভঙ্গ করেছেন; এই ধরু আপনার পুত্র।" এই বলে পুত্রটিকে শান্তনুর হাতে তুলে দিয়ে গঙ্গাদে দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে চলে যান এবং তীরে পৌঁছে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন অচিরেই নিজ জলে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যান। শান্তনু কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রাণাধিকা রাণীকে হারিয়ে মর্মব্যথায় ব্যথিত; নবজাত শিশুর মুখ চেয়ে একমাত্র সান্ত্বনা। শিশুর যত্ন, লালনপালনই এখন তাঁর একমাত্র কর্ত এবং তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহমমতা শিশুর উপর বর্ষিত হতে লাগল। য সময়ে শিশুর নামকরণ হল দেবব্রত। ক্রমে রাজপুত্রোচিত সর্বপ্রকার শিক্ষা দীক্ষা, অস্ত্র চালনায় দেবব্রত পারদর্শী হয়ে ওঠেন; কেবল পিতা শান্তনুর নয়; পাত্রমিত্র অমাত্য রাজ সভাসদ সমুদায় প্রজাবৃন্দেরই অত্যন্ত প্রিয় হ ওঠেন। শান্তনুর তো নয়নের মণি। রূপে, গুণে, শৌর্যে, বীর্যে, কর্মকুশলতা

দেবব্রতের মত রাজপুত্র কদাচিৎ দেখা যায়। এই দেবব্রতই মহাভারত কাহিনীর ভবিষ্যৎ মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম।

দেবব্রত তখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন, এমন সময় একদিন মহারাজা শান্তনু পাত্রমিত্র সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ায় যাত্রা করেন। দেবব্রতকে রাজধানীতেই রেখে গেলেন। এই মৃগয়ায় বিপত্নীক মহারাজা শান্তনু আর এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। শিকারের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে মধ্যাহ্ন সময়ে শান্তনু সঙ্গীদের ছাড়িয়ে একাকী এক নদীতীরে উপস্থিত হন, এবং প্রখর সূর্যতাপে ক্লান্ত হয়ে এক বৃক্ষতলে ছায়ায় একটু বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল নদীস্রোতে প্রবহমান রাশি রাশি পদ্মফুল। এই নির্জন বন-ভূমিতে শতশত পদ্মফুল কে নদীতে ভাসাচ্ছে। চতুর্দিকে দেখতে গিয়ে নজরে পড়ল দূরে নদীর ধারে এক অতি রূপলাবণ্যময়ী যুবতী পূজা করছে এবং অঞ্জলি অঞ্জলি পদ্মফুল জলে অর্পণ করছে। গভীর অরণ্যপূর্ণ দেশে মনোরম পরিবেশে এই অপূর্ব দৃশ্য শান্তনুকে মোহাবিষ্ট করে ফেলল। যুবতী যেন দেখতে না পায় এইভাবে গাছের আড়াল থেকে একদৃষ্টিতে মুগ্ধ নয়নে যুবতীকে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবতী নিজ কাজ সাঙ্গ করে উঠে পড়ল এবং নদীর তীর বরাবর পথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে লাগল। শান্তনুও দূরত্ব রক্ষা করে পশ্চাৎ গমন করলেন। কিয়দ্দূর পথ অতিক্রম করে দেখা গেল যুবতী একটি কুটিরে প্রবেশ করল। শান্তনু বুঝলেন যুবতীর ঐ গৃহ। কুটিরের সম্মুখে গিয়ে গৃহস্বামীর উদ্দেশে শান্তনু ডাক দেন; ডাক শুনে ধীবররাজ দাসরাজা ঘরের বাইরে আসেন। তিনিই গৃহস্বামী। শান্তনুকে দেখেই দাসরাজ চিনতে পারেন যে হস্তিনাপুরের মহারাজা তাঁর দরজায় উপস্থিত। হাতজোড় করে প্রার্থনা জানান হুজুরের কি আদেশ। শান্তনু প্রশ্ন করে জানলেন যে ঐ যুবতী তাঁরই কন্যা। বেশী কথা না বলে শান্তনু সোজাসুজি সেই কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। দাসরাজা প্রস্তাব শুনে আনন্দে হতবাক। সত্যবতীর এই সৌভাগ্যের উদয়ে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। সত্যবতী এই যুবতীর নাম। মুখে কিছু প্রকাশ না করে একটু যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ধীবর বলেন; এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। এই গরীবের মেয়ে হস্তিনাপুরের মহারাজার রাণী হবে—এ তো কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনা। অবশ্য আপনার রাজ-অন্তঃপুরের বহু মহীষীর

মধ্যে সে একজন হবে ; তাতে কি আসে যায়।" তাঁর কথা শুনে শান্তনু নির্দ্বিধায় বলেন, "না-না! তোমার কন্যাকে প্রধানা মহিষী পাটরাণী করব!" ধীবর নিজের চতুরতায় সন্তুষ্ট হয়ে এবং শান্তনুর আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করে মনে মনে ভাবলেন আর একটু প্যাঁচ কষে দেখি। প্রকাশ্যে বলেন, "মহারাজা আপনার এই উদারতা ও মহানুভবতা সূর্যবংশের মহত্ত্বেরই লক্ষণ! এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সত্যবতী আমার অতি আদরের কন্যা। মনে অবশ্য একটা সংকোচ থেকে যায় যে সত্যবতীর সন্তান কখনও হস্তিনাপুরে সিংহাসনের অধিকারী হবে না ; সেটা সম্ভবও নয়—দেবব্রতর মত সর্বগুণসম্পন্ন উপযুক্ত যুবরাজ যখন আছেন।" একথা শোনামাত্র শান্তনুর সমুদয় উচ্ছ্বাস ও ও আগ্রহ উবে গেল। তাঁর নয়নের মণি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দেবব্রত ছাড়া অন্য কেউ হস্তিনাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবে এ যে কল্পনাতীত। সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান ত্যাগ করে শান্তনু সোজা রাজপ্রাসাদে চলে যান। কারও সঙ্গে কোন কথা বলেন না। সত্যবতীর অপরূপ সৌন্দর্য এক মহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছেন না ; সত্যবতীকে না পাওয়ার মর্মবেদনায় অধীর হয়ে গেলেন। রাজকার্যে শিথিলতা দেখা দিল, মনের ব্যথা ক্রমশঃ দুর্বল করে ফেলল। প্রথমে রাজ অন্তঃপুরে এ খবর প্রকাশ হল, এবং ক্রমে রাজসভার সভাসদরাও জানতে পারেন মহারাজা মর্মপীড়ায় পীড়িত। কারণও আন্দাজ করেন। কিন্তু সকলেই নীরব। ক্রমশঃ এই খবর রাজকুমার দেবব্রতর কানেও গেল। গোপনে অনুসন্ধান করে দেবব্রত প্রকৃত তথ্য অবগত হন। কারও সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে এবং না জানিয়ে দেবব্রত সোজা ধীবররাজ দাসরাজার গৃহে উপস্থিত হন, এবং শপথ গ্রহণ করেন যে তিনি জীবনে হস্তিনাপুরের সিংহাসন দাবী করবেন না—সে দাবী তিনি ত্যাগ করছেন ; দ্বিতীয়তঃ তিনি জীবনে বিবাহ করবেন না—চিরকুমার থেকে যাবেন, যা দ্বারা তাঁর কোন বংশধরও থাকবে না যারা ভবিষ্যতে হস্তিনাপুরের সিংহাসন দাবী করতে পারে। দাসরাজা সানন্দে সত্যবতীকে দেবব্রতর সঙ্গে মহারাজা শান্তনুর নিকট পাঠিয়ে দেন। তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য পুত্রের এই অতুলনীয় ত্যাগের খবর পেয়ে পিতা শান্তনু অত্যন্ত প্রীত হন। ঐ কঠোর এবং ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য দেবব্রত সেই সময় হতে ভীষ্ম নামে খ্যাত হন।

সত্যবতীর গর্ভে শান্তনু দুই পুত্র লাভ করেন—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ স্বল্পায়ু ছিলেন, অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিচিত্রবীর্য দেহে মনে দুর্বল, রাজপুত্রোচিত শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিলেন না। পরন্তু শান্তনুর দেহত্যাগের পর বিচিত্রবীর্যই হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্য শাসন তথা রাজকার্য পরিচালনা করার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না, ভীষ্মের শৌর্য বীর্য এবং কর্মদক্ষতায় রাজ্য সুশাসিত হচ্ছিল। ক্রমে বিচিত্রবীর্যের যৌবন বাড়তে থাকে। কিন্তু কোন রাজকন্যাকে রাণীরূপে লাভ করার কোন গুণ বা সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। ভীষ্ম চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সময় কাশীরাজের তিন রাজকন্যার স্বয়ম্বরের কথা ঘোষিত হল। ভীষ্ম স্থির করলেন অজ্ঞাতে তিনি ঐ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে রাজকন্যা তিনটিকে বৈমাত্রেয় ভাই রাজা বিচিত্রবীর্যের জন্য লুঠ করে নিয়ে আসবেন।

স্বয়ম্বরের দিন ভীষ্ম রথসজ্জা করে উপস্থিত, কিন্তু সভাস্থল থেকে কিছু দূরে রথকে আড়ালে রেখে নিজেও সভা থেকে কিছুদূরে আত্মগোপন করে সভার কাজকর্মের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন। যখন তিন রাজকন্যা বরমাল্য-হস্তে নিজ নিজ পছন্দ মত বর বাছাই-এর জন্য সভাস্থলে উপস্থিত হন এবং সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গকে নিরীক্ষণ করছেন তখন ত্বরিতগতি ভীষ্ম সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে তিনকন্যাকে ধরে দূরে রক্ষিত নিজ রথোপরে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলেন। প্রথমে ঘটনার দ্রুততায় উপস্থিত রাজন্যবর্গ হতচকিত হয়ে পড়েন। যখন প্রকৃত অবস্থার বোধ হয় সকলে একযোগে ভীষ্মকে আক্রমণ করেন। কিন্তু মহাশক্তিধর যোদ্ধা ভীষ্মের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন কেন ? সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করে ভীষ্ম তিন রাজকন্যাকে নিয়ে হস্তিনাপুরের পথে রথ সঞ্চালন করলেন। তিন রাজকন্যার নাম যথাক্রমে অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা। পথে অম্বা ভীষ্মকে অনুনয় করল যেন তাকে শৃঙ্গলমুক্ত করে ছেড়ে দেন, কারণ সে মনে মনে মদ্ররাজকে পতিত্বে বরণ করেছে। স্বয়ম্বরের পূর্বে কোন রাজকন্যার পক্ষে কোন রাজন্যকে মনে মনে পতি বরণ করা গর্হিত কার্য বলে গণ্য হত। তাই অম্বার কথা শোনা মাত্র ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং শৃঙ্খল মুক্ত করে রথ থেকে ফেলে দেন। অপর দুটি রাজকন্যাকে হস্তিনাপুরে গিয়ে রাজা বিচিত্রবীর্যের হস্তে সমর্পণ করেন।

একই সঙ্গে দুই রাজকন্যাকে রাণীরূপে পেয়ে বিচিত্রবীর্যের খুসীর আ অন্ত নেই! দুই পত্নীকে সম্ভোগের কারণ তিনি দ্রুত আরও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হস্তিনাপুরের সিংহাসন শূন্য হয়ে গেল ভীষ্মই পূর্বের ন্যায় রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। সিংহাসনে উত্তরাধিকারী তো দরকার; সুতরাং সেকালের প্রথা অনুযায়ী ব্যাসদেবকে পুত্রোৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা হয়। বলা হয়, ব্যাসদেবকে দেখে অম্বিক ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন, যে কারণে অম্বিকার গর্ভে অন্ধ পু ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর অম্বালিকা ব্যাসদেবকে দেখে ভয়ে পাণ্ডুর—বর্ণহী হয়ে যান; এবং তাঁর গর্ভের সন্তান হয় বর্ণহীন পাণ্ডুর বর্ণ বা পাণ্ডু। উভয়ে মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও জন্ম অন্ধত্বের কারণ যথাসময়ে পাণ্ হস্তিনাপুরের রাজা ঘোষিত হন। পাণ্ডুর দুই রাণী, কুন্তী ও মাদ্রী। কিন্তু দৈ অভিশাপে রমণী সংস্পর্শ থেকে পাণ্ডুকে দূরে থাকতে হত। কুন্তী কুমা অবস্থাতেই দেবতা আহ্বানের মন্ত্রলাভ করেছিলেন। মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষ জন্য কুমারী অবস্থাতেই সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন এবং তদ্দ্বারা কুমা অবস্থায় এক পুত্রের জন্ম হয়। লোকলজ্জা ও সামাজিক লজ্জার ভয়ে শি পুত্রকে ত্যাগ করেন; এক সূত্রধর সেই শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে নিজ পুত্ররূ লালন-পালন করেন। সেই শিশুই পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে মহাবীর কর্ণ নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়। বিবাহের পর কুন্তী একে একে ধর্মরা পবণদেব এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁর মন্ত্রশক্তি দ্বারা আহ্বান করে পরপর তি সর্বগুণসম্পন্ন পুত্রলাভ করেন। তাঁরা হলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, পবণনন্দ ভীম এবং দেবরাজ পুত্র অর্জুন। কুন্তীর সৌভাগ্য দর্শনে মাদ্রী ঐ মন্ত্রলাভে জন্য অনুনয় করতে থাকেন। ঐ মন্ত্র একবার মাত্র ব্যবহারের শর্তে কু মাদ্রীকে ঐ মন্ত্রদান করেন। বুদ্ধিমতী মাদ্রী ঐ মন্ত্র দ্বারা যুগলদে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করেন এবং যুগলপুত্র নকুল ও সহদেবকে ল করেন। এইভাবে পঞ্চপুত্রে সুশোভিত হয়ে পাণ্ডু আনন্দে আত্মহা অভিশাপের দরুন তিনি রাজধানী হতে দূরে বাস করতেন; সঙ্গে প্রিয় পত্নী থাকতেন, কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করতেন না। পঞ্চপুত্র লাভের পর অ শাপের কথা ভুলে গিয়ে আনন্দে মাদ্রীকে আলিঙ্গন করেন। এবং :

দ মৃত্যুমুখে পতিত হন। পতিশোকে মাদ্রী পতির চিতায় সহমৃতা হন। রাষ্ট্রের পত্নী ছিলেন গান্ধারী এবং গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের জন্ম । যাঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন দুর্যোধন। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অবশ্য র্যাধন বয়সে ছোট ছিলেন।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর হস্তিনাপুরের সিংহাসন পুনরায় খালি হল। রাজপুত্ররা চলেই ছোট; ধৃতরাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে তাঁর শতপুত্র এবং পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র কশত পাঁচ রাজপুত্র রাজঅন্তঃপুরে লালিত-পালিত হতে থাকে। ধৃতরাষ্ট্রের চ পুত্রকে কৌরব বলা হত এবং পাণ্ডুর পুত্রগণকে পাণ্ডব। একটু বুদ্ধি হবার ঙ্গ সঙ্গে দুর্যোধন পাণ্ডবদের হিংসার দৃষ্টিতে দেখে, এবং সুযোগ পেলেই তিসাধন করার চক্রান্ত করে। কিন্তু একশত পাঁচ ভাই-এর মধ্যে ভীম র্বাপেক্ষা বলশালী ছিল, ভীমের ভয়ে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারত না। া জানতে পারে যে তার পিতা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্ধত্বের অজুহাতে িংহাসনের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছেন। আবার যুধিষ্ঠির বয়সে সকলের ড় এবং তাকেই হয়ত ভবিষ্যতে হস্তিনাপুরের সিংহাসন দান করা হবে।

রাজপুত্রদের অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার জন্য আচার্য দ্রোণাচার্যকে নিযুক্ত করা হয়। ল্পকালেই সকল রাজপুত্রদের মধ্যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন অগ্রণী প্রমাণিত হয়। র্যোধনের পক্ষে এও এক দুর্ভাগ্যের বিষয়। একে তো ভীম দৈহিক শক্তিতে র্বাপেক্ষা বলশালী তার উপর অর্জুন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী বীর সাব্যস্ত হওয়ায় ঞ্চভাই পাণ্ডব অজেয় হয়ে উঠেছে। গোপন ষড়যন্ত্র চলতে লাগল; দুর্যোধনের ধান পরামর্শদাতা ক্রূর চক্রান্তকারী মাতুল শকুনি। কিন্তু ধার্মিক খুল্লতাত দুরের গোপন পরামর্শে সব ষড়যন্ত্র বিফল হয়ে যায়। একবার প্রমোদরঞ্জনের মে জতুগৃহ নির্মাণ করে পঞ্চপাণ্ডবকে দাহ করারও চেষ্টা হয়। কিন্তু বিদুর র্বাহ্নেই গোপনে সংবাদ পাঠিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। জতুগৃহদাহ থেকে রক্ষা পয়ে কুন্তীদেবী পাঁচ পুত্রকে নিয়ে দুর্যোধনের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আত্ম-ক্ষার জন্য ছদ্মবেশে দেশে দেশে ঘুরতে আরম্ভ করেন। একবার দরিদ্র াহ্মণের বেশে এক ব্রাহ্মণের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেন। ঐ সময় ঘাষণা হয় পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হবে। স্বয়ম্বরের শর্ত ভিন্ন কমের ছিল; শূন্যে ধাতুনির্মিত এক মৎস্য রক্ষিত ছিল, তার নিচে এক চক্র

সর্বসময় ঘূর্ণায়মান, নিচে ভূতলে এক জলাশয় ছিল। রাজকন্যার পাণি প্রার্থীকে জলাশয়ে শূন্যে রক্ষিত ঘূর্ণ্যমান চক্র ও মৎস্যের ছায়ার দিকে লক্ষ্য রেখে ধনুর্বাণ ঊর্ধ্বমুখে চক্রের মধ্য দিয়ে তীর নিক্ষেপ করে মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করতে হবে। সফল তীরন্দাজের হাতে রাজকন্যা দ্রৌপদীকে সমর্পণ করা হবে। রাজকন্যার স্বয়ম্বরে স্বাভাবিকভাবেই রাজন্যবর্গরা প্রার্থী। বিভিন্ন দেশের ভূপতি ও রাজপুত্র স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত; বহু ব্রাহ্মণও তামাসা দেখার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছেন। গৃহস্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মণঘরণী পাঁচ ভাই পাণ্ডবও স্বয়ম্বর দেখতে আসেন। রাজন্যবৃন্দ হতে ব্রাহ্মণগণের পৃথক বসার ব্যবস্থা।

উপস্থিত রাজন্যগণ একে একে লক্ষ্যভেদ করতে এগিয়ে আসেন, কিং অসফল হয়ে অধোমুখে ফিরে আসেন। সকল ক্ষত্রিয় যখন লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হলেন, তখন, রাজা দ্রুপদ চিন্তাকুল হয়ে ওঠেন। নির্ধারিত দিনে কন্যা সমর্পণ করার নিয়ম, কিন্তু কোন রাজন্যই তো শর্ত পালনে সমর্থ হলে না। তখন তিনি ঘোষণা করেন উপস্থিত জনগণের মধ্যে যে কেউ ঐ লক্ষ্য ভেদ করতে সমর্থ হবেন, তাঁর হাতেই রাজকন্যা দ্রৌপদীকে সমর্পণ করবেন বড় বড় ক্ষত্রিয় বীর যে স্থলে অসমর্থ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন সাহসে এগিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণ বেশধারী অর্জুন তখন ভ্রাতাদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন যুধিষ্ঠির বুঝলেন অর্জুন চেষ্টা করতে ইচ্ছুক। তিনি সম্মতি প্রদান করেন এবং অর্জুন উঠে দাঁড়ান। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে লক্ষ্যভেদে আগ্রহী দেখে রাজন্য বর্গ টিটকারী দিয়ে উঠলেন এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁদেরই একজনের এই প্রকার দুর্মতি এবং রাজকন্যা লাভের লোভ দেখে ধিক্কার দিতে শুরু করেন কিন্তু অর্জুনের কোনদিকে দৃক্‌পাত নেই। আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়, বলি সুঠাম দেহ দেখে কিন্তু অনেক ভূপতির সন্দেহ হল, কে এই বীরের মত দেখতে ব্রাহ্মণ—চিন্তা করতে থাকেন। অর্জুন লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়ে অবলীলাক্রমে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে, নিচে জলাশয়ে দৃষ্টি রেখে ঊর্ধ্বে তীর নিক্ষেপ করেন। তীর চক্রের মধ্য দিয়ে মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করে দ্বিখণ্ডিত মৎস্যকে ভূপাতিত করেন। অবাক বিস্ময়ে সভায় সাধু সাধু ধ্বনি হতে লাগল যে সকল ব্রাহ্মণ পূর্বে অর্জুনকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন—তাঁরা এখন সগর্বে

াদেরই স্বজাতীয় একজনের বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাজন্যবর্গ লজ্জায় ়পমানে অধোমুখ। সভায় হট্টগোল, গোলমাল। এরই মধ্যে রাজা দ্রুপদ াঞ্চালির হাতে ধরে অর্জুনের হাতে সমর্পণ করলেন। পাঁচভাই পাণ্ডবও পচাপ সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।

এদিকে মাতা কুন্তীদেবী পুত্রদের বাড়ি ফিরতে দেরী দেখে চিন্তিতা। ন্যান্য দিন সন্ধ্যার পূর্বেই সকলে ফিরে আসেন, আজ সন্ধ্যা পার হয়ে গছে; তবুও ফিরছে না কেন? কোন বিপদ হয়নি তো? এমন সময় পুত্রদের াওয়াজ শুনে বুঝলেন তাঁরা ফিরছেন। বাইরে থেকেই যুধিষ্ঠির ডেকে লেন, "দেখ মা! তোমার জন্য কি অমূল্য জিনিষ সঙ্গে এনেছি।" ঘরের ভতর থেকেই জননী বলেন, "যা পেয়েছ পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও।" দ্রুত রে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠির দ্রোপদীকে দেখিয়ে বলেন, "দেখ মা, অর্জুন পাঞ্চাল-াজের স্বয়ম্বর সভা থেকে কাকে জয় করে এনেছে; পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী।" স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের কীর্তি বর্ণনা করে বলেন, "মা? এ কি আদেশ তুমি করলে? জয় করা রাজকুমারী; তারই একমাত্র অধিকার। পাঁচভাই কি করে ভাগ করে নেব?" কুন্তীদেবী অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকন্যাকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল; কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও—এখন কি করি। মাতৃআজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং সব দিক চিন্তা করে স্থির হয় দ্রৌপদী পাঁচ ভাইয়েরই পত্নী হবেন।

অল্পদিনের মধ্যে চতুর্দিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়ে গেল যে দ্রুপদ রাজার স্বয়ম্বরে সফল বীর ব্রাহ্মণ নন, তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জুন। রাজা দ্রুপদও সেই সংবাদ পেয়ে মহানন্দে পূর্ণ হয়ে গেলেন। তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। এখন আর গোপনীয়তা রক্ষা করার দরকার নেই। পঞ্চপাণ্ডব মাতা কুন্তী ও স্ত্রী দ্রৌপদীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হন। দুর্যোধন ও তাঁর সহায়-কারী ছাড়া রাজ্যের সকলেই আনন্দিত। যথা সময়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আসীন হন। কিন্তু দুর্যোধন বাধা দিতে ছাড়েননি। তিনি নিজের দাবীও জোরের সঙ্গে পেশ করেন। অবশেষে রাজ্যের সকল প্রধানের সর্ব-সম্মত রায় অনুসারে যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনাপুরের রাজ্যপাট প্রদান করা হয়। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও অবশেষে সকলের সিদ্ধান্তে রাজী হয়ে যান।

এবারও দুর্যোধন ব্যর্থ মনোরথ। কিন্তু কোন আশা ত্যাগ করতে রাজী নয়। ছলে, বলে, কৌশলে কি করে যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনচ্যুত করা যায় চিন্তা করতে থাকেন। তাঁর চির-সহযোগী, কুচক্রী মামা শকুনি তো আছেনই। মামা-ভাগিনেয় পরামর্শ করে ঠিক করেন যে যুধিষ্ঠিরকে ছদ্ম নিয়মবিরুদ্ধ দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাস্ত করে সর্বস্ব কেড়ে নিতে হবে।

দ্যূতক্রীড়া রাজারাজড়াদের খেলা; দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হলে কোন রাজাই সাধারণতঃ সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন না। ছল করে শকুনি মন্ত্রঃপুত অক্ষ ব্যবহার করেন, যুধিষ্ঠির বার বার পরাস্ত হতে থাকেন, এবং তৎ-সঙ্গে পণের দ্রব্যসামগ্রী ও অবশেষে পরাজয়ের পণস্বরূপ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস, এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করতে হয়। সিংহাসন ছেড়ে চারভাই এবং পত্নী দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে বনবাসে চলে যান। একবৎসর অজ্ঞাতবাসকালে একজনকেও কেউ চিনে ফেললে পুনরায় বার বৎসর কাল বনবাস করতে হবে এই ছিল অক্ষক্রীড়ার শর্ত। দুর্যোধন ভাবল ঐ একবৎসর কালের মধ্যেই পাণ্ডবদের চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে চিনে ফেলা হবে এবং পুনরায় তাদের বার বৎসরের জন্য বনে পাঠাতে পার। যাই হোক, নানা প্রতিকূল অবস্থা পার হয়ে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ শর্তপূরণ করে আত্মপ্রকাশ করে এবং সিংহাসনের দাবী করে। এবার দুর্যোধন ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে সোজা বলে দেয় সিংহাসন তো ফিরিয়ে দেবেই না, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও ছেড়ে দেবে না। অতএব যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন পথ আর রইল না। ফলে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাই মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের মহারণ। রণসজ্জায় উভয় পক্ষ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের যে কথোপকথন হয় তা-ই শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ নামীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহোপদেশ। সংক্ষেপে এই হল কুরুক্ষেত্র রণের পূর্ব পর্যন্ত মহাভারত কাহিনী।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মহাভারত একটি রূপক কাহিনী। এই রূপকের অনুসন্ধানের পূর্বে রূপকের পূর্ণচিত্র প্রকাশের নিমিত্ত সত্যবতীর বিষয়ে আখ্যায়িকার উল্লেখ প্রয়োজন।

সত্যবতীর উপাখ্যান ঃ একদিন ধীবর দাসরাজা গভীর জলে মাছ ধরতে যান। জালে একটি সুবৃহৎ মৎস্য ধরা পড়ে। জালস্থ মৎস্যটিকে বাড়িতে নিয়ে

দ যখন মাছের পেটটা কাটেন তখন অবাক হয়ে দেখেন মাছের পেটে অতি রূপবতী মানবকন্যা। ধীবর কন্যাটিকে আদরে লালন-পালন করতে গলেন। এবং কালে সেই কন্যা এক অতুলনীয় সুন্দরীরূপে পরিগণিত হয়। ন্তু একটি দোষে কন্যা ও কন্যার পিতা সব সময় বিমর্ষ হয়ে থাকে। মাছের টে থাকার দরুন কন্যার সর্ব শরীর থেকে মাছের দুর্গন্ধ নির্গত হয়; সকলেই কে মৎস্যগন্ধা বলে। দাসরাজের চিন্তার শেষ নেই। কত চিকিৎসা, কত জড়ি-, কত তুকতাক, কিছুতেই কিছু হয় না। সবশেষে মনে হয় কোন মহাপুরুষের া হলে কন্যা হয়তো দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে। ভেবেচিন্তে নদীর খেয়া-টের নিকটে এক বৃক্ষতলে কন্যাকে বসিয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। কোন ক্তিধর মহাপুরুষ খেয়া পার হলে হয়তো তাঁর কৃপা হলে সে এই অভিশাপ কে মুক্ত হবে। উপদেশ মত মৎস্যগন্ধা গাছের তলায় একাকী বসে অপেক্ষা তে লাগল। সৌভাগ্যবশে অপর পার থেকে খেয়া পার হয়ে পরাশর মুনি পারে পদার্পণ করেন। পথ চলতে গিয়ে ওদিকে তাকাতেই নজর পড়ল বৃক্ষ ল উপবিষ্ট মৎস্যগন্ধার উপর। এই অপরূপ সুন্দরী যুবতী কন্যাকে একাকী নির্জন স্থানে বসে থাকতে দেখে মুনিবর বিস্মিত হলেন। নিকটে গিয়ে দার ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করেন। করুণ কাহিনী শুনে মুনিবরের মনে দয়ার রক হল। তিনি কন্যাকে নৌকায় করে কুয়াশায় আচ্ছাদিত এক কৃষ্ণদ্বীপে য় যান এবং তথায় তাকে গর্ভদান করেন। গর্ভদানের সঙ্গে সঙ্গে কন্যার হের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে পদ্মগন্ধে পরিণত হয়। মুনিবর তখন তাকে উপদেশ রন যদি পদ্মফুল দিয়ে নিত্য পূজা করে তবে একদিন ধরণীর অধীশ্বরের ঙ্গ মিলিত হতে পারবে। এই মিলনের ফলস্বরূপ পদ্মগন্ধার এক পুত্রলাভ । কৃষ্ণদ্বীপে জন্মলাভের কারণ তার নাম হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। এই পুত্রই বেদ সংকলয়িতা বেদব্যাস। পদ্মগন্ধাযুক্তাও সত্যবতী নামে পরিচিতা হন।

মহাভারতের রূপকত্ব

গীতাপাঠ আরম্ভের পূর্বে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন পাঠের স্বামীজী হারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরের উপদেশের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারত াহিনীর পূর্বভাগ বস্তুতঃ কপিলের সাংখ্য দর্শনেরই রূপক।

সাংখ্যের মতে সৃষ্টির তিন মৌলিক তত্ত্ব হল, (১) পরমপুরুষ, (২) পুরুষ এবং (৩) প্রকৃতি বা জড় প্রকৃতি। পরমপুরুষই একমাত্র সত্যবস্তু ; অখণ্ড চৈতন্য পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর নামেও অভিহিত হয়। পরমপুরুষের দুই দিক, দুই গুণ, দুই প্রকৃতি বা অভিব্যক্তি ; এক চৈতন্য প্রকৃতি এবং অপর জড় প্রকৃতি। চৈতন্য সকল সৃষ্ট বস্তুতে অনুস্যূত থাকে বলেই পুরুষ নাম হয়। জড় প্রকৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে সত্ত্ব, রজ তমোগুণের সাম্যাবস্থা মাত্র। চৈতন্য সন্নিধানে বিকৃত হওয়াই প্রকৃতির ধর্ম, এবং এই বিকৃতি গুণেই সৃষ্টি সম্ভব হয়। চুম্বক পাথরের সন্নিধানে চৌম্বিক পদার্থের চুম্বকত্ব ধর্মপ্রাপ্তির সঙ্গে উক্ত বিকৃতির তুলনা করা হয়।

লৌহচূর্ণ চৌম্বিক পদার্থ ; ঐ লৌহচূর্ণকে চুম্বকের সন্নিকটে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত করলে লৌহচূর্ণ চুম্বকের ধর্মপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞান মতে সকল চৌম্বিক পদার্থ চুম্বক অণু দ্বারা গঠিত। তবে অণু সব এমনভাবে অবস্থিত যে একের আকর্ষণী শক্তি অপর একটির বিক্ষেপণ শক্তি দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং তৎসঙ্গে তার আকর্ষণী শক্তিও বিকশিত হয়। এইভাবে চৌম্বিক পদার্থ, যেমন লৌহচূর্ণ চুম্বক রূপে পরিণত হয়।

অখণ্ড চৈতন্যের সন্নিধানে থাকায় ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতিতে চৈতন্য উপহিত হয় এবং ফলস্বরূপ ক্রিয়াত্মক রজোগুণ ক্রিয়াশীল হয়ে প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণকে প্রকাশিত করে। সত্ত্বগুণের প্রকাশ হলেই তদাবপরীত আবরণাত্মক তমোগুণেরও প্রকাশ হয়। এই হচ্ছে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি ; গুণবিগর্হিত প্রকৃতি গুণপ্রকাশে চিত্রিত হওয়ার মত অবস্থা। সাংখ্য দর্শনে এই অবস্থাকে মহৎ তত্ত্ব বলা হয়। এই অবস্থা স্বল্পকাল মাত্র স্থায়ী হয় এবং এতে এক অহং বুদ্ধির প্রকাশ হয়। এইভাবে জীবে প্রকাশ নেই। সাংখ্য দর্শনে এই দ্বিতীয় বিকার অবস্থার নাম অহংকার তত্ত্ব। চৈতন্য প্রতি তত্ত্বে তথা প্রতি সৃষ্টবস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকে ; চৈতন্য অবস্থিত না থাকলে প্রকৃতি সৃষ্টি কার্যে অক্ষম। অহংকারতত্ত্ব পুনঃবিকৃত হয়ে সত্ত্বগুণ প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হয় ; তখন তার নাম হয় সত্ত্ববুদ্ধি বা বুদ্ধিতত্ত্ব, এবং বিপরীত আবরণাত্মক তমোগুণও প্রকৃষ্টভাবে প্রকটিত হয়। এই গুণের তখন নাম হয় আনন্দত্ব বা

---

(১) "সৎ সন্নিধানাৎ মণিবৎ "—
(সৎ অর্থে চৈতন্য, মণি অর্থে অয়স্কান্ত মণি বা চুম্বক প্রস্তর)।

ন। মধ্যবর্তী ক্রিয়াত্মক রজোগুণের ক্রিয়াশীলতাই এই প্রকাশের মূলে। এই তিন গুণের স্পষ্টীকরণের সঙ্গে প্রকাশিত হয় ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নামীয় পঞ্চতত্ত্ব। এরপর প্রকাশিত হয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম বিষয়। পঞ্চতন্মাত্র পুনঃবিকারপ্রাপ্ত হয়ে পঞ্চমহাভূতের তথা স্থূল বিশ্বের উপকরণ সৃষ্টি করে।

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ঃ অব্যক্ত প্রকৃতি, মহৎ তত্ত্ব, অহংকার, বুদ্ধি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত—সাংখ্য দর্শনের মতে সৃষ্টির এই হল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

মহাভারত কাহিনীর নায়কনায়িকার নামের বুৎপত্তি অনুসন্ধান করলে কাহিনীর রূপকত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১। শান্তনু ঃ সমং (স্থির, নিরুদ্বেগ, সর্বেশ্বর, অদ্বিতীয়) তনু ঃ (আকার, রূপ) যস্য সঃ (যাহার)। এই নাম দ্বারা সাংখ্য দর্শনের পরমপুরুষকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। শান্তনুর দুই স্ত্রী ঃ

২। গঙ্গা ঃ গাং (ব্রহ্মাণ্ডং ; সমুদায় সৃষ্টিতে) গচ্ছতি ইতি (অবস্থিত বা থাকে)। সাংখ্য দর্শনোক্ত পরমপুরুষের চৈতন্য প্রকৃতি বা পুরুষ।

৩। সত্যবতী ঃ সত্যং (চৈতন্যং) বর্ততে যস্যাং (যাতে বর্তমান থাকে বা অধিষ্ঠিত হয়। সাংখ্যের পরমপুরুষের জড় প্রকৃতি যাতে চৈতন্য অধিষ্ঠিত বা উপহিত হয়ে সৃষ্টির উদ্ভব হয়।

৪। চিত্রাঙ্গদ ঃ অঙ্গ (আকার, দেহ), চিত্রিত (অসাম্য) যস্য। যার দেহ চিত্রিত বা অসাম্য। সাংখ্য দর্শনের মহৎতত্ত্বেরই এই নাম প্রতীক।

৫। বিচিত্রবীর্য ঃ বিচিত্র (বহু প্রকার, অনেকরকম) বীর্য (ক্ষমতা) যস্য সঃ) (যার, তিনি)। সত্যবতীর দুর্বল এই দ্বিতীয় পুত্র বস্তুতঃ অহংকারের প্রতীক। অহংকারতত্ত্বের বিকৃতিতেই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বিষয়াদি প্রকাশিত হয়ে সৃষ্টির বিচিত্র সূক্ষ্ম উপকরণ সৃষ্ট হয়।

৬। অম্বিকা ঃ চিত্তের সংশয়াত্মক বৃত্তি।

৭। অম্বালিকা ঃ চিত্তের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি।

৮। ধৃতরাষ্ট্র ঃ ধৃতং (বা উপলব্ধ) রাষ্ট্র (সংসার বা দৃষ্ট বিশ্ব প্রপঞ্চ)।

ধৃতরাষ্ট্র সংশয়াত্মক বৃত্তি হতে উদ্ভূত সংশয়াত্মক মন ; স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অক্ষমতা। সংসার দৃশ্য যার দ্বারা পরিস্ফুট।

৯। পাণ্ডু = বর্ণহীন, নির্মল ; নিশ্চয়াত্মিকা স্বচ্ছ বুদ্ধি। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি থেকে উৎপন্ন।

১০। কুন্তী = কুন্‌ধাতু আহ্বান করা ; যাঁর দৈবশক্তি আহ্বানের ক্ষমতা আছে।

১১। মাদ্রী = মদ্ ধাতু মত্ততা অর্থ নির্ণায়ক ; যাঁর মত্ততা প্রকাশ করা ধর্ম।

পঞ্চপাণ্ডব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব বস্তুতঃ পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক ; যথাক্রমে ব্যোমতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, বহ্নিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব এবং ক্ষিতিতত্ত্ব।

এক্ষণে পরমপুরুষ শান্তনুর গঙ্গা বা চৈতন্য প্রকৃতিজাত অষ্টপুত্রের রূপকত্ব জ্ঞাত হওয়া দরকার।

"দর্শনশাস্ত্রে" "সমষ্টি" ও "ব্যষ্টি" এই দুইটি শব্দের ব্যবহার হয়। বহু বৃক্ষরাজি সমন্বিত বনকে সমষ্টি ও প্রতি বৃক্ষকে ব্যষ্টি বলা যায়। সৃষ্টির সমস্ত স্তরে অনুস্যূত চৈতন্যের প্রতি স্তরে, এই দৃষ্টিতে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। সমষ্টিগতভাবে অজ্ঞানাবরণকে "মায়া" এবং ব্যষ্টিগত আবরণকে "অবিদ্যা" বলা হয়।

চৈতন্যের বিভিন্ন নাম,

মায়োপহিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি কারণ-শরীরে যে চৈতন্য বর্তমান তাকে "ঈশ্বর" বলা হয় ; এবং অবিদ্যা উপহিত ব্যষ্টিকারণ-শরীরে অবস্থিত চৈতন্যকে বলা হয় "প্রাজ্ঞ"।

মায়োপহিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে স্থিত চৈতন্যকে "হিরণ্যগর্ভ" বলা হয় ; এবং অবিদ্যা উপহিত ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত চৈতন্যকে "তৈজস" বলা হয়।

উক্ত ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি স্থূল শরীরে স্থিত চৈতন্যকে "বিরাট" এবং ব্যষ্টি স্থূল শরীরে অবস্থিত চৈতন্যকে "বিশ্ব" বলা হয়।

একই চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরে স্থিত চৈতন্য সমষ্টি

দৃষ্টিতে "ঈশ্বর", "হিরণ্যগর্ভ" এবং "বিরাট" এবং ব্যষ্টি দৃষ্টিতে "প্রাজ্ঞ," "তৈজস" এবং "বিশ্ব" এই ছয় প্রকারের নাম প্রাপ্ত হয়।

চৈতন্যের আরও দুই নাম প্রচলিত আছে; একটি হল "কূটস্থ চৈতন্য" এবং অপরটি "আভাস চৈতন্য" বা "সাক্ষী চৈতন্য"। কূটস্থ চৈতন্য শব্দের অর্থ যে চৈতন্য কূটবৎ—পোদ্দারের নেয়াইর মত—নিজে অপরিবর্তিত থেকে অন্য বস্তুর পরিবর্তন সাধিত করে। এই চৈতন্য সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সূত্রবৎ অবস্থিত থাকার কারণ সর্বপ্রকারে তৎ বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হয় এবং সেই চৈতন্যকে কূটস্থ চৈতন্য বলা হয়। গীতায় এই চৈতন্যকে পুরুষোত্তমও বলা হয়েছে, এবং গীতার বক্তা অধিযজ্ঞও এই চৈতন্য।

উক্ত সাতপ্রকার চৈতন্যের অনুভব হয় না, চৈতন্যেই একীভূত হয়ে থাকে; মহাভারত কাহিনী অনুসারে "গঙ্গাপুত্র গঙ্গার জলেই নিমজ্জিত।"

অপর এক চৈতন্য আছে, সেটি বস্তুতঃ কূটস্থ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস মাত্র; এ জীবের দর্শন শক্তি। এই শক্তিও কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত। চিত্তে প্রতিবিম্বিত এই চৈতন্য শক্তি মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রবাহিত সুখ দুঃখ ইত্যাদিরূপে যে সংস্কার চিত্তে প্রতিফলিত হয় সেই সঙ্গে একাত্মভাব হয়ে "জীব" আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। এই অস্মিতা বা সাক্ষী চৈতন্যই মহাভারত কাহিনীর গঙ্গাদেবীর অষ্টম পুত্র ভীষ্ম।

চৈতন্য-প্রকৃতি গঙ্গার আট পুত্র, এই পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যে নিমজ্জিত তথা একীভূত সাত—যথা ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব এবং কূটস্থ চৈতন্য; জীবে অনুভূত অষ্টমপুত্র আভাস চৈতন্য। ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞ একত্রে "বিষ্ণু", হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস একসঙ্গে "ব্রহ্মা" এবং বিরাট ও বিশ্ব একসঙ্গে "মহেশ্বর"—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সাধনকর্তা এই তিন মুখ্য হিন্দু দেবতা।

প্রথম অধ্যায়

অর্জুন বিষাদযোগ তথা সৈন্যদর্শনযোগ

স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বর বলতেন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্তমানের মত পৃথক ভূমিকা লিখিত হওয়ার প্রচলন ছিল না; গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকারূপে গণ্য হত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হত। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এই কারণে এই অধ্যায়ের প্রতি শ্লোক অর্থবহ এবং যত্ন সহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

প্রথম শ্লোক, বিশেষতঃ শ্লোকের প্রথম দুই শব্দ, গভীর অর্থবহ। শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করছেন, "হে সঞ্জয়! আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ যুদ্ধসাজে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে কি করল?" (১)

ধৃতরাষ্ট্র শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে; "মন" যা দিয়ে সংসাররূপ রাষ্ট্র চলছে। "সম্যক প্রকারে জয়" করাকে সঞ্জয় বলে; যার অর্থ প্রজ্ঞা বা দিব্যচক্ষু। মহাভারত আখ্যায়িকায় আছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক পূর্বে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বিবরণ জানাবার জন্য ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করে তাঁর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। চর্মচক্ষে দৃষ্ট ব্যাখ্যান নয়। শ্লোকের প্রথম দুই শব্দ "ধর্মক্ষেত্র" এবং "কুরুক্ষেত্র" প্রকৃত-পক্ষে ভারতযুদ্ধের যথাযথ প্রকৃতি নির্ণায়ক। এই দুই শব্দ দ্বারা গীতায় নির্দিষ্ট হয়েছে এই যুদ্ধ কি প্রকারের এবং কোথায় বা কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বা হয়। একই "ক্ষেত্র" শব্দ "ধর্ম" এবং "কুরু" এই পৃথক শব্দ দ্বারা বিশেষিত হয়ে উক্ত দুই শব্দের উদ্ভব। সুতরাং শব্দ দুইটির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে হলে প্রথমে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ নির্ণয় করা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে ক্ষেত্র শব্দে খেত বা ভূমি বুঝায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে

(১) "ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ।
মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥" (গীতা ১/১)

স্বরূপ। স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরের উপদেশ ছিল গীতার গূঢ় কোন শব্দের অর্থ কি তা গীতা থেকেই জেনে নিতে হবে। দেখা যায় গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। অধ্যায়ের নামও "ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ"। অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্লোকে "ক্ষেত্র" শব্দের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।

প্রথম শ্লোকে বলছে প্রকৃতি এবং পুরুষকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। (১) দ্বিতীয় শ্লোকে বলছে এই দেহ বা শরীরই ক্ষেত্র নামে অভিহিত। (২) ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বিস্তৃতভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের বিকার বর্ণনা দেওয়া আছে। যথা পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত প্রকৃতি, মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র বা বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহাবয়ব, চেতনা এবং ধৃতি বা ধারণশক্তি সংক্ষেপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের বিকার। (৩)

গীতা থেকে প্রাপ্ত উক্ত অর্থ গ্রহণ করলে "ক্ষেত্র" নিজের মধ্যেই অনু-সন্ধান করতে হবে। "ধর্ম" শব্দ ধারণ করা থেকে উৎপন্ন ; যার দ্বারা ধৃত। সাংখ্য দর্শনে বলা হয় চৈতন্য বা পুরুষ উপহিত বা অধিষ্ঠিত হলে প্রকৃতির বিকার হয় এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বিকৃত তত্ত্বাদি সৃষ্ট হয় ; পরন্তু চৈতন্য বা পুরুষের অবর্তমানে এই সৃষ্টি থাকতে পারে না। সুতরাং ধর্মক্ষেত্র অর্থে চৈতন্য দ্বারা ধৃত প্রকৃতির উক্ত বিকারসমূহ।

কুরু শব্দ "কৃ" ধাতু থেকে উৎপন্ন ; অর্থ কাজ করা। শরীরই কাজ করার ক্ষেত্র। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বলার উদ্দেশ্য এই অর্থে পঞ্চভূতাদি সূক্ষ্ম বস্তু এবং ইচ্ছা দ্বেষ আদি বৃত্তিযুক্ত মানব শরীরকে লক্ষ্য করা। যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই প্রতি-পক্ষ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র কৌরবগণ এবং পাণ্ডুপুত্র পঞ্চপাণ্ডব এবং তাদের সহকারী। ধৃতরাষ্ট্র শব্দ দ্বারা "মন" বলা হয়েছে, অতএব কৌরব মনোজাত সংকল্প বিকল্পা-

(১) "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ।" (গীতা ১৩/১)

(২) "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে॥" (গীতা ১৩/২)

(৩) "মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিঃ অব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥" (গীতা ১৩/৬)
"ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতদ্ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং উদাহৃতম্॥" (গীতা ১৩/৭)

ত্মক বৃত্তিসমূহ ; পাণ্ডু বর্ণহীন, নির্মল বুদ্ধিতত্ত্ব এবং পাণ্ডব অর্থে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিসমূহ বুঝতে হয়। এই দুই বিপরীতমুখী বৃত্তিসমূহ বু যে দ্বন্দ্ব প্রতি সাধকেরই অনুভূত হয় সেই দ্বন্দ্বই প্রকৃত প্রস্তাবে কুরুক্ষেত্র

বলা হয়ে থাকে মানুষের একশত এক প্রধান নাড়ী আছে ; তার এক শরীরের সম্মুখভাগে অবস্থিত। নাড়ী শব্দে প্রাণবায়ুবাহী গতিপথ বলা হ রাষ্ট্র বা সংসার—বিশ্ব প্রপঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ। শরীরের পশ্চ ভাগ রূপকভাবে রাষ্ট্র থেকে দূরে বন। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে মস্তক থে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত লম্বমান সুষুম্না নাড়ী শরীরের প্রধান নাড়ী, এবং বুদ্ধির স্থা বুদ্ধির রূপক পাণ্ডুকে দৈব অভিশাপে যে রাজ্য থেকে দূরে বাস করতে সুষুম্নার উক্ত অবস্থিতিরই রূপক প্রকাশ। সুষুম্না নাড়ীকে দুই ভাগে দর্শ হয়েছে ; নাভিদেশ থেকে ঊর্ধ্বভাগ দৈবীশক্তি আকর্ষণ শক্তি কুন্তীর স্থ এবং নাভির নিম্নভাগ মত্ততাকারী শক্তি মাদ্রীর স্থান। এরাই পাণ্ডুর দুই প বলে মহাভারত কাহিনীতে বর্ণিত। শরীরের সম্মুখভাগের একশত না মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রিয়াশীল এবং মনোজাত বৃত্তিসমূহের উৎপাদক

যোগশাস্ত্রে কথিত আছে সুষুম্না ক্ষেত্রে নাভিদেশে মণিপুর চক্র অবস্থি এবং ঐ চক্র বহ্নিতত্ত্বের স্থান ; হৃদয়স্থিত অনাহত চক্রে বায়ুতত্ত্বের স্থান এ কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্রে ব্যোমতত্ত্বের স্থান। এরাই কুন্তীর তিন পুত্র নামে বর্ণি মূত্রদ্বারদেশে স্বাধিষ্ঠান চক্র জলতত্ত্বের স্থান এবং গুহ্যদেশে মূলাধার চ ক্ষিতিতত্ত্বের স্থান—এবং এই দুই মাদ্রীর পুত্ররূপে কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে পঞ্চপাণ্ডব বস্তুতঃ সুষুম্না নাড়ী অন্তর্গত পঞ্চচক্রে অবস্থিত পঞ্চতত্ত্বের রূপ প্রকাশাত্মিকা বুদ্ধি তত্ত্ব সত্তা বা চৈতন্য প্রকাশক এবং সংকল্প বিকল্পাত্মক বিকর্ষণ ধর্মী আবরণাত্মিকা : চৈতন্যকে আবৃত করাই মনের ধর্ম। প্রতে জীবের অন্তরের এই হল সনাতন দ্বন্দ্ব গীতায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধরূপে রূপক প্রাপ্ত। এই কারণে গীতার উপদেশ যোগশাস্ত্র উপনিষদ নামে পূজিত প্রশংসিত।

এস্থলে প্রাচীন ভারতের তিনটি প্রধান রাজবংশের আধ্যাত্মিক পরি প্রদান করা প্রয়োজন। এই তিন রাজবংশ হল সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ এবং ব বংশ। সুষুম্না নাড়ীর অবস্থানের বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে ; সুষুম্নার দ

ার্শ্বে সমান্তরালে মস্তিষ্ক থেকে গুহ্যদেশ পর্যন্ত লম্বভাবে পিঙ্গলা নাড়ী এবং ম পার্শ্বে একইভাবে ইড়া নাড়ী অবস্থিত। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী থেকে ত শত নাড়ী উত্থিত হয়ে সারা শরীরে পরিব্যাপ্ত। পিঙ্গলাকে সূর্য নাড়ী বং ইড়া নাড়ীকে চন্দ্র নাড়ী বলে। পিঙ্গলা নাড়ী থেকে প্রসারিত নাড়ী-মূহই সূর্যবংশ এবং ইড়া নাড়ী থেকে প্রসারিত নাড়ীসমূহ বস্তুতঃপক্ষে চন্দ্র-শ। পিঙ্গলা ও ইড়া নাড়ী সুষুম্না নাড়ীর ছায়াস্বরূপ এবং সুষুম্না দ্বারা ভাবিত। বৃষ্ণি শব্দের অর্থ প্রভুত্ব করা; সেইজন্য সুষুম্না থেকে প্রসারিত াড়ীসমূহকে বৃষ্ণিবংশ বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণের যে বংশে জন্ম।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে উপস্থিত উভয় পক্ষের সেনানায়কগণের পরিচয় এই ধ্যায়ের প্রথমভাগে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নায়কগণের নামের শব্দগত ৎপত্তি অনুসন্ধান করলে ঐসব নাম প্রকৃতপক্ষে পাতঞ্জল যোগদর্শনে প্রদত্ত ভিন্ন তত্ত্বেরই দ্যোতক। পাণ্ডব সেনানায়কদের বিবরণ দিয়ে দুর্যোধন দ্রোণা-র্যকে বলছেন—"হে আচার্য! দেখুন আপনার সুযোগ্য শিষ্য দ্রুপদ-জপুত্র পাণ্ডবগণের কি মহান ব্যূহ রচনা করেছে, যেখানে ভীম ও অর্জুনের মকক্ষ মহাযোদ্ধা সব উপস্থিত; যেমন যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, বিক্রান্ত, উত্ত-মৌজা, সৌভদ্র এবং মহারথী দ্রৌপদীর পুত্র সমুদায় রয়েছেন।" (১) অতঃপর কৌরব সেনানীদের উল্লেখ করে বলেন, "হে দ্বিজোত্তম! আপনি, ভীষ্ম, র্ণ, কৃপ, সমিতিঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সৌমদত্তি—এছাড়াও বহু যুদ্ধ-

(১) "পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥
"অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুন সমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥
"ধৃষ্টকেতু শ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥
"যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথঃ॥" (গীতা—১/৩, ৪, ৫, ৬)

বিশারদবীর অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত হয়ে আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত (১) সেনানায়কগণের বিবরণ প্রদত্ত হওয়ায় অধ্যায়ের "সৈন্যদর্শনযোগ" নামকরণ যথার্থ বলে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ এই সকল নায়ক যোগদর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নয়। উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বের গূঢ়ার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিবরণ সঙ্গতিপূর্ণ। নায়কদের বুৎপত্তিগত তথ্য নিরাকরণের পূর্বে মহারাজা শান্তনুর দ্বিতীয়া পত্নী সত্যবতী এবং বিষাদগ্রস্ত অর্জুন বিষয়ে যোগীগণের ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

আখ্যায়িকায় বর্ণিত হয়েছে যে মৎস্যের পেটে অবস্থানের জন্য সত্যবতীর সর্বাঙ্গ থেকে মৎস্যের দুর্গন্ধ বিস্ফুরিত হত, সেজন্য তাকে মৎস্যগন্ধা নামে অভিহিত করা হত। খেয়াঘাটে পরাশর মুনির দর্শন এবং পরাশর মুনি দ্বারা কৃষ্ণদ্বীপে নীত হয়ে মুনিবর তাঁর গর্ভাধান করেন। ফলস্বরূপ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জন্ম হয় এবং সত্যবতী মৎস্যগন্ধ বিনির্মুক্ত হয়ে পদ্মগন্ধবিশিষ্টা হয়; সে কারণে তখন থেকে তাঁর নাম হয় পদ্মগন্ধা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গল্প প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াযোগ সাধনায় দীক্ষাদানের গুপ্ত প্রকরণ ব্যক্ত হয়েছে। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির প্রতীক; পরাশর মুনি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী সদ্গুরু কুজ্ঝটিকা আবৃত কৃষ্ণদ্বীপে গর্ভাধান ব্যাপার সদ্গুরু কর্তৃক দীক্ষাদান সময়ে শিষ্যের ভ্রূ-মধ্যে; ভিতরে, যোগশক্তি দ্বারা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের বলয় সদৃশ জ্যোতির মধ্যে গাঢ় নীল বর্ণের, কৃষ্ণবর্ণ সদৃশ, গোলক প্রকাশ করে শক্তিদান করার প্রক্রিয়া বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন বলা হয়। দীক্ষালাভ দ্বারা অন্তরে যে আধ্যাত্মিক উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত বেদ-সংকলয়িতা ব্যাস। দীক্ষায় প্রাপ্ত যোগ সাধনের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রিয়াবান সাধকের সুষুম্না মধ্যে যে জ্যোতিষ্মান ষট্চক্র প্রকাশিত হয় কাহিনীতে

---

(১) "অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥
"ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ॥
"অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥" গীতা—১/৭,৮,৯

্যবতী কর্তৃক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত স্রোতে ভাসমান পদ্ম বলে কথিত য়েছে। চক্রস্থ জ্যোতিও কমল বা পদ্ম নামে চিহ্নিত হয়; যেমন াধারে চতুর্দল পদ্ম, স্বাধিষ্ঠানে ষড়দল পদ্ম ইত্যাদি।

কুন্তীর তৃতীয় পুত্র অর্জুন বস্তুতঃ সুষুম্না নাড়ী মধ্যস্থ মণিপুরে প্রকাশিত হ্নিতত্ত্ব পূর্বে বলা হয়েছে। বহ্নিতত্ত্বই শরীরে সর্বাপেক্ষা তেজগুণসম্পন্ন; হ্নিতত্ত্ব মলিন হলে শরীর ধারণ সম্ভব হয় না। গীতার বাণীর স্রোতা তেজস্বী র্জুন এক উন্নত ক্রিয়াযোগীর প্রতীক। যোগ সাধনায় অগ্রগতি হয়ে াগসাধনার অবস্থা যখন অধিকারে আসে, চিত্তের বৃত্তিসমূহ প্রায় নিরুদ্ধ য় যায়। তখন অনেক সময় ক্রিয়াযোগী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যে কল বৃত্তি জীবনকে সুখকর করে সেইসব বৃত্তিকেও রোধ করতে হবে জেনে ষণ্ণতার উদয় হয়। সকল বৃত্তিই—সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক—অন্তে াগাবস্থা প্রাপ্তির অন্তরায়; সুতরাং যোগীর সকল বৃত্তিরই নিরোধ য়োজন। এইরূপ বিষণ্ণতা যোগীর জীবনে কঠিন প্রমাদ স্বরূপ। এই স্থা উত্তীর্ণ হতে হলে সদ্গুরু সঙ্গ, সদ্গুরুর উপদেশ, তথা সর্বপ্রকার সঙ্গের অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রকার বিপদগ্রস্ত যোগীর জন্যই শ্রীমদ্-াবদ্গীতা রূপা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। স্বজন নিধন করতে হবে জেনে অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়েছিল উক্ত নিরিখেই প্রথম অধ্যায়কে "অর্জুন বিষাদ-াগ" বলা হয়েছে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে কুরুক্ষেত্র রণ প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ত্তির দ্বন্দ্ব। অধ্যাত্মজীবনে আগ্রহী ভাগ্যবান ব্যক্তিরই এই দ্বন্দ্বের বোধ । অন্তর্মুখ বৃত্তিকে বলশালী ও বহির্মুখ বৃত্তি হতে রক্ষার নিমিত্তই গুরু উপদেশ প্রাপ্তি। এই উপদেশ অনুসারে ক্রিয়া অনুষ্ঠান দ্বারা দেহ-্যাতির প্রকাশই অন্তর্মুখ বৃত্তির রক্ষাব্যূহ রচনা। ক্রিয়ারূপ সাধনাই ; ক্রিয়ার বেগ তীব্রতর হলে এই জ্যোতির প্রকাশ হয় এবং মূলাধার-ত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়। উক্ত আলোচনা দ্বারা গীতার রূপকত্ব পাদনে সহায়ক হয়—এই উদ্দেশ্যেই এই সকলের অবতারণা।

গীতার রূপক

পাণ্ডবপক্ষীয় সেনানায়কগণের নাম ও বুৎপত্তিগত অর্থ :

(১) **দ্রুপদপুত্র**=ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্ট (ধর্ষণেন জাতঃ—ধর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন দ্যুম্ন (জ্যোতি)। প্রাণায়াম ক্রিয়া সম্পাদন সময়ে তীব্রবে প্রাণ ও অপান বায়ুর গ্রহণ ও ত্যাগ রূপ ধর্ষণ বা ঘর্ষণ দ্বা দেহজ্যোতির আবির্ভাব হয় ; এই দেহজ্যোতিরই নাম ধৃষ্টদ্যু দেহজ্যোতি প্রকাশিত হলে সাধকের অন্তর্মুখ বৃত্তি সুদৃঢ় হয়।

(২) **যুযুধানঃ**=যোদ্ধুম্ (যুদ্ধ করতে) ঈশান (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) ; অর্থে প্রাণায়াম ক্রিয়া ; শব্দের অর্থ হয় প্রাণায়াম ক্রি অনুষ্ঠানের প্রবল ইচ্ছা। যোগশাস্ত্রে এই প্রকার ইচ্ছা “শ্রদ্ধা” বলে।

(৩) **উত্তমৌজাঃ**=উত্তম (শ্রেষ্ঠ), ওজঃ (প্রচেষ্টা) যস্য সঃ (যার সে শব্দের অর্থ দাঁড়ায় শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা, যোগশাস্ত্রে যাকে “বীর্য” বলা হ

(৪) **চেকিতান**=চিকেতি অর্থে জানা ; চিকেতি থেকে উৎপন্ন শব্দে অর্থ শাস্ত্রোক্ত “স্মৃতি”।

(৫) **বিরাট**=বিশেষণে (বিশেষভাবে) রাজতে (বিরাজ করে বিশেষভাবে বিরাজ করাকে যোগশাস্ত্রে, পাতঞ্জলে, “সমা বলে।

(৬) **কাশীরাজ**=কার্শয়ন (সংগ্রহ করে) রাজতে (বিরাজ করে) সকল জ্ঞান সংগ্রহ করে বিরাজ করা, যার দার্শনিক নাম “প্রজ্ঞা

(৭) **দ্রুপদ**=দ্রুতম্ (দ্রুত বা তীব্র) বেগ (গতি) যস্য সঃ (য সে)। শব্দের অর্থ “তীব্রবেগ” ; তীব্রবেগে প্রাণায়াম অনুষ্ঠ করলে যদ্বারা দেহজ্যোতি প্রকাশিত হয় ও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্র হয়। দ্রুপদরাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন যার ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়ে এবং দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীই কুণ্ডলিনী শক্তি।

(৮) **ধৃষ্টকেতু**=ধৃষ্যতে (ধর্ষিত বা বিনষ্ট করে) কেতব (শত্রু, ব

বা বিঘ্ন) যঃ (যে) ; যদ্দ্বারা সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিনষ্ট হয়। সাধনপথে বাধা বিনষ্ট করা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র মতে উপায় "যম" অনুষ্ঠান করা।

(৯) শৈব্য=শিব অর্থে মঙ্গল বা শুভ; যা মঙ্গলদায়ক তা শৈব্য। পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের "নিয়ম" অনুষ্ঠানই মঙ্গলদায়ক।

(১০) কুন্তীভোজ=কুন্তীম্ (দৈবশক্তি আকর্ষণ ক্ষমতা, ভুনক্তি (ভোজন করে) যঃ (যে) ; যে অবস্থায় সূক্ষ্ম দৈবশক্তি উপলব্ধি হয়। সাধন অনুষ্ঠানকল্পে যথোপযুক্তভাবে উপবিষ্ট হয়েই সূক্ষ্ম অনুভূতি উপলব্ধ হয়। একেই যোগশাস্ত্রে "আসন" বলা হয়।

(১১) যুধামন্যু=যোদ্ধুম্ (যুদ্ধ করতে, প্রাণায়াম করতে) মন্যুঃ (নিযুক্ত) যঃ সঃ (যে সে) ; যুদ্ধ করা অর্থে "প্রাণায়াম" অনুষ্ঠান করা।

(১২) পুরুজিৎ=পৌরান্ (পুরবাসীগণকে, ইন্দ্রিয়গণকে) জয়তি (জয় করেছে) ; ইন্দ্রিয়গণ বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে, অন্তর্মুখ হয়, এবং কেন্দ্রস্থল ত্রিকুটীতে সংযত হয়। এই হল যোগের "প্রত্যাহার" অবস্থা।

(১৩) সৌভদ্র=সুভদ্রার পুত্র=অভিমন্যুঃ=অভিতঃ (সর্বদিকে) মনুতে (প্রকাশিত) ; সর্বপ্রকারে প্রকাশ; পাতঞ্জল যোগসূত্রে এই অবস্থাকে ধারণা, ধ্যান, সমাধির একত্রিত "সংযম" অবস্থা বলা হয়।

(১৪) দ্রৌপদেয়া=দ্রৌপদীর পুত্রগণ=পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে তীব্রবেগে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান দ্বারা জাগ্রতা কুণ্ডলিনী শক্তিই দ্রৌপদী। ক্রিয়াযোগে কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না পথে উত্থিত হয়ে প্রতি চক্রে বিভিন্ন রং-এর বিন্দু বিন্দু প্রকাশিত হয়; এদেরই দ্রৌপদীপুত্র বলা হয়েছে। যোগশাস্ত্রে এদের "বিন্দরঃ" বলা হয়।

সেনানায়কগণের নামের অন্তর্নিহিত উপরি উক্ত ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ পাওয়া যায়ঃ শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, তীব্রবেগ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সংযম এবং বিন্দরঃ। এরা বস্তুতঃ পাতঞ্জল যোগ-সূত্রোক্ত বিভিন্ন তত্ত্ব বিশেষ। যোগসূত্রের সমাধিপাদে অসম্প্রজ্ঞাত বা

নির্বীজ সমাধি প্রাপ্তি প্রকরণ ব্যাখ্যায় উনবিংশ সূত্রে বিবৃত হয়েছে যে সকল যোগী বিদেহলয় বা প্রকৃতি লয় সমাধিপ্রাপ্ত হন তাঁদের কৈবল্য মুক্তি হয় না; পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। (১) পরন্তু কৈবল্যমুক্তি প্রার্থী যোগী শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি প্রজ্ঞাপূর্বক অগ্রসর হন তাঁরাই যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। (২) ঐ অধ্যায়ের পর শ্লোকেই পুনরায় বলা হয়েছে যে যাঁদের সাধনা তীব্রবেগসম্পন্ন তাঁদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ শীঘ্র হয়। (৩)

যোগসূত্রের সাধনপাদে কৈবল্য পদপ্রাপ্তির উপায় বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে দৃশি বা দ্রষ্টৃত্ব এবং দৃশ্যের যে একত্বভাব প্রতীত হয় তা ভ্রমাত্মক এবং তা যোগাবস্থা প্রাপ্তির অন্তরায়। এই ভ্রমের কারণ অবিদ্যা (৪) অবিদ্যাভাব বিদূরিত হয়ে উক্ত ভ্রমাত্মক প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগের যখন নাশ হয় তখনই কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্তি সুগম হয়। (৫) ভ্রম বিদূরিত হওয়া রূপ অবস্থাকে বিবেক খ্যাতি বলা হয়। (৬) যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হলে উক্ত বিবেকখ্যাতিরূপ জ্ঞানদীপ্তির উদয় হয়। (৭) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই আট প্রকারকে যোগাঙ্গ বলা হয়। (৮)

(১) "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাম।" (পাতঞ্জল—সমাধিপাদ/১৯

(২) "শ্রদ্ধা বীর্য স্মৃতি সমাধ প্রজ্ঞা পূর্বকমিতরেষাম্।"
(পাতঞ্জল—সমাধিপাদ/২০

(৩) "তীব্রসংবেগানামাসন্ন"।—(পাতঞ্জল সমাধিপাদ/২১)

(৪) "তস্যহেতুরাবিদ্যা।"—(পাতঞ্জল-সাধনপাদ/২৪)

(৫) "তদভাবাৎ সংযোগাভাবোহানং তদৃশেঃ কৈবল্যম্।"
(পাতঞ্জল সাধনপাদ/২৫)

(৬) "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" (পাতঞ্জল সাধনপাদ/২৬)

(৭) "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তি
অবিবেকখ্যাতেঃ।" —(পাতঞ্জল সাধনপাদ/২৮)

(৮) "যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম প্রত্যাহার
ধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি।" (পাতঞ্জল সাধনপাদ/২৯)

পাতঞ্জল দর্শনের উক্ত সূত্র থেকে গীতার প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত পাণ্ডব সেনানায়কগণের যুযুধান থেকে পুরুজিৎ পর্যন্ত—নামের গূঢ় তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা হয়েছে। সৌভদ্র শব্দের গূঢ় অর্থ "সংযম" দেখান হয়েছে। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বিভূতিপাদে "সংযম" শব্দের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে—তিনের একত্রে নাম সংযম। অষ্টাঙ্গ যোগে অর্থাৎ শেষ তিন অঙ্গ ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি।
দ্রৌপদীর পুত্রগণ বলতে কুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথে উত্থানের দ্বারা বিভিন্ন চক্রে যে নানা বর্ণের বিন্দু প্রকাশিত হয় সেই বিন্দুবর্গকে লক্ষ্য করা হয়েছে পূর্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিভিন্ন চক্রে এই সকল নানা বর্ণের বিন্দু প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে মন সম্পূর্ণরূপে লয় হয়ে যায়।

এখন কৌরবপক্ষীয় সেনানায়কগণের শ্লোকে ব্যক্ত নামগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ

(১) ভবান=আপনি=দ্রোণ=কর্মনাম দ্রবীভাব (কর্মের দ্রবণ বা তরলীভাব): কর্মের তরলীভাব অর্থে কর্মজাত যে ভাব সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে—যাকে "সংস্কার" বলা হয়।

(২) কর্ণ=করণশীল ইতি (কর্তব্যকর্ম ভেবে যে অনুরাগ); যোগশাস্ত্রে এই কর্তব্যবুদ্ধিজাত আকর্ষণকে "রাগ" বলা হয়।

(৩) বিকর্ণঃ কর্ণের বিপরীত—"রাগ" এর বিপরীত বা "দ্বেষ"।

(৪) সমিতিঞ্জয়=জয়দ্রথ=জয়তি (জয় করে) রমিত্বা (আকর্ষিত হয়ে): সুখদুঃখ স্মৃতিতে আকর্ষিত হওয়াকে "অভিনিবেশ" বলে।

(৫) সোমদত্তি=সোমদত্তপুত্র=ভূরিশ্রবা=ভূরিম (প্রচুর; অজস্র) শ্রবম্ (শ্রব বা ক্ষরণ) যস্য সঃ (যার, সে); যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কর্মের এই হল ধর্ম; সুতরাং সোমদত্তি শব্দে "কর্ম" বলা হয়েছে।

(৬) অশ্বত্থামা (দ্রোণপুত্র)=অশ্বন্ (সংগ্রহ করে) তিষ্ঠতি (থেকে যায়); কর্মসংস্কারের প্রভাব যা মনে থেকে যায়; তাকেই "বাসনা" বা "আশয়" বলা হয়।

(৭) কৃপ্ (কৃপ্+অ=কৃপ্) কল্পনা করা, চিন্তা করা বা ভাবা, "অ" (বিপরীত); বিপরীত ভাবা; যার অর্থ পাতঞ্জলোক্ত "অবিদ্যা"।

(৮) ভীষ্ম=পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে জীবের দর্শনশক্তি বস্তুতঃ আভাস চৈতন্য; দর্শনশক্তির দৃশ্যের সঙ্গে একাত্মভাবকে "অস্মিতা" বলা হয়। সুতরাং দৃশ্যের সঙ্গে আভাসচৈতন্যের একাত্মতারূপ "অস্মিতা"কে ভীষ্ম বলে লক্ষ্য করা হয়েছে।

পাতঞ্জল দর্শনে বিভিন্ন সূত্রে নিম্নরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ" যোগসাধনের পাঁচ প্রকারের ক্লেশ। (১) ঈশ্বরের সংজ্ঞা—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয় দ্বারা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট এক বিশেষ পুরুষ। (২) সুখের স্মৃতি প্রযুক্ত সুখ তৃষ্ণাকে "রাগ" বলা হয়; (৩) দুঃখ স্মৃতি প্রযুক্ত দুঃখের প্রতি বিতৃষ্ণাকে "দ্বেষ" বলে; (৪) এবং কি জ্ঞানী বি অজ্ঞান সকলের মরণভীতিকে "অভিনিবেশ" বলে। (৫) দৃশ্য এবং দৃশি ব দর্শনশক্তির একাত্মতা ভাবকে "অস্মিতা বলা হয়। (৬)

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান নায়কদের মধ্যে কৌরবপ্রধান দুর্যোধন এব অর্জুন সখা ও সারথী শ্রীকৃষ্ণের নামের শব্দবিন্যাস এখনও বাকী। মনের রূপক ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন কৌরব যুদ্ধের প্রধান কারণ।

দুর্যোধন=দুঃ (দুঃখজনক), যোধন (যুদ্ধ বা প্রাণায়াম ক্রিয়া) যস্য স (যার সে)। প্রাণায়াম সাধন কষ্টদায়ক বা দুঃখজনক যে কারণে তা হল শ্রদ্ধার অভাবযুক্ত "অভিমান", সুতরাং দুর্যোধন শব্দ অভিমানরূপ মনোবৃত্তির রূপক।

(১) "অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।"
(পাতঞ্জল সাধনপাদ / ৩

(২) "ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"
(পাতঞ্জল সমাধিপাদ / ২৪

(৩) "সুখানুশায়ী রাগঃ।" (পাতঞ্জল সাধনপাদ / ৭)

(৪) দুঃখানুশায়ী দ্বেষঃ। (পাতঞ্জল সাধনপাদ / ৮)

(৫) "স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।"
(পাতঞ্জল সাধনপাদ / ৯

(৬) "দৃকদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা।" (পাতঞ্জল সাধনপাদ / ৬

শ্রীকৃষ্ণ = শ্রী—"শ"-"র" এবং "ঈ" দ্বারা সম্পাদিত। "কৃষ্ণ" শব্দ কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়। "শ" মঙ্গলবাচক, "র" বহ্নিবীজ এবং "ঈ" শক্তিবীজ ; শ্রীকৃষ্ণের অর্থ হল মঙ্গলসূচক বহ্নি ও শক্তিবীজযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ। যোগীগণের আজ্ঞাচক্রে প্রকাশিত উজ্জ্বল শ্বেত বলয়ের মধ্যস্থিত গাঢ় নীল বর্ণের—প্রায় কৃষ্ণবর্ণের মত—গোলককে কূটস্থ বলে। এই কূটস্থেই চৈতন্য প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ শব্দ দ্বারা এই "কূটস্থ চৈতন্য"ই ব্যক্ত হয়েছে। কূটস্থ চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ গীতার বক্তা, এবং গীতায় একে "অধিযজ্ঞ" "পুরুষোত্তম" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই কূটস্থ চৈতন্যই সর্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে অধিষ্ঠিত আছে।

সৈন্যদর্শন তথা সেনানায়কগণের পরিচিতি প্রদান করে প্রথম অধ্যায়ে অতঃপর প্রধান সেনানায়কদের শঙ্খধ্বনির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এইসকল ধ্বনিও প্রকৃত প্রস্তাবে যোগী সাধকের অন্তরে শ্রুত বিভিন্ন প্রণবধ্বনি। লক্ষণীয় যে একমাত্র পঞ্চ পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনির কথাই শ্লোকে নাম করে বিবৃত হয়েছে।

অন্য পাণ্ডবনায়কগণের নাম করা হয়েছে কিন্তু শঙ্খের নাম দেওয়া নেই ; শ্লোকে বলছে ঋষিকেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ধনঞ্জয় বা অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীম পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খবাদন করেছিলেন। কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু এবং অন্যান্য নরপতিগণ পৃথক পৃথক শঙ্খ নিনাদ করেছিলেন। (১)

যোগী যখন সাধনায় অগ্রসর হয়ে অন্তরে অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভের

---

(১) "পাঞ্চজন্যং ঋষিকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥" (গীতা ১/১৫)
"অনন্তবিজয়ং রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥" (গীতা ১/১৬)
"কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥" (গীতা ১/১৭)
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খং দধ্মুঃ পৃথক পৃথক্ ॥" (গীতা ১/১৮)

যোগ্যতা অর্জন করেন তখন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের ক্রমশ প্রকাশ হয়ে সমাধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়; বিষয়বস্তু হতে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যাহৃত হয়ে মন অন্তর্মুখ হতে আরম্ভ করে। এই সময়ে বিভিন্ন চক্রস্থিত পঞ্চতত্ত্বের সূচক ধ্বনি আপনা হতে অন্তরে উৎসারিত হয়ে শ্রুত হয়। প্রথমে ভ্রমরগুঞ্জনের মত শব্দ শোনা যায় যাকে গীতায় মণিপুষ্পক শঙ্খধ্বনি বলা হয়েছে। এই শব্দ প্রকাশিত হলে সাধকের মনে বিতর্কের উদয় হয়; সাধক ভাবে এই কি ওঁকারধ্বনি না অন্য কিছু। এই শব্দ মূলাধারস্থ ক্ষিতিতত্ত্বের সূচক এবং মনের সমাহিত ভাবের এই অবস্থাকে "সবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলে।

সাধনায় অগ্রগতি হয়ে ঐ ভ্রমরগুঞ্জনধ্বনি স্পষ্টতর হয় এবং বেণু বা বংশী-ধ্বনির মত প্রকাশিত হয়। এইজন্য একে নকুলের সুঘোষ শঙ্খধ্বনি বলা হয়েছে। এই ধ্বনি স্বাধিষ্ঠান চক্রস্থিত জলতত্ত্বের সূচক; এবং এই শব্দ কি প্রকারের এরূপ বিচার হয় বলে মনের এই প্রকার স্থিরতাকে "সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলা হয়।

মন ক্রিয়ার প্রভাবে আরও গভীরভাবে স্থিরতাপ্রাপ্ত হয়ে অধিকতর পরিচ্ছন্ন হয়ে দৈবধ্বনির মত বীণাধ্বনি শ্রুত হয় এবং হৃদয়, মন হর্ষে ও আনন্দে ভরে যায়। এই ধ্বনি মণিপুর চক্রস্থিত তেজোদৃপ্ত বহ্নিতত্ত্বের প্রকাশের সূচনা করে এবং সঠিক "সানন্দ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" প্রাপ্ত হন। এই ধ্বনিকেই অর্জুনের দেবদত্ত শঙ্খনিনাদ বলা হয়েছে।

মনের স্থিরতা আরও গভীরতর হয়ে ইন্দ্রিয়সকল যখন প্রায় লয়প্রাপ্ত হয়, একমাত্র সত্তাবোধ থাকে, তখন একটানা ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হয়। হৃদয়স্থিত অনাহত চক্রের বায়ুতত্ত্বের দ্যোতক এই ঘণ্টাধ্বনিকে ভীমের মহাশঙ্খ পৌণ্ড্র-শঙ্খনিনাদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অবস্থায় সাধকের "সস্মিতা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" হয়।

স্থিরত্বের শ্রেষ্ঠ যে অবস্থায় সমুদ্রগর্জন বা মেঘগর্জনের ন্যায় ধ্বনি উত্থিত হয়ে মনের সর্বপ্রকার বৃত্তি রুদ্ধ হয়ে যায় এই নাদ কণ্ঠদেশে অবস্থিত বিশুদ্ধচক্রের ব্যোমতত্ত্বের প্রকাশক—একে যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয় নামক

শঙ্খের ধ্বনি বলা হয়। সাধক এই অবস্থায় "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বা "নির্বীজ সমাধি" প্রাপ্ত হন।

উক্ত পাঁচ প্রকার নাদ অতঃপর মিলিত হয়ে একযোগে উৎসারিত হতে থাকে এবং তখন ঐ সংযুক্ত নাদকে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সেনানায়ক ও শঙ্খনিনাদের অন্তর্নিহিত অর্থের ব্যাখ্যা দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে গীতার উপদেশ আধ্যাত্মিক এবং সাধকের দেহমনে অনুভূত বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ। সাধনার পথে যখন বিমর্ষতা বা বিষাদ মনকে দুর্বল করে তখন সর্বজীবের জীবনসাথী কূটস্থচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণের মত যথার্থ উপযোগী উপদেষ্টা বা নিয়ন্তা ব্যতীত উপায় নেই। তাই গীতার অনুপম উপদেশ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীরূপে প্রচারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(সাংখ্যযোগ)

সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান; বিশ্লেষণ, অনুচিন্তন আদি মানসিক প্রচেষ্টা লব্ধ জ্ঞান। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ; সাংখ্যযোগ এবং জ্ঞানযোগ দুই এক ব্যাপার নয়। শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বাদি বিচার দ্বারা জানা যায় যে প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগে বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাষায় "জীব" চিৎ-জড় গ্রন্থি; চৈতন্যরূপী আত্মার সহিত জড়রূপী প্রকৃতি সঞ্জাত দৃশ্যাবলীর একাত্মতা ভাবকে জীব বা জীবাত্মা বলা হয়। চৈতন্য আত্মা অবিনাশী, অপরিবর্তনীয় এবং সনাতন নিত্য; প্রকৃতি সংযোগে দেহরূপ আবরণে আবৃত। দেহ তিনপ্রকার—কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। দেহ বিনাশী, পরন্তু সাধারণ মৃত্যুতে স্থূল শরীরেরই নাশ হয়; কারণ ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা আবৃত জীবাত্মা স্থূল দেহের বিনাশের পরে নূতন দেহ পরিগ্রহ করে। সুতরাং স্থূল দেহের বিনাশে শোকগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই। চৈতন্যরূপী আত্মা

অজর, অমর, নিত্য ও সনাতন। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য আদি যে প্রকার জীব দেহের পরিবর্তনমাত্র, মৃত্যুও সেইপ্রকার এক পরিবর্তন। পুরোনো ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করে লোক যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেরকম জীব নূতন দেহ ধারণ করে। জীবনচক্রের ধর্মই এই। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, প্রকৃতির বিকার দ্বারা সৃষ্ট, এবং এইসকল তত্ত্বের সঙ্গে একত্রে জড়িত হয়ে নিষ্কল, অজর, অমর, নিত্য আত্মা জীবাত্মারূপে প্রতীত হয়। এই হল জীবত্বের বন্ধন; এই বন্ধনমুক্ত হতে হলে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল তিন দেহেরই আবরণ উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন যখন আত্মা আপন স্বরূপে অর্থাৎ অনন্তচৈতন্য পরমাত্মায় পরিণত হয়। এই অবস্থাপ্রাপ্তিকে যোগসূত্রে যোগ বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে যে সুখদুঃখরূপ প্রবাহ সৃষ্টি হয় মন বুদ্ধি, অহঙ্কার দ্বারা প্রবাহিত হয়ে চিত্তে তার ছায়া বা প্রভাব প্রতিফলিত হয় এই প্রতিফলনের সঙ্গে আত্মার ঐক্যভাবই "জীবের" অস্তিত্ব সূচিত করে কিন্তু কেবল বাহ্যিকভাবে কর্মত্যাগ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ ছিন্ন করা যায় না; বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবন মনের ধর্ম; মনের মনত্ব এই চঞ্চলতার উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি; বহু ভাবের মধ্যে বুদ্ধি একটিকেই নিশ্চয় করে, তখন মনত্বভাব দূরীভূত হয়ে বুদ্ধিতে পরিণত হয়। বুদ্ধি সত্যপ্রকাশক, অচঞ্চলভাবে বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হলে আত্মার দেহাবরণরূপ ভ্রম বিদূরিত হয়। সুতরাং প্রকৃষ্টপন্থা সর্বপ্রকার বাহ্য কর্ম পরিত্যাগ নয়, পরন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য কর্মে আত্মনিয়োগ করা মহাভারত কাহিনীতে কর্মের রূপক "ভুরিশ্রবা"; কর্মের ফলস্বরূপ কামনা বাসনার উদয় হয়ে বহু কর্মের কারণ হয়। এই কারণে কর্মের "শ্রব" রূপ কামনা বাসনা পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধিযোগের সাহায্যে কর্মসম্পাদন করলে প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং বিষয় থেকে ইন্দ্রিয় সংযোগ নিবৃত্ত হয়ে যায়। একে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা বলে। কামনা বাসনামুক্ত ব্যক্তি কর্মযোগ দ্বারা সকলপ্রকার স্পৃহা অহঙ্কারমুক্ত হয়ে শান্তিপ্রাপ্ত হয় যাকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

(কর্ম্মযোগ)

সাংখ্যযোগ তথা বুদ্ধিযোগ সম্পূর্ণ কর্মত্যাগ দ্বারা সম্ভব হয় না। সেই-প্রকার বিষয়মুক্ত কর্ম সম্পাদন না হলেও স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভ হয় না। বস্তুতঃ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য নেই। জীবের পক্ষে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করা অসম্ভব। প্রকৃতি নিজগুণে কর্মের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। কর্ম না করে জীব ক্ষণকালও জীবিত থাকতে পারে না। কর্মযোগ অধ্যায়ে গীতা সেই কারণে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার উপযোগী কর্মের কৌশল নির্দেশ করেছে। এই কৌশলের মৌলিক নীতি সকলপ্রকার কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে কর্মের অনুষ্ঠান করা।

এই অধ্যায়ে কর্মের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে কর্মের উদ্ভব ব্রহ্ম হতে, এবং ব্রহ্ম অক্ষর হতে উদ্ভূত। অর্থাৎ কর্মের কারণ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের কারণ অক্ষর পরমাত্মা। সেই কারণে যজ্ঞরূপ কর্মে ব্রহ্ম সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকে। (১) যজ্ঞ হতে উৎপন্ন ধূম থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি দ্বারা অন্ন সৃষ্ট হয়ে জীবের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টিকর্তাদ্বারা প্রবর্তিত এই কর্মচক্রের ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং কর্মচক্র কি নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া দরকার। এই কর্মচক্রে যে জীব নিযুক্ত নেই, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এরূপ কর্ম দ্বারাই কর্মকর্তা আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়ে অবস্থিত হন; কোনরূপ কামনা বাসনা উদয়ের অবকাশ থাকে না; এবং এই প্রকার কর্মসম্পাদন দ্বারা মুক্তিলাভ হয়।

যজ্ঞকর্ম কি তার সংজ্ঞা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এই বিবরণে দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞের উল্লেখ করে অপান ও প্রাণ বায়ুকে পরস্পরের মধ্যে আহুতি দান পূর্বক প্রাণায়াম প্রক্রিয়াকে যজ্ঞনামে

(১) "কর্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" (গীতা ৩/১৫)

অভিহিত করা হয়েছে। (১) গীতার অষ্টম অধ্যায়ে প্রাপ্ত কর্মের সংজ্ঞাও গভীর অর্থজ্ঞাপক এবং সুস্পষ্ট। ঐ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে অক্ষরই পরমব্রহ্ম, স্বভাব বা প্রকৃতিই অধ্যাত্ম; এবং বস্তুভাব উদ্ভাবনকারী বিসর্গ বা নাদব্রহ্মই "কর্ম" নাম প্রাপ্ত। (২) চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম বিষয়ে অপর কয়েকটি গভীর তত্ত্বপূর্ণ শ্লোকও পাওয়া যায়। কর্মযোগের সঙ্গে জ্ঞানযোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্য কর্ম সম্বন্ধের দুই-একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি এইস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন কর্ম কি, অকর্মই বা কি নিরূপণ করতে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণও বিচলিত হন। সেইজন্য যথার্থ কর্ম কি তোমাকে বলছি যাতে তুমি সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত হতে পার। (৩) কর্ম কি, বিকর্ম কাকে বলে এবং অকর্মই বা কি জানা দরকার; কারণ কর্মের গতি অতি কঠিন। (৪) মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান যিনি কর্মেতে অকর্ম এবং অকর্মেতে কর্ম দর্শন করেন। তিনি সকলপ্রকার কর্ম করেও সর্বদা মুক্ত থাকেন। (৫)

কর্মযোগ ব্যাখ্যায় এই তৃতীয় অধ্যায়ে আছে যে ত্রিগুণা প্রকৃতির আপন গুণের দ্বারা সর্বপ্রকার কর্ম সাধিত কিন্তু মূঢ় অজ্ঞান ব্যক্তি অহঙ্কার-

---

(১) "দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥" (৪/২৮)
"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানংতথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।" (গীতা ৪/২৯)

(২) "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥" (গীতা ৮/৩)

(৩) "কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।" (গীতা ৪/১৬)

(৪) "কর্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥" (গীতা ৪/১৭)

(৫) "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
সঃ বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥" (গীতা ৪/১৮)

বশতঃ নিজেকেই সকল কর্মের কর্তা মনে করেন। (১) এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি বা ভ্রান্তচিন্তাই প্রকৃতপক্ষে পাপ। রজগুণ থেকে উদ্ভূত কামনা, বাসনা চরিতার্থ না-হওয়া প্রযুক্ত ক্রোধই এই পাপের হেতু। (২) ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধিতে কামনা অধিষ্ঠিত থাকে এবং জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে, মনুষ্যকে মোহগ্রস্ত করে। (৩) সেই কারণে প্রথমে দরকার ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশক পাপরূপী কামকে পরাভূত করা।

বলা হয়েছে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ বস্তু, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি এবং বুদ্ধি অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা বা পুরুষ। (৪) বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জ্ঞাত হয়ে এবং নিজেকে সেই আত্মায় প্রতিষ্ঠিত করে এই ভয়ানক এবং দুর্জয় শত্রুরূপী কামকে জয় করা কর্তব্য। (৫)

চতুর্থ অধ্যায়

(জ্ঞানযোগ)

জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা ; সকল রকমের জানাকে কিন্তু জ্ঞান বলে না। মানবের জানার যে সহায়ক ইন্দ্রিয়াদি—তদ্বারা জ্ঞাত হওয়াকে সীমিত জ্ঞান

(১) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা ৩/১৮)

(২) "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।" (গীতা ৩/৩৭)

(৩) "ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥" (গীতা ৩/৪০)

(৪) "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥" (গীতা ৩/৪২)

(৫) "এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ (গীতা ৩/৪৩)

বা অজ্ঞান বলা হয়। কারণ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানার পরিধি সীমিত। কর্মের যে প্রকার কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্মরূপ বিভাগ আছে জ্ঞানেরও জ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান বিভাগ হয়। সীমিত জ্ঞানকে অজ্ঞান, বিশেষরূপ জ্ঞানকে বিজ্ঞান এবং পূর্ণজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞানকে জ্ঞান বলা হয়।

এই জ্ঞানযোগ অধ্যায়ে জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা উল্লিখিত না হলেও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগে এই শব্দের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে জ্ঞানের সংজ্ঞা বিবৃত হয়েছে। শ্লোকে মনুষ্যের শরীরকে ক্ষেত্র এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ পুরুষকে যিনি ক্ষেত্রকে জানেন ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়েছে। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃত জ্ঞানই জ্ঞান। (১) পরমাত্মা বা আত্মা এবং আত্মাস্পৃষ্ট প্রকৃতিজাত ক্ষেত্রের সম্বন্ধ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই কারণেই অধ্যায়ের শিরোনাম জ্ঞানযোগ করা হয়েছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ বা চৈতন্য সংযোগে প্রকৃতির বিকার দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি হয়, এবং চৈতন্য পুরুষরূপে সর্বসৃষ্ট বস্তুতে নিহিত থাকে। এই চৈতন্য মনুষ্য শরীরে কিভাবে অধিষ্ঠিত এবং কোন কোন স্থানে বিশেষরূপে প্রকাশিত তার বিবরণ অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু যেভাবে শ্লোক দুটি লিখিত হয়েছে তাতে উক্ত প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগের উল্লেখ তো নেই-ই, বরং সাধারণ অর্থে অসম্ভাব্যতা প্রকাশ হয়েছে। অবশ্য অন্তর্নিহিত মর্ম অনুসন্ধান করলে শ্লোকের যাথার্থ্য উপলব্ধ হয়। যাই হোক, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভাব্যতা দর্শনে এই শ্লোকদ্বয়কে গীতায় "ব্যাসকূট" বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি এই অব্যয়যোগ প্রথমে সূর্যকে দান করেছিলাম, সূর্য তৎপুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে দান করেছিলেন। এইভাবে পরাম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হয়ে রাজর্ষিগণ এই যোগ প্রাপ্ত হন, এবং মহান কালের ব্যবধানে এই যোগ নষ্ট হয়ে যায়।

---

(১) ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতিতদ্‌বিদঃ॥" (গীতা—১৩/২

(২) "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥" (গীতা—১৩/৩

এখন প্রথমে প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তো অনেক পরে হয়েছে, আর সূর্য তো সৃষ্টির আদি থেকে বর্তমান। তবে শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে প্রথমে সূর্যকে এই যোগ দান করলেন ? বরং বিপরীত সূর্য যদি শ্রীকৃষ্ণকে এই যোগ দান করতেন তবে কালের দিক থেকে যথাযথ হত। দ্বিতীয়তঃ এই যোগ পরম্পরাক্রমে পরিবেশিত হয়ে কিভাবে নষ্ট হয়ে গেল। জাগতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে বস্তু পরম্পরা ভাবে একে অন্যকে দিয়ে যায় তার বর্তমানত্ব তো সুনিশ্চিত, তবে কি করে নষ্ট হয় ? (১)

এই অধ্যায়ে অর্জুনের মুখ দিয়ে প্রথম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং জবাবও একটি উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু জবাব সর্বসন্দেহভঞ্জক মনে হয় না। (২) দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপিতও হয়নি, সুতরাং জবাবও নেই। অর্জুন বলছেন, আপনার জন্ম পরে হয়েছে এবং সূর্যের জন্ম হয়েছে পূর্বে ; কি করে বুঝব যে আপনিই আদিতে এই যোগ সূর্যকে বলেছিলেন ?" শ্রীকৃষ্ণ জবাব দিচ্ছেন, "তোমার এবং আমার বহুবার জন্ম হয়েছে, তোমার ঐসব জানা নেই, কিন্তু আমার জানা আছে।" কয়েকটি শ্লোকে পশ্চাতে আবার শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি অবগত আছেন তাঁর দেহত্যাগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ হয় না, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। (৩) এই শ্লোকে পূর্বের জবাবের সঙ্গে ঠিক সংগতি নেই।

স্বামিজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বর ব্যাসকূট নামের এই দুই শ্লোকে প্রকৃতি-

---

(১) "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীত ॥"
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥" (গীতা—৪/১,২)

(২) "অপরংভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াংত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥" (গীতা—৪/৪)

(৩) বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেত্থ পরংতপ ॥" (গীতা—৪/৫)

(৪) "জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥" (গীতা—৪/৯)

পুরুষসংযোগে সৃষ্ট মনুষ্য শরীরে চৈতন্য কি প্রকারে প্রকাশিত তার তাৎপর্য নিহিত বলে বর্ণনা করেছেন। শরীরে সর্বস্তরে সর্বঅংশে চৈতন্য অবস্থিত, পরন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানেই এই চৈতন্য বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। শ্লোকদ্বয়ের যে ক্রম নির্দেশিত হয়েছে, তার সঠিক ব্যাখ্যা দ্বারা নিহিত গূঢ় অর্থের অনুভব হয়।

সূর্যকে বহির্বিশ্বের কারণ বলা হয়। সূর্যই বিশ্বসৃষ্টির মূল, কারণ সৃষ্টির সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর উপকরণসমূহ সূর্যেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে কেন্দ্রীভূত থাকে চন্দ্রকে যোগাগণ বিশ্বের সূক্ষ্মশরীর এবং গ্রহাদিকে স্থূল শরীর মনে করেন। জীব তথা মানব বিশ্বেরই অংশ হওয়ায় মানবও কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর প্রাপ্ত। মানুষের মস্তিষ্ক বহিঃসূর্যের প্রতীক ; মস্তিষ্কের ভ্রূযুগল মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে, বহিঃসূর্যের ন্যায় যে উজ্জ্বল কূটস্থ প্রকাশিত হয় তারও কেন্দ্রস্থল গোলাকার গাঢ় নীলবর্ণবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ মনে হয়। এই গাঢ় নীলবর্ণ গোলকের চতুষ্পার্শে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের বলয় বিশিষ্ট জ্যোতি। নীলবর্ণবিশিষ্ট কূটস্থের কেন্দ্রস্থল মনুষ্য শরীরে চৈতন্যের প্রধান অধিষ্ঠান স্থান। শ্বেতবর্ণের বলয় বস্তুতঃ গাঢ় নীল গোলকের ছটা বিশেষ। এই শ্বেতবর্ণের বলয়ই "মনু"। মনু হতেই মানবের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ অনাদি অনন্ত চৈতন্যে বিভাগ বা পৃথকত্ব ভাবের উদয় হয়। পূর্বে উক্ত হয়েছে যে মানব শরীরে আজ্ঞাচক্র হতে মূলাধারচক্র পর্যন্ত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে লম্ববান তিন নাড়ী বর্তমান। নাড়ী অর্থে প্রাণবায়ুর গতিপথ। প্রধান নাড়ী সুষুম্না, এবং তার ছায়াস্বরূপ বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা। ইড়াকে চন্দ্রনাড়ী বলা হয় এবং পিঙ্গলা সূর্যনাড়ী। যোগীগণ ইড়া নাড়িকে ধ্যানের দ্বার এবং পিঙ্গলাকে জ্ঞানের দ্বার বলেন। কূটস্থের গাঢ় নীলবর্ণের গোলক মানবের কারণ শরীর এবং তার ছটাস্বরূপ শ্বেতবর্ণের বলয় সূক্ষ্ম শরীরের কেন্দ্র বা আশ্রয়স্থল। সুষুম্না নাড়ী শরীরস্থ আকাশপথ। পিঙ্গলা নাড়ীর কূটস্থের সঙ্গে সংযুক্তির প্রথম বিন্দুই হল সূর্যবংশের প্রথম নৃপতি ইক্ষ্বাকু। রাজর্ষি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সংগ্রহ করে প্রকাশিত হওয়া (অর্ষয়ন রাজতে=রাজর্ষি)। রাজর্ষি শব্দের বহুবচন রাজর্ষয়ঃ বা রাজর্ষিগণ। সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত যে পাঁচ চক্র বা পদ্ম প্রকাশিত যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধাখ্য—সে সকল চক্রে প্রতিবিম্বিত

চৈতন্যই শরীরস্থ রাজর্ষিবৃন্দ। চৈতন্য সর্বশরীর পরিব্যাপ্ত ; পরন্তু মানুষের দ্বারা অনুভূত হয় না, সেইজন্য "নষ্ট" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতদ্বারা অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হয়, শরীরে চৈতন্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় কূটস্থের কেন্দ্রে, এবং কূটস্থকেন্দ্র থেকে সঞ্চারিত হয় শ্বেতবর্ণ বলয়ে—যা নীল কূটস্থ কেন্দ্রস্থ চৈতন্যের ছটাস্বরূপ ; উক্ত বলয় থেকে সঞ্চারিত হয় পিঙ্গলা নাড়ীর সঙ্গে কূটস্থের সংযোগস্থলে, এবং পরে চৈতন্য প্রকাশিত হয় পঞ্চচক্রে। প্রকৃতি ক্ষেত্র এবং পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ ; উপরোক্ত বিবরণে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান পরিবেশিত হওয়ার এই অধ্যায় যথার্থই জ্ঞানযোগ নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

অধ্যায়ের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে বর্ণিত ভগবানের পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করা বা অবতারত্ববাদের সমর্থন বলে যা মনে করা হয় তার নিহিত অর্থ অন্যপ্রকার। সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের স্বীকৃত সিদ্ধান্তের সমর্থনই বস্তুতঃপক্ষে উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। (১) ভগবান, পরমেশ্বর, জন্মরহিত অবিনশ্বর, অব্যয়, নিত্য এবং সর্বনিয়ন্তা প্রভু স্বীয় প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত হয়ে মায়াদ্বারা প্রকাশিত হন। এই প্রকাশ বা আবির্ভাব সাধারণ জীবের মত জন্ম নয়—দিব্য জন্ম। এই প্রকাশের রকম বা ধারা নবম শ্লোকেই বিবৃত হয়েছে পূর্বে যে সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

অষ্টম শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে ভগবানের আবির্ভাব হয় যুগে যুগে। পাদপূরণের মত কবিতার প্রয়োজনে "যুগ" শব্দের দুইবার প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ গীতার মত গম্ভীর গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দেরই পৃথক অর্থ হয় ; প্রত্যেক শব্দই পৃথক অর্থবহ।

ধর্মশাস্ত্রসমূহে উক্ত হয়েছে যে যুগই সাধারণভাবে জগতে ধর্মের প্রকাশের কারণ। ধর্ম চতুষ্পাদ ; সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্মেরই প্রকাশ হয়, ত্রেতা, দ্বাপর

---

(১) "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"
"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা—৪/৬,৭,৮)

ও কলিযুগে এই ধর্মের এক এক পাদ অপ্রকাশ হয়ে যায়; কলিযুগে মাত্র এক পাদ ধর্ম প্রকাশিত থাকে। যুগের ক্রম আবর্তনে পুনরায় চতুষ্পাদ ধর্ম প্রকাশিত হয়। উক্ত চার যুগের মোট যুক্ত বয়স্কাল বার হাজার বৎসরকে এক দৈবযুগ বলে, এবং এক সহস্র দৈব যুগে এক কল্প যা ব্রহ্মার একদিন কথিত হয়। উক্ত কল্পকাল সৃষ্টি প্রকাশিত থাকে; ঠিক উক্তকাল সময় পর্যন্ত ব্রহ্মার রাত্রি যখন সৃষ্টি অপ্রকাশ থাকে। পুনরায় কল্পারম্ভে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ধর্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তই উক্ত শ্লোকের একটি যুগ শব্দ দ্বারা সূচিত হয়েছে। এই বিষয়ে গ্রন্থের "যুগ ও যুগধর্ম" প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

অপর "যুগ" শব্দ ব্যক্তিগত রূপে ধর্মের প্রকাশক শ্বাস প্রশ্বাস সংযমরূপ যুগল মন্ত্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এই বিষয়েও গ্রন্থের "ক্রিয়া" প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত কর্ম সম্বন্ধে পুর্ব অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিবরণও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; এই প্রসঙ্গে প্রাণায়াম প্রক্রিয়াকে যজ্ঞ নামে বর্ণিত হওয়া—'ক্রিয়াযোগ জিজ্ঞাসা' বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণিত সর্বপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, কারণ জ্ঞানের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকলপ্রকার কর্মের সমাপ্তি হয় ঐ জ্ঞান তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী সদ্‌গুরু হতেই লাভ করতে হয়—সেবা, শ্রদ্ধা এবং প্রশ্নাদির দ্বারা গুরুর প্রীতি সম্পাদন করে। (১) হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মৌলিক পদ্ধতিই এই উক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। গুরুদ্বারা উপদেশ প্রাপ্তির অর্থ দীক্ষা লাভ করা। এইরূপ দীক্ষাপ্রাপ্তি দ্বারা দীক্ষা প্রার্থীর আভ্যন্তরিক পরিবর্তন বিষয়ে মধ্যযুগীয় ভক্তকবি তুলসীদাসের এক দোঁহা ক্রিয়াযোগীর ধারণায় যথার্থ। তুলসীদাসজী বলেন—

"সদ্‌গুরু পাবে ভেদ বাতাবে জ্ঞান কর্ উপদেশ।
তব কোয়েলা কী মৈলা ছুটে জব্ আগ্ করয় প্রবেশ॥"

সদ্‌গুরু জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে, জ্ঞান দর্শন করিয়ে, শিষ্যের মধ্যে যে পরিবর্তন

---

(১) "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ॥"—(গীতা—৪/৩৫)

সাধন করেন তার সঙ্গে তুলনা করা যায় অগ্নিপ্রদান দ্বারা কয়লার মালিন্য বিদূরিত করে লালিমা প্রকাশ করার সঙ্গে।

সদ্গুরু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগরূপ জ্ঞান দর্শন করিয়ে দেন।

পঞ্চম অধ্যায়

(সন্ন্যাসযোগ)

সন্ন্যাস শব্দের অর্থ ত্যাগ। যোগ সম্বন্ধীয় সন্ন্যাস কিন্তু কর্মত্যাগ নয়; কর্মফল বা কর্মসঙ্গ ত্যাগ। এই অধ্যায়ের এটাই মুখ্য বক্তব্য। কর্মত্যাগ দ্বারা যেমন প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না, কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বা সঙ্গ ত্যাগ না করলে তেমনি কেবল-কর্ম বা কর্মযোগ হয় না। এই দৃষ্টিতে কার্যকরী প্রস্তাবে সন্ন্যাস ও কর্ম সহযোগী এবং সহকারী। কারণ যিনি যোগী নন অর্থাৎ কর্মযোগী নন, তাঁর পক্ষে কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসও কষ্টকর। যোগযুক্ত হয়েই সাধক ত্বরায় ব্রহ্মলাভ করতে পারেন। ব্রহ্মত্বলাভের প্রয়াসীকে সেইজন্য দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য ইত্যাদি সবই করতে হয়—কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে—নিজে এসকলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়—এইভাবে। জলে নিমজ্জিত পদ্মপত্রই এই বিষয়ের উদাহরণ। জলের মধ্য থেকেও একবিন্দু জল পদ্মপত্রে তিষ্ঠোতে পারে না। যোগীগণ আত্মশুদ্ধির প্রয়াসেই নিরাসক্ত হয়েই কেবল-মাত্র শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করেন। নিজে সেইকার্যে কোন-প্রকারে লিপ্ত হন না। পরমেশ্বর কোন জীবের জন্য কোন কর্মের বিধান করেননি, কোন পাপ বা পুণ্যও বণ্টন করেন না; স্বভাব বা প্রকৃতির কারণেই কর্মের সঙ্গে কর্মসঙ্গ বা কর্মফল যুক্ত হয়ে ঐসবের হেতু হয়; ঐ সঙ্গরূপ অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়ে জীবকে মোহগ্রস্ত করে। জীবের পরম সুখ লাভের উপায় বা কৌশল বাহ্যিক বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করে কাম ও ক্রোধের বেগকে রুদ্ধ করা।

অধ্যায়ের শেষে প্রকৃত সন্ন্যাস বা সন্ন্যাসযোগ প্রাপ্তির কৌশলস্বরূপে সাধকের করণীয় প্রক্রিয়া বর্ণনা করে গীতা বলছেন—সাধক বাহ্য বিষয়বস্তু হতে নিজেকে সম্বরণ করে ভ্রূ-যুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন, প্রাণ এবং অপান বায়ুর গতি রুদ্ধ করে কেবল নাসিকাভ্যন্তরস্থ করে রাখবেন এব ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি সংযত করে ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধমুক্ত হয়ে সর্বদা যোগযুক্ত হয়ে অবস্থান করবেন। এই উপদেশই যথার্থ যোগধারণার কৌশল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(অভ্যাসযোগ—ধ্যানযোগ)

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোককে পূর্বাধ্যায়ে বিবৃত সন্ন্যাস ও যোগ বিষ বর্ণনার সারাংশ বলা যায়; শ্লোকে কথিত হয়েছে কর্মফলে অনাসক্ত হ যিনি করণীয় কার্য করেন তাঁকে সন্ন্যাসীও বলা যায়—যোগীও। কিন্তু যি শাস্ত্রবিহীন কর্মও করেন না তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী কোনটাই হতে পারে না। (১) প্রকৃত সন্ন্যাস এবং যোগ একই। কারণ কর্মের সংকল্প ত্যাগ হলে যোগ হয় না। যোগী হবেন প্রশান্তচিত্ত, শীত উষ্ণ মান অভিমা সমভাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রাপ্তিদ্বারা পরিতৃপ্ত, সকল ইন্দ্রিয় সংযত এবং স কূটস্থে সমাহিত; তাঁর স্বর্ণ এবং লৌহের পার্থক্যবোধ থাকে না। এ অবস্থাই প্রকৃত যোগাবস্থা। এই অধ্যায়ে যোগাবস্থার জন্য যে উপা অবলম্বন করতে হয় তার বিস্তারিত বিবরণ প্রোথিত হয়েছে—এইজন্য অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে অভ্যাসযোগ। একাদশ শ্লোক থেকে দ্বাত্রিংশ শ্লোক পর্যন্ত বলা যায় যোগ-শিক্ষার এক অনবদ্য প্রণালী। অধ্যায়ের অ এই অভাসের দ্বারা কি পরিণতি বা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রথমে বিবৃত হয়েছে যোগাভ্যাসের জন্য উপযুক্ত স্থান নিরূপণের নির্দেশ নির্বাচিত স্থান শুদ্ধ, পবিত্র ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, অধিক উচ্চও ন

অধিক নিম্নও নয়। আসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে কুশ তৃণ, তদোপরি চর্ম বা মৃগচর্ম এবং সর্বোপরি চেলি বা কাপড় স্থাপন করে। স্বামীজী মহারাজ বলতেন গীতার এই উপদেশ তৎকালীন বনে পর্ণকুটিরবাসী ঋষিমুনি আশ্রমের লোকেদের জন্য প্রয়োজন ছিল। ঐ সকল কুটিরের ভূমি জলীয় বা স্যাঁতসেঁতে থাকত; ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠান দ্বারা দেহে যে তাপ সৃষ্টি হয় উপযুক্তভাবে সেই তাপ সংরক্ষিত করতে হয়। উক্তরূপে আসন প্রতিষ্ঠিত হলে দেহের তাপরক্ষা সুনিশ্চিত হত। অন্য এক বিশিষ্ট প্রয়োজন ছিল প্রাণায়াম প্রক্রিয়াতে দেহে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তার সুরক্ষণ। বর্তমান সময়ে শহরে নগরে বসবাসকারী জনগণ ইঁট সুরকি দ্বারা প্রস্তুত ইমারতেই সাধারণতঃ বাস করে; সুতরাং দেহের তাপরক্ষার জন্য ঐ প্রকার আসনের প্রয়োজন হয় না। দেহবিদ্যুৎ সুরক্ষিত করার জন্য পশমের তথা কম্বলের আসন হলেই যথেষ্ট; তবে পায়ের আরামের জন্য কার্পাস নির্মিত বস্ত্রখণ্ড কম্বলের উপর স্থাপন করলেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

আত্মশুদ্ধিকল্পেই যোগ প্রক্রিয়ার অভ্যাস; অভ্যাসের জন্য কি প্রকারে উপবেশন করতে হবে তারও বিধান নির্দিষ্ট হয়েছে। আসনের মৌলিক নীতি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; এক্ষণে উপবেশনের রীতি নির্ধারিত হচ্ছে। উপবেশন করতে হবে শির, গ্রীবা এবং দেহকে এক রেখায় অচঞ্চলভাবে ধারণ করে, দৃষ্টি নাসিকাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট করে—অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে মনকে আত্মায় তথা নিজমধ্যে সংযত করতে হবে। এইভাবে অভ্যাস করলে ক্রমশঃ মন সংযত হয়ে পরমশান্তি লাভ হয়। যোগীর আহার বিহারাদি বিষয়েও প্রকৃষ্ট উপায় নির্দেশিত: যোগী সর্বপ্রকার আধিক্য বর্জন করে চলবেন। অধিক আহার, অধিক অনাহার, অধিক নিদ্রা তথা অত্যন্ত অনিদ্রা পরিহার করতে হবে। এইপ্রকার অন্যান্য ব্যবহারেও। এইপ্রকার অত্যন্ত-বর্জিত শুধু মধ্য পন্থা অবলম্বনকারী সংযতচিত্ত যোগীর যোগ প্রক্রিয়া দুঃখের নিবৃত্তিকারক। সংযতচিত্ত যোগীর সর্বপ্রকার স্পৃহা দূরীভূত হয়। অনন্য চিত্তে ধৈর্য ও বুদ্ধি সহকারে সাধন অভ্যাস করলে ক্রমে এই অবস্থা লাভ হয়। যখনই মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হবে তখনই মনকে সংযত করে সেই বিষয় থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে; এইভাবে সযত্ন অভ্যাস দ্বারা সাধক সর্বপাপ থেকে মুক্ত

হয়ে ব্রহ্ম সংস্পর্শ প্রাপ্ত হয়ে নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হন। তখন সকল বস্তুকে নিজমধ্যে এবং নিজেকে সর্ববস্তুতে নিরীক্ষণ করে পরমাত্মায় সমাহিত হয়ে যান। উক্ত অবস্থা প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় চঞ্চল স্বভাব মন। মনকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করে ক্রিয়া আদি বিশিষ্ট উপায়ের দ্বারা চঞ্চল মনকে সংযত করা যায়।

যোগ অভ্যাসদ্বারা এই জীবনেই যে সিদ্ধিলাভ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ সিদ্ধিলাভের পূর্বেই দেহপাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যোগপথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে যোগ অভ্যাস ছেড়েও যেতে পারে। এই পরিণতি উদ্দেশ্য করে গীতা আশার বাণী উচ্চারণ করছেন যে, যোগী এইভাবে যোগভ্রষ্ট হলে ভয়ের কোন কারণ নেই। যোগ অভ্যাস কল্যাণের পথ। কল্যাণ পথযাত্রী ইহজীবনে বা পরজীবনে কখনও অকল্যাণ গতি প্রাপ্ত হয় না। (১) পরজন্মে তার পবিত্র এবং সম্পন্ন গৃহে জন্ম হয়, অথবা কোন যোগী-গৃহেই জন্মগ্রহণ করতে পারে, যে-প্রকার জন্ম জগতে দুর্লভ। (২)

অধ্যায়ের শেষে গীতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে যোগী তপস্বী, জ্ঞানী তথা কর্মী থেকেও শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সকলের যোগী হওয়া উচিত। (৩)

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞানযোগ

শাস্ত্রনির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করাকে বিজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানলাভ হলে মানবের অন্যকিছু জানার অবশিষ্ট থাকে না। ঈশ্বর বা পরমাত্মার দুই প্রকার ভা

---

(১) "পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্‌দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥" (গীতা ৬/৪০)

(২) "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্ট অভিজায়তে।
অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্॥
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশম্॥" (গীতা ৬/৪১, ৪২)

(৩) "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যোশ্চোধিকো যোগী তস্মাৎযোগী ভবার্জুন॥" (গীতা ৬/৪৬)

বা প্রকৃতি বিদ্যমান ; এর একটিকে অপরা এবং অপরটিকে পরা প্রকৃতি বলা হয়। অপরা প্রকৃতি আট প্রকার, যথা—পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। চৈতন্য সন্নিধানে অবিকৃত প্রকৃতির বিকৃতি নিবন্ধন এই আটপ্রকার প্রকৃতি সৃষ্ট হয়ে জগৎসংসারে প্রতিভাত। পরমাত্মার যে চৈতন্যভাব বা চৈতন্য প্রকৃতি দ্বারা সমুদায় বিশ্ব বিধৃত এবং সমুদায় সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য সম্পাদিত সেই ভাবকে পরা প্রকৃতি বলে। বস্তুতঃ পরমেশ্বর পরমাত্মাই সমুদায় বস্তু পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত। ত্রিগুণ দ্বারা বিমোহিত হয়ে জীব সর্বকারণ-কারণ অব্যয় পরমাত্মাকে অবগত হতে অসমর্থ। এই বিমোহনকারী মায়া ও পরমেশ্বরেরই অঙ্গীভূত লীলা। এই মায়া হতে মুক্ত হওয়ার উপায় একমাত্র পরমেশ্বরের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া।

পরমেশ্বরে আশ্রয়প্রার্থী সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি চার প্রকারের হয় : আর্তি বা দুঃখী, জিজ্ঞাসু বা সব কিছু জানার ইচ্ছা যাঁর, অর্থার্থী বা কোন কিছুর প্রাপ্তি বা আকাঙ্ক্ষা যাঁর এবং যিনি জ্ঞানবান্। জীবনে কোনপ্রকার মনোব্যথা প্রাপ্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তিনি আর্তি ; ঈশ্বর কি বস্তু জানার প্রবল ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসু বলা হয়। জীবনে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যাঁর বর্তমান তিনি অর্থার্থী এবং যিনি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী তিনি জ্ঞানী। এইরূপ ব্যক্তি সকলেই ভাগ্যবান কারণ তাঁরা ঈশ্বর অন্বেষণ করেন। এঁদের মধ্যে অবশ্য জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। বহু জন্মার্জিত সুকৃতির ফলে কোন ব্যক্তি জ্ঞানবান হন। জ্ঞানী ব্যক্তি দৃঢ় নিশ্চয় যে জগৎদৃশ্যে একমাত্র বাসুদেব, পরমেশ্বরই সত্যবস্তু। এই নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা তিনি সংসার বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য পরমেশ্বরে আশ্রয়প্রার্থী হন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সর্বপ্রকার কর্ম অবগত হন।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম যোগ

এই অধ্যায়ে হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতির গূঢ় সব রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা কর হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের প্রথমোক্ত "অক্ষর" ও "ব্রহ্ম" শব্দ থেকে অধ্যায়ের শিরোনাম "অক্ষরব্রহ্মযোগ" করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে অক্ষর, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, আধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ ইত্যাদি তত্ত্বের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় এই শ্লোক দ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনার সঙ্গতি রক্ষার্থে এস্থলে পুনরুল্লিখিত হল। সাধক যোগপথে অগ্রসর হলে স্বাভাবিকভাবে এইসকল তত্ত্বের তাৎপর্য জানার ইচ্ছা হয়। গীতায়ও অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এইসকল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোকে বলা হয়েছে অক্ষরই পরব্রহ্ম। উপনিষদ ব্রহ্মকে কারণ এবং অক্ষর পরব্রহ্মকে সর্বকারণ কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। অপ্রকাশরূপ পর-ব্রহ্ম হতেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যকে অধ্যাত্ম বলে এবং বস্তু প্রকাশক ব্রহ্ম বা প্রণবনাদকে কর্ম বলা হয়। সৃষ্ট বস্তুর যে বিনাশ-ভাব তাই অধিভূত এবং চৈতন্যশক্তির প্রকৃতিজাত দৃশ্যের সঙ্গে একাত্মতাপ্রাপ্ত অবস্থাকে, পুরুষকে বা আভাসচৈতন্যকে অধিদৈব বলে। আর সর্বব্যাপ্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মধ্যাবস্থার পরিবর্তন যদ্দারা সম্ভাবিত হয় অথচ নিজের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, সেই কূটস্থচৈতন্য, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপী গীতার বক্তাই অধিযজ্ঞ। এই কূটস্থচৈতন্যকে স্মরণ করে দেহত্যাগ হলে নিশ্চিতরূপে সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১)

---

(১) "অক্ষরং ব্রহ্মপরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥" (গীতা ৮/৩)
"অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥" (গীতা ৮/৪)
"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥" (গীতা ৮/৫)

উক্ত দেহত্যাগের বিষয়ে বিবরণ প্রদান করে অতঃপর দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে বিস্তৃতরূপে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

দেহত্যাগের সময় মনকে অচঞ্চল অবস্থায় ধৃত করে যোগবলে প্রাণকে ভ্রূযুগলমধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করলে যুক্ত স্থলে পরমজ্যোতির দর্শন হয়। যোগীর দেহত্যাগের কৌশল বর্ণনা করে শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যোগবলের সাহায্যে ভক্তিযুক্ত হয়ে মনকে ভ্রূযুগল মধ্যবর্তী কূটস্থে সম্যকরূপে সংহত করে দেহত্যাগ করলে দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষকে লাভ করা যায়। (১) ঐ কৌশলের বিস্তারসাধন করে পরে বলা হচ্ছে, সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, মনকে হৃদয়গুহায় নিরুদ্ধ করে প্রাণকে মূর্দ্ধায় উঠিয়ে যোগধারণাপূর্বক ওঁ-কার ধ্বনি প্রকাশ করে পরমাত্মার স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ হলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। ভ্রূযুগল মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্র থেকে শিখাস্থান পর্যন্ত দশ আঙুল পরিমাণ স্থান দেহের সর্বোত্তম পবিত্রস্থান গণ্য হয়। আজ্ঞাচক্রকে অজ্ঞানচক্র বলা হয়, দশ আঙুল পরিমাণ স্থানের মধ্যভাগে—তালুতে—বিজ্ঞানচক্র, এবং শিখাস্থান মূর্দ্ধায় জ্ঞানচক্র অবস্থিত। মূর্দ্ধায় ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে প্রাণত্যাগ করতে পারলে কৈবল্যমুক্তি হয়। এই কৌশলই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে।

ষোড়শ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে একবিংশ শ্লোক পর্যন্ত দর্শিত হয়েছে। যে একমাত্র অক্ষর পরমাত্মা ব্যতীত অন্য সকল বস্তুই সৃষ্ট এবং আবর্তন বা

(১) "প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
"ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"
—(গীতা—৮/১০)

(২) "সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মানং প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥" (গীতা—৮/১২)
"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং যাতি পরমাং গতিম্ ॥" (গীতা—৮/১৩)

জন্মমরণধর্মী ; এমন কি ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাও (১) ব্রহ্মেরও প্রকাশ অপ্রকাশরূপ দিবারাত্র হয় ; ব্রহ্মের প্রকাশরূপ সৃষ্টি দিবাভাগ। অব্যক্ত বা পরমাত্মার প্রকৃতি হতে সর্ববস্তুর সৃষ্টি হয় এবং ব্রহ্মের রাত্রিতেই ঐ সকল সৃষ্টি অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত এবং পুনঃ দিবাপ্রকাশে সৃষ্ট হয়। (২) এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐপ্রকার এক সহস্র যুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার রাত্রি। পরন্তু উক্ত অব্যক্ত প্রকৃতি হতেও অব্যক্ত এক সনাতন অপরিবর্তনীয় পরমভাব আছে. সর্ববস্তুর বিনাশেও যার ধ্বংস বা বিনাশ হয় না। সেই অব্যক্তের অব্যক্ত ভাবকে পরমগতি অক্ষর বলে ; সেইভাবই পরমাত্মার স্থান যেখানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। (৩) এই সব শ্লোকোক্ত তথ্যসমূহ চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত "যুগের" উল্লেখের বিস্তৃতি বলা যায়। গ্রন্থের "যুগ ও যুগধর্ম" প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা নিবদ্ধ করা হয়েছে। গীতায় উক্ত শ্লোকে যে যুগের উল্লেখ আছে মনুস্মৃতি মতে ঐ যুগ বস্তুতঃ দৈবযুগ।

অধ্যায়ের শেষে চতুর্বিংশ এবং পঞ্চবিংশ শ্লোকে যোগীর দেহত্যাগ বিষয়ে আরও তথ্য বিবৃত হয়েছে। এইসব তথ্য সাধারণের বোধগম্য হতে পারে না। একমাত্র উন্নত যোগীই এই শ্লোকের মর্ম অনুধাবন করতে পারেন। বলা হয়েছে. যোগীর মৃত্যু দুই প্রকারের হয়। একপ্রকারে কৈবল্যমুক্তি হয়, পুনর্জন্ম হয় না। অপর প্রকারে যোগী পুনঃ জন্মপ্রাপ্ত হন। প্রথম প্রকারকে উত্তরায়ণে

(১) "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"—(গীতা—৮/১৬)

(২) "সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রি যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥"
"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"—(গীতা—৮/১৭,১৮

(৩) "পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ (গীতা—৮/২০)
"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (গীতা—৮/২১)

দেহত্যাগ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে দক্ষিণায়ণে দেহত্যাগ বলা হয়। (১) এই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বাহ্যিক সূর্যের বার্ষিক গতিদ্বারা নির্ধারিত নয়; দেহে প্রকাশিত জ্যোতি প্রকাশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে আজ্ঞাচক্র থেকে জ্ঞানচক্র পর্যন্ত দশ আঙুল পরিমাণ স্থানকে পবিত্রতম "দশাঙ্গুলম্" বলা হয় শাস্ত্রে। এই পবিত্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত আত্মাই উত্তরায়ণ পথ প্রাপ্ত। কৈবল্যমুক্তি প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানচক্র বা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে প্রাণত্যাগ করতে হয়। নিম্নভাগে প্রাণত্যাগ করলে যোগী কৈবল্য মুক্তিলাভ করেন না, পুনরায় দেহগ্রহণ করেন। উত্তরায়ণে সূর্যরশ্মির মত তেজোজ্জ্বলা শ্বেত জ্যোতির প্রকাশ হয়, এবং দক্ষিণায়ণে চন্দ্রের কিরণের মত ধূম্রবর্ণের জ্যোতির প্রকাশ হয়। উন্নত যোগীগণ এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।

নবম অধ্যায়

(রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ)

স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরজীর মতানুসারে গীতার মুখ্য উপদেশ প্রথম অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায়েই বস্তুতঃপক্ষে সমাপ্ত। এই দৃষ্টিতে নবম অধ্যায়কে গীতোপদেশের উপসংহারও বলা যায়। গীতায় উপদিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত বিদ্যা অতিগুহ্য রাজবিদ্যা; বস্তুতঃ গীতায় উক্ত অব্যয় তত্ত্ব সুখে অর্থাৎ বিনা কাঠিন্যে অপরোক্ষভাবে অবগত হওয়া যায়। অব্যক্ত পরমাত্মা দ্বারা সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত; সর্বভূত পরমাত্মাতেই অবস্থিত। কি প্রকারে অবস্থিত তার উদারহণ সর্বত্র গমনশীল বায়ুর আকাশে অবস্থানের মত। সমুদায় সৃষ্ট বস্তু তথা জীবজগৎ পরমাত্মাকে আশ্রয় করেই চিরপরিবর্তনশীল।

---

(১) "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥"—(গীতা—৮/২৪)
"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ণম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥"—(গীতা—৮/২৫)

পরন্তু পরমাত্মা অব্যয়, সনাতন, স্থির। সকল বস্তু পরমাত্মার প্রকৃতি হতে পরমাত্মারই অধ্যক্ষতায় সৃষ্ট হয় এবং ঐ প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মার অধ্যক্ষতা নিবন্ধনেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়। পরমাত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু এবং সর্বপ্রকার প্রকাশের মূল। সেই অব্যয় সর্বকারণ কারণ পরমাত্মাই মূলতঃ সর্বজীবের গতি, ভর্তা, প্রভু, আশ্রয় এবং সুহৃৎ। (১) মানুষ যা কিছু পূজা করে, দেবতারই উপাসনা করে এবং যাঁর ভজনা করে বস্তুতঃ পক্ষে সবই পরমাত্মাকেই করা হয়। তবে এইসকল পূজার্চনাদি বিধিপূর্বক না হওয়ায় অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে সাধিত না হওয়ায় ফলও সেইরকম হয়। সেই কারণে মানুষের সর্বরকম কার্য পরমাত্মাকে সাক্ষাৎভাবে উদ্দেশ্য করে সাধন করা প্রয়োজন। পরমাত্মার কোন ভেদাভেদ নেই, যে ব্যক্তি তাঁকে ভজনা করে তিনি তাঁরই হন। এমনকি দুরাচারী, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে তাঁর ভজনা করে তবে সে ব্যক্তি সাধু বলে গণ্য হয় এবং অচিরেই ধর্মাত্মা হয়ে শাশ্বত চিরশান্তির অধিকারী হয়। (২) সেইজন্য গীতার শাশ্বত উপদেশ সর্বদা সর্বভাবে পরমাত্মারই ভজনা করা এবং পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া। (৩)

দশম অধ্যায়

(বিভূতিযোগ)

এই অধ্যায়ের সূত্রপাতেই সংকেত পাওয়া যায় যে নবম অধ্যায়েই গীতার উপদেশ মুখ্যতঃ শেষ হয়েছে। প্রথম শ্লোকে ভগবান বলছেন, "তোমার

---

(১) "গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ — (গীতা—৯/১৮)

(২) "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ॥"—(গীতা—৯/৩০)

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥" —(গীতা ৯/৩৪)

ভূতের জন্য পুনরায় বলছি—"। ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ বিষয়ে বিভূতি-যোগের এই অধ্যায়ে প্রকাশ করা হয়েছে। পরমাত্মাই সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরে আত্মারূপে অবস্থিত। তাঁর বিশেষ বিশেষ প্রকাশ সম্বন্ধে অতঃপর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কমণ্ডল মধ্যে চন্দ্রমা ইত্যাদি। অবশেষে বর্ণনা সমাপ্ত করে ভগবান বলছেন—"বিস্তারিতভাবে কি বলব ? জেনে রাখ যে আমার মাত্র একাংশে সমুদায় জগৎ বিধৃত।"

একাদশ অধ্যায়

(বিশ্বরূপদর্শন যোগ)

তত্ত্ব সমুদায় অবগত হওয়ার পর সকল সাধকের ঐশ্বর্য দর্শনের বাসনা হয়। ঐশ্বর্যদর্শন এই চক্ষুর দ্বারা হয় না। দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপী সমর্থ সদ্‌গুরু শিষ্যের এই দিব্যচক্ষু উন্মীলন করতে পারেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার এইপ্রকার ঐশ্চর্য প্রদর্শন করেছিলেন। পরমহংস যোগানন্দও দুবার এই প্রকারের ঐশ্বর্য দর্শন করেছিলেন বলে লিখে গেছেন। একবার ছাত্রাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা শ্রী 'ম' বা মহাসাধক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং অপর বার গুরুস্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর যোগশক্তি দ্বারা পুরীধামস্থ কড়ারাশ্রমে। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা দিব্যচক্ষু প্রদত্ত হয়ে অর্জুন দেখেছিলেন সৃষ্টির সমুদায় বস্তু, সর্বপ্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ শ্রীকৃষ্ণের দেহাভ্যন্তরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

(ভক্তিযোগ)

গীতার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এই অধ্যায়ে নিত্য তদ্‌গতচিত্ত হয়ে পরমশ্রদ্ধার সহিত যিনি পরমাত্মার উপাসনা করেন তাঁকেই শ্রেষ্ঠ যোগী বলে অভিহিত

করা হয়েছে। (১) অব্যয় অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। (২ যে সাধক সমস্ত কর্ম পরমাত্মাকে সমর্পণ করে অন্য পথ পরিহার করে পরমাত্মায় তদ্‌গতচিত্ত হয়ে ধ্যানে রত হন তিনি অচিরে মুক্তিলাভ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ)

"ক্ষেত্র" শব্দের বিশ্লেষণে প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় এবং "জ্ঞানের' বিশ্লেষণে চতুর্থ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় এই অধ্যায়ের তত্ত্বনির্ণায়ক শ্লোকের উদ্ধৃতি করা হয়েছে। প্রকৃতিরূপী শরীর ক্ষেত্র এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ পুরুষরূপী ক্ষেত্রজ্ঞ এই অধ্যায়ের প্রধান বক্তব্য বিষয়। প্রকৃতি-পুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞানই জ্ঞান শব্দের প্রকৃত অর্থ।

প্রকৃতি এবং পুরুষ আদিরূপে সম্বন্ধযুক্ত; প্রকৃতির ত্রিগুণের বিকার হতেই সমগ্র বস্তুর সৃষ্টি, এবং কার্য কারণের হেতু নিবন্ধন প্রকৃতি "ভোগ"রূপে এবং পুরুষ প্রকৃতিজাত বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগে সুখ দুঃখ বোধের হেতু—ভোক্তারূপে বিবৃত হয়েছে। (৩) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতিজাত গুণসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভোক্তারূপে প্রতীত হয় এবং "জীব" ভাব প্রাপ্ত হয়ে জন্মমৃত্যু যোনি প্রাপ্ত হয়। পরমপুরুষ পরমচৈতন্যই জীবদেহে বস্তুতঃ দ্রষ্টা, কর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা নামে অভিহিত হয়। (৪) স্থাবর, অস্থাবর সকল বস্তুই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রকৃতি-পুরুষের সংযুক্তির কারণেই উদ্ভূত হয়। যিনি ধ্বংসাত্মক বিনশ্বর সকল বস্তুতে অবিনশ্বর পরমপুরুষকে

---

(১) "ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥"—(গীতা—১২/২)

(২) "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥—(গীতা—১২/৫)

(৩) "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসংভবান্॥"—(গীতা—১৩/২০)

(৪) "কার্যকারণ কর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"—(গীতা—১৩/২১)

দেখেন তাঁর দর্শনই যথার্থ। (১) সকলপ্রকার কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই সাধিত হয়; আত্মাকে যিনি অকর্তারূপে জানেন তিনিই যথার্থ জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা। (২) পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ, অব্যয়, এবং শরীরে অধিষ্ঠিত থেকেও না কোন কর্ম করেন, না কোন কর্মে লিপ্ত হন। (৩)

চতুর্দশ অধ্যায়

(গুণত্রয় বিভাগ যোগ)

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণ। অব্যাকৃত প্রকৃতিতে এই তিনগুণ সাম্যাবস্থায় থাকে বলা হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক আকর্ষণী শক্তিযুক্ত; রজগুণ ক্রিয়াত্মক এবং তমোগুণ আবরণাত্মক বিক্ষেপণী শক্তিযুক্ত। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বর্ণিত হয়েছে যে চৈতন্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়ায় তিনগুণের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়, ফলস্বরূপ প্রকৃতির বিকার হয়ে প্রথমে মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। মহৎ তত্ত্বের আবির্ভাবে সৃষ্টির পর্যায়ের আরম্ভ হয়। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "মহৎব্রহ্মই" পরমাত্মার যোনি এবং এই যোনিতে তিনি গর্ভদান করেন। সকল বস্তুর যে উৎপত্তি বা উদ্ভব দর্শন হয় মহৎ-ব্রহ্ম সে সকলের যোনিস্বরূপ এবং পরমপুরুষ অনন্তচৈতন্য সে সকলের বীজপ্রদ পিতা। (৪)

---

(১) "পুরুষ প্রকৃতিস্থ হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজানগুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদযোনিজন্মসু॥"—(গীতা—১৩/২২)

(২) "উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"—(গীতা—১৩/২৩)

(৩) "অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥—(গীতা—১৩/৩২)

(৪) "মমযোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥"—(গীতা—১৪/৩)

"সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥—(গীতা—১৪/৫)

প্রকৃতির অন্তর্গত সত্ত্ব, রজ, তম গুণ দেহীকে, অর্থাৎ দেহস্থ পুরুষকে বন্ধনদশা প্রাপ্ত করায়। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক হওয়ার কারণ এই জ্ঞান সুখ ও জ্ঞানের উদ্ভব করে দেহীকে সুখসঙ্গে আবদ্ধ করে, রজগুণ ক্রিয়াত্মক হওয়ার কারণ কর্মসংযোগ দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ অজ্ঞানাত্মক হওয়ার কারণ মুগ্ধ করে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রাদ্বারা আবদ্ধ করে।

সত্ত্ব, রজ, তম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গুণ নয়; তিন গুণেরই যৌগিকমাত্র। রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়, তম ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করে রজ গুণের প্রকাশ হয় এবং সত্ত্ব ও রজগুণকে অভিভূত করে তমোগুণ প্রকাশ পায়। (১) ত্রিগুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কৌশল হল এইসব গুণেরই কার্যজ্ঞান করে সেই সকলের প্রতি উদাসীন ও অনাসক্ত থাকা। (২)

পঞ্চদশ অধ্যায়

(পুরুষোত্তম যোগ)

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে উপনিষদোক্ত এক প্রখ্যাত উপমার অবতারণা করা হয়েছে। জগৎ সংসাররূপ চিরবিনাশী কিন্তু চির অবস্থিত প্রবাহকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অশ্বত্থ শব্দের অর্থ যা আগামীকাল পর্যন্ত থাকবে না (ন শ্ব অপি স্থাস্যতি)। যেমন নদীর স্রোতে একবিন্দু জলও স্থির থাকে না, কিন্তু স্রোতের প্রবাহ বন্ধ হয় না। সংসার রূপ অশ্বত্থেরও একই রূপ। সংসারের কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু সংসারপ্রবাহের বিরাম কোথায়।

এই অশ্বত্থের মূল বা গোড়া ঊর্ধ্বদিকে, এবং শাখাপ্রশাখা নিম্নদিকে

(১) "রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥"—(গীতা—১৪/১০)

(২) "উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাবর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥"—(গীতা—১৪/২৩

প্রসারিত। এই বৃক্ষের নিম্নদিকে প্রসারিত শাখা গুণপ্রধান বিষয়সংযুক্ত কর্মবন্ধনরূপ মনুষ্যলোক। (১) এই অশ্বত্থের উপদেশ উদাসীন অসক্ত রূপ শস্ত্রদ্বারা এই সংসাররূপদৃঢ় মূল অশ্বত্থের ছেদন করে সেই পদে উপনীত হতে হবে যেখান থেকে সমস্ত প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং যেখানে পৌঁছাতে পারলে আর প্রত্যাবর্তন করা হয় না, মুক্তিলাভ হয়। (২)

সৃষ্টি মধ্যে দুই প্রকারের পুরুষ বর্তমান বলা হয়েছে; ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ। বিনাশশীল বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষর পুরুষ, এবং কূটস্থ-রূপে অবস্থিত অপরিবর্তনীয় চৈতন্য অক্ষর পুরুষ। ক্ষর পুরুষের অতীত বা উপরে এবং অক্ষরপুরুষ অপেক্ষাও উত্তম চৈতন্য বা পুরুষ পরমাত্মা অব্যয় নামে অভিহিত চৈতন্যকে উত্তম পুরুষ বলা হয়। (৩) এই উত্তমপুরুষ ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত ও আবিষ্ট হয়ে সকলকে পালন করেন। মোহমুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি এই পুরুষোত্তমকে জ্ঞাত, তিনি সর্বজ্ঞ এবং পুরুষোত্তমকে ভজনা করেন। (৪)

---

(১) "উর্ধ্বমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥"—(গীতা—১৫/১)
"অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয় প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসংততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥"—
(গীতা—১৫/২)

(২) "অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা॥—"
(গীতা—১৫/৩)
"ততঃপদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥"
—(গীতা- ১৫/৪)

(৩) "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥"
"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য পরমাত্মেত্যুদাহৃত:।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"—(গীতা—১৫/১৬,১৭)

(৪) "যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥"—(গীতা—১৫/১৯)

ষোড়শ অধ্যায়

(দৈবাসুর সম্পদবিভাগ যোগ)

মানুষের মধ্যে যে সকল গুণ বা বৃত্তি দৃষ্ট হয় তাদের মধ্যে দৈবী ও আসু উভয়ই বর্তমান। এই অধ্যায়ে এই উভয়বিধ গুণ বা ভাবের সংজ্ঞা দেও হয়েছে। এই গুণ বা ভাবকে সম্পদ বলা হয়েছে।

নিম্নলিখিত গুণকে দৈবীসম্পদ বলা হয়:

নির্ভীকতা, মনের পবিত্রতা, জ্ঞান, যোগনিষ্ঠা, দান প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় সংয যজ্ঞক্রিয়া, বেদপাঠ, তপস্যা, সারল্য, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধশূন্যত ত্যাগ, প্রশান্তি, লোভশূন্যতা, সর্বজীবে দয়া, লজ্জা, নম্রতা, অচলতা, তে ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ, অদ্রোহ।

আসুরী সম্পদ নিম্নপ্রকার:

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, হিংস্রতা ও অজ্ঞানতা। আসুরী ভাবে মূলকারণ কাম, ক্রোধ এবং লোভ। এই তিনই মানবের শত্রু; সুতরাং এ তিন শত্রুকে সর্বপ্রকারে জয় করা কর্তব্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

(শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ)

মানবের সকল প্রচেষ্টা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকা হয়। শ্রদ্ধা, যজন বা পূজা, আহার, যজ্ঞ, তপস্যা দান ইত্যাদি উক্ত তি প্রকারের দেখা যায়। এই অধ্যায়ে এই সকল প্রচেষ্টার তিন ভাবের বিবরণ নিবদ্ধ করা হয়েছে। সকল ব্যবহারই সাত্বিক হওয়া প্রয়োজন, এ সত্য প্রকাশ করাই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

(মোক্ষ যোগ)

সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব বিশ্লেষণ-উদ্দেশ্যে অধ্যায়ের সূত্রপাত। নূতন কান তথ্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়নি, পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বেরই নরুক্তি হয়েছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধাত্রয়েরও অনেক দাহরণ উল্লিখিত হয়েছে। অধ্যায়ের অন্তে উক্ত হয়েছে ঈশ্বর সর্বভূতে ধিষ্ঠিত হয়ে নিজ মায়াদ্বারা সর্বজীবকে পরিচালিত করছেন। সুতরাং র্বভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন, এই হল শান্তিপদ প্রাপ্তির পায়। (১)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদব্যাস রচিত যোগশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা, উপনিষদ্ এবং শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ নামে প্রখ্যাত। বেদব্যাসকৃত আরও তিনটি শ্রীকৃষ্ণার্জুন ংবাদ নামীয় গীতা প্রসিদ্ধ। একটি হল মহাভারতেরই আশ্বমেধিক পর্ব-মন্তর্গত "অনুগীতা", ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অন্তর্গত "উত্তর গীতা" এবং সপ্তশ্লোকী গীতা।" মহাভারতে উক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাষায়—"অনুগীতার" সন্দেশ ভগবদ্ গীতারই অনুরূপ। সপ্তশ্লোকী ভগবদ্গীতা থেকে চয়ন করা সাতটি শ্লোক। কান কোন মহাত্মার মতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "কর্মযোগ", উত্তরগীতায় জ্ঞান-যাগ এবং সপ্তশ্লোকী গীতায় লয়যোগ বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে।

অনেকে মনে করেন শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে তিনটি ষটকে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়—কর্মযোগ ষটক, সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগষটক এবং শেষের ছয় অধ্যায় জ্ঞানযোগষটক। যাই হোক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা র্যালোচনা করলে স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরজীর অভিমতই যথার্থ প্রমাণিত হয় যে ভগবদ্গীতার প্রথম অর্ধে—প্রথম অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায়ের মধ্যেই গীতার মুখ্য উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে।

---

(১) "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"
"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥"—
(গীতা—১৮/৬১,৬২)

কৈবল্যদর্শনের উপদেশ

হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতি ও ভগবান যিশুর বাণী

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী বিরচিত কৈবল্যদর্শন এক অভিনব গ্রন্থ। এই গ্র প্রণয়নের প্রস্তাব যে পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে উত্থাপিত হয়েছিল সে বিবর উপক্রমণিকায় আলোচিত হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে যমুনার তীরে কুম্ভমেলা অধিবেশনের সময় অযাচিতভাবে পরমগুরু মহামুনি বাবাজী মহারাজ দ্বারা আহূত হয়ে বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এই প্রস্তাব নিঃসৃত হয়েছিল। স্বামীজী মহারাজ তখনও সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেননি; পিতৃদত্ত নাম প্রিয়নাথ কড়ার নামে পরিচিত ছিলেন মুক্তাত্মা বাবাজী মহারাজ কর্তৃক সস্নেহে "স্বামীজী মহারাজ" নামে অভ্যর্থিত হওয়ার পুণ্যস্মৃতি মনে রেখে নিজ নামের সঙ্গে "স্বামী" যুক্ত করে "প্রিয়নাথ কড়ার স্বামী" লিখতে শুরু করেন। কৈবল্যদর্শনের ভূমিকার পূর্বে নিজ পরিচয় লিপিবদ্ধ করার সময় ঐ নামই লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ববর্তী কথোপকথনের ধারা পর্যালোচনা করলে গ্রন্থের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়। পটভূমিতে দেখা যায় পাশ্চাত্যবাসী সাধারণ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী অনেকেই অধ্যাত্ম সম্পদে উন্নত হয়ে প্রকৃত অধ্যাত্ম তত্ত্বকথা অধ্যাত্ম সাধন বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় সাধারণ সংসারী জীবনযাপন করেন; অধিকন্তু ভারতীয় গূঢ় অধ্যাত্ম তত্ত্বের ছায়া খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠগ্রন্থে যিশুর বাণীরূপে কথিত উপদেশের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কৈবল্যদর্শন রচনায় এক অভিনব ধারা প্রবর্তিত হয়েছে গ্রন্থের মূল বক্তব্য সংস্কৃত ভাষায় অন্যান্য হিন্দুদর্শনের ন্যায় সূত্রাকারে প্রদত্ত কিন্তু বক্তব্যের বিস্তার বা ব্যাখ্যা গ্রোথিত হয়েছে ইংরাজী ভাষায়, এবং ব্যাখ্যার মধ্যে বাইবেল গ্রন্থ থেকে উপযোগী যিশুর বাণী উদ্ধৃত করে বক্তব্য বিষয় খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর অনুধাবনযোগ্য করার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সূত্রসকল হিন্দুধর্মের মৌলিক অধ্যাত্ম তত্ত্বাবলীর উপর

প্রতিষ্ঠিত, ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা পাঠে পাশ্চাত্য পাঠকের মনে উদয় বে যে বাইবেল গ্রন্থে নিহিত ভগবান যিশুর বাণীর গূঢ়ার্থ যা ধর্মযাজকের খে শোনা যায় তা থেকে পৃথক কিন্তু যুক্তিযুক্ত এবং বোধগম্য। পাশ্চাত্য স্টধর্মাবলম্বীদের হিন্দু অধ্যাত্মশাস্ত্রের মৌলিক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ রাই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য, সেই দৃষ্টিতে রচনা সার্থক বলা যায়।

যিশুখ্রীস্টের জীবনযাপনের ব্যাপারে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ দশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর থেকে উনত্রিংশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবন-তিহাস অজ্ঞাত। এই দীর্ঘ ষোল-সতের বৎসর কাল যিশু কি করেছেন কোথায় ভ্রমণ করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন তথ্য সন্দেহাতীতরূপে পরিবেশিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পর তাঁর কবরস্থ মৃতদেহের অন্তর্ধানও একটি রহস্যপূর্ণ ঘটনা। এই বিষয়ে নানা প্রশ্ন যে বিভিন্ন সময়ে কোন কোন ব্যক্তির মনে উদয় হয়নি তা নয়; পরন্তু ঈশ্বরপুত্রের ঐশীলীলা রূপ অলৌকিক ঘটনা সকল প্রশ্নের উপর যবনিকা টানার সযত্ন প্রয়াস বরাবর লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন সম্পূর্ণ মুছে যায়নি; মাঝে মধ্যে নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়ে এক একজন আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই অসাধারণ ঘটনার ব্যাখ্যা করে গেছেন।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে নিকোলাস নটোভীচ নামে এক রুশ ভূ-পর্যটক ১৮৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দের তুর্কী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কেবল দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মধ্য এশিয়া, ককেশাশ, পারস্য, আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চল ঘুরে ঘুরে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতভূমিতে উপস্থিত হন। রাওয়ালপিণ্ডি অমৃতসর হয়ে এসে হাজির হন মর্ত্যের অমরাবতী কাশ্মীরে এবং কাশ্মীর থেকে লাদাকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল ওখান থেকে কারাকোরম ও চীনা তুর্কীস্থান পার হয়ে স্বদেশে ফিরে যাবেন। লাদাকে ঘুরতে ঘুরতে যখন এক বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন, তথাকার প্রধান লামার মুখে শুনতে পান যে প্রাচীন নগরী লাসাতে যিশুখ্রীস্টের জীবন সম্বন্ধে কিছু অতি প্রাচীন নথিপত্র রক্ষিত আছে: এবং অন্যান্য বৃহৎ বিহারে ঐ সকল নথিপত্রের অনূদিত অনুলিপিও পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে পুনরায় এই দেশে আসা সম্ভব হবে না মনে করে তিনি তখনই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেন, এবং মনস্থ করলেন যে ঐসব

নথিপত্রের নকল নেবার চেষ্টা করবেন, এবং তা যদি সম্ভব না হয় তবে সোজা লাসা যাবেন। লাদাকের প্রধান শহর লে ভ্রমণের সময় তিনি হিমিস বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেন। কথোপকথনের দ্বারা হিমিস বিহারের প্রধান লামার কাছে জানতে পারেন যে ঐ বিহারে উল্লিখিত নথিপত্রের অনুলিপি রক্ষিত আছে। তিনি জাতিতে রুশ, সুতরাং উৎসাহের আতিশয্য প্রদর্শন করলে পাছে তাঁর আগমন সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয় তাই তিনি কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। মনে মনে উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। সকলকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করবেন। করলেনও তাই; কিন্তু এক হিসাবে সৌভাগ্যই বলতে হয়—পথে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে একটি পা ভেঙে যায়। অগত্যা তাঁকে লে-র বৌদ্ধবিহারে বয়ে আনা হল। অতিথিবৎসল এবং সেবাপরায়ণ লামারা অতি যত্নে ও শুশ্রূষায় তাঁকে সুস্থ করে তুলল। ঐ সময় তিনি প্রধান লামাকে অনুরোধ করেন—তাঁকে যিশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে লাসায় রক্ষিত নথিপত্রের তিব্বতী ভাষায় অনুদিত প্রতিলিপিগুলি যেন একবার দেখান। কিছু ভেবে-চিন্তে লামা সেই প্রতিলিপি গ্রন্থাগার থেকে এনে তাঁকে পড়ে শোনান। লামাদ্বারা তিব্বতী ভাষায় লেখা পুথি পাঠের সময় নটোভীচের দোভাষী রুশ ভাষায় তর্জমা করে লিখে নেয়। লামা দাবি করেন যে লাসায় রক্ষিত মূল নথি পালিভাষায় লিখিত এবং বহুপূর্বে ভারত এবং নেপাল থেকে আনা। উক্ত নথি থেকে জানা যায় যে যিশু যখন ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করেন এবং যখন তাঁর বিবাহের কথাবার্তা হচ্ছিল তখন একদিন চুপচাপ ভারতগামী ব্যবসায়ী যাত্রীদের সঙ্গে মিশে ভারতে চলে আসেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ভারতীয় শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে পরিচিত হন। জগন্নাথক্ষেত্রে ছয় বৎসর ছিলেন। পরে তাঁর স্বদেশবাসীর দুর্গতির খবর শুনে উনত্রিশ বৎসর বয়সে ইসরাইল ফিরে যান।

"ঋষি ইশার জীবনী" (লাইফ অফ সেইন্ট ঈশা) নামে এক গ্রন্থ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশ করেন এবং ঐ গ্রন্থে উক্ত সকল তথ্য নিবদ্ধ করেন। জানা যায় প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ভারত সংস্কৃতিবেত্তা মোক্ষমূলর যিশুর উপদেশের সঙ্গে তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের

মহাজান শাখার সাধন প্রণালীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, নটোভীচের আবিষ্কারের সর্বতোভাবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি।

যিশুর জীবনের এইসকল প্রশ্নের এখনও বিরাম হয়নি। মাঝে মধ্যেই কোন কোন তথ্যের সন্ধান এখনও প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর "জগৎ ইতিহাসের ঝলক" (গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্লড্ হিসস্ট্রি) নামক গ্রন্থে একস্থানে লিখেছেন, "সমগ্র মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর, লাদাক, তিব্বত এবং আরও উত্তরে দৃঢ় বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে যিশু বা ঈশা এই সকল স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন·········তাঁর পক্ষে এর মূলতঃ অসম্ভাব্যতা ছিল না।"

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহর থেকে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকখানি পত্র এবং ঐ পত্রের উত্তর প্রকাশিত হয়। পত্রগুলি যিশুখ্রীস্টের কবর নামে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে অবস্থিত এক প্রাচীন কবরস্থান সম্বন্ধে। পত্রকার লিখেছেন, "ঈশার কবর" নামে চিহ্নিত কবরটাতেই ভগবান যিশুর মরদেহ সমাহিত হয়েছিল। অপরপক্ষে, এই মতের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। পত্রিকার সম্পাদক এই "পত্রের-লড়াই" পরে বন্ধ করে দেন।

সঞ্জয়-পত্নী মানেকা গান্ধী পরিচালিত "সূর্য" পত্রিকার ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় মাধুর কাপুর লিখিত এক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনাম "রাউজবল—যিশুখ্রীস্টের কবর।" প্রবন্ধকার লিখেছেন, "শ্রীনগরের প্রাচীন পল্লীর এক সংকীর্ণ গলিতে বহু দোকানপুঞ্জের পশ্চাতে একটি স্মারক স্তম্ভ দেখলাম; পথপ্রদর্শক অঙ্গুলি নির্দেশে এক বস্তুর ঝলক দেখিয়ে বলল, অনতি দূরের প্রকোষ্ঠে মধ্যস্থলে ইয়ুজ আসফ বা যিশুখ্রীস্ট নামে এক ব্যক্তির কবর অবস্থিত।"

"রাউজবল কবরে একখণ্ড চামড়ার কাগজ (পার্চমেণ্ট কাগজ) পাওয়া যায়; তাতে লিখিত আছে ইয়ুজ আসফের কবর প্রসিদ্ধ এবং বহুলোক ভক্তি অর্ঘ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ঐ পবিত্রস্থান পরিদর্শনে আসেন। ঐ কাগজে আরও লিখিত আছে যে ইয়ুজ আসফ রাজা গোপ দত্তের রাজত্বকালে কাশ্মীরে

আসেন এবং ১২০ বৎসর বয়সকাল আমৃত্যু ঐ উপত্যকায় ধর্মপ্রচার করেন। ঐ পত্র আজও সুরক্ষিত।"

"লে তে অবস্থিত জার্মান মিশনের ডাঃ মার্স এবং ডাঃ ফ্রাঙ্ক সমর্থন করেছেন যে লাদাকের হিমিস গোম্ফায় তিব্বতী ও পালি ভাষার পাণ্ডুলিপিতে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর লে তে আগমন এবং অধিবাসীদের দ্বারা অভ্যর্থিত হওয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ।"

অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য থেকেও পাওয়া যায় যে ইয়ুজ আসফ এবং যিশু একই ব্যক্তি।"

"কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান ঐতিহাসিক মোল্লা নাদিরীর মতে হজরত ইয়ুজ আসফ পবিত্রভূমি থেকে আপন ধর্মপ্রবর্তকত্ব ঘোষণার জন্য (কাশ্মীর) উপত্যকায় এসেছিলেন, চুয়ান্ন (৫৪) বৎসর বয়সে তিনি তাঁর ধর্মপ্রবর্তকত্বের ঘোষণা করেছিলেন।"

"যিশুর জীবনে দেখা গেছে যখনই বিপদের আশঙ্কা করেছেন তিনি পর্বতে আশ্রয় নিতেন। কবর থেকে উত্থিত হয়ে গেথসেমেনের অলিভ পর্বতে গিয়েছিলেন যেখানে একটি শ্বেত বর্ণের গৃহ ছিল : তিনি যখন শিষ্যদের ছেড়ে পর্বতারোহণ করেছিলেন তখন গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এর পরে যা ঘটেছিল সেটা স্বর্গারোহণ নয়, পরন্তু পর্বতের সঙ্কীর্ণ শিখর পার হয়ে জেরুজালেম ত্যাগ করেছিলেন। এই সম্বন্ধে বাইবেলে উক্ত যিশুর বাণী অর্থবহ : "আমি আমার পথে চলেছি এবং তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, তোমরা তোমাদের পাপে মরবে —আমি যে স্থানে যাব তোমরা সে স্থানে আসতে পারবে না (যোহন ৭/২১)"

"তফসির-ইব্‌ন্‌-ই-জরীর-এত্‌-তবরী তে ইব্‌ন্‌-ই-জরীর লিখেছেন যে যিশু ও তাঁর মাতা মেরী দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়েছিলেন। কোরাণের ১৩/১৭ সুরাতে এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। দিবসে বিশ্রাম এবং রাত্রিতে চলে নাজারেথ পৌঁছেন ও টিবেরিয়ান সাগরে যান। রাওজাত্‌-উস্‌-সাদা (১/১৩৪) অনুসার যিশু ও মেরী মেসোপটেমিয়ার নিসিবিস্‌ (মেগনোনিয়া) উপস্থিত হন যেখানে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময় তিনি নাম পরিবর্তন করে ইয়ুজ আসফ নাম গ্রহণ করেন।"

"১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে আহ্‌মেদিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মিরজা গোলাম আহমেদ এক পুস্তক প্রকাশ করেন—নাম "মসী হিন্দুস্থানমে" এবং যিশুর কাশ্মীরের সহিত সম্পর্কের উল্লেখ করেন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে মুফ্‌তি মহম্মদ সদীক উক্ত মতবাদের সমর্থনে "কবর-ই-মসী" প্রকাশ করেন, এবং খাজা নাজীর আহমেদ ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে "যিশু স্বর্গে ও মর্ত্যে" এই নামের গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন।"

"সুত কৃত ভবিষ্য মহাপুরাণে রাজা শালিবাহনের ৭৮ খ্রীস্টাব্দে হিমালয় পরিদর্শনের বিবরণ পাওয়া যায়। তথায় হূণ দেশে গৌরবর্ণ শ্বেতবস্ত্রপরিহিত এক সাধুর সঙ্গে রাজার দর্শন হয়। শালিবাহনের প্রশ্নের উত্তরে সাধু বলেন, "আমাকে কুমারী গর্ভজাত ঈশ্বরপুত্র বলে জানবে; আমি ম্লেচ্ছ ধর্মের প্রচারক এবং সত্যধর্মের উপাসক। আরও বলেন, মহারাজ, ম্লেচ্ছ-দেশে সত্যের অপসরণে এবং চিরাচরিত বিশ্বাস ধ্বংসের কারণে আমি মেসায়া-রূপে অবতীর্ণ হই; আমার কর্মের দ্বারা দোষী শাস্তি পেয়েছে এবং সেইসঙ্গে আমিও তাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছি। তাঁর ধর্মের সম্বন্ধে বলেন,—প্রেম, সত্য এবং হৃদয়ের পবিত্রতা; এইজন্য আমাকে "মসী" বলা হয়।"

"হজরত আবু হুরেইরা কাঁস-উল-উম্বল গ্রন্থে লিখেছেন যে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর ঈশ্বর যিশুকে জেরুজালেম ত্যাগ করতে সহায়তা করেন; নচেৎ তাঁর উপর আরও অত্যাচার হতে পারত।"

যিশুর প্রাচ্যদেশে ভ্রমণ তথা আগমন বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য উক্ত সকল উদ্ধৃতি থেকে অনুধাবন করা যায়, যদিও সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায় না। সে যাই হোক, বাইবেল গ্রন্থে ভগবান যিশুর বাণী বলে উল্লিখিত বিভিন্ন উক্তির মর্মার্থ যে হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতি তথা বিভিন্ন তত্ত্বের প্রতিচ্ছায়ারূপ—এই তথ্য আবিষ্কারের সম্মান স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরজীর প্রাপ্য। স্বামীজী মহারাজের তীব্র অনুসন্ধিৎসা, বিশ্লেষণী প্রবৃত্তি, গভীর চিন্তাধারা ও অন্তর্দৃষ্টি খ্রীস্টীয় ধর্মাবলম্বীগণের আচার ব্যবহার বাইবেল গ্রন্থের গবেষণামূলক অধ্যয়ন এবং হিন্দু অধ্যাত্ম সাধন পদ্ধতির সামূহিক জ্ঞান—এই আবিষ্কারকে সম্ভব করেছে।

বলা হয় শ্রীযুক্তেশ্বরজী বাইবেলের একটি বিস্তারিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও

প্রণয়ন করেছিলেন—কিন্তু কি উদ্দেশ্যে বা ঠিক কোন সময়ে জানা নেই। স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজ প্রণীত শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে তৎকালীন ফরাসী চন্দননগরের এক ফরাসী সরকারী অধিকারীর সখ্য হয়েছিল। একদিন স্বামীজী মহারাজ ঐ ফরাসী ভদ্রলোককে বাইবেলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার উল্লেখ করে কিছু কিছু ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ব্যাখ্যা শুনে ফরাসী ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে স্বামীজী প্রণীত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পাণ্ডুলিপি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্যবস্থা মত একদিন তাঁর ব্যাখ্যা ভদ্রলোকটিকে দেখান। পাণ্ডুলিপি পাঠ করে ভদ্রলোক চমৎকৃত হন এবং মন্তব্য করেন, "এই পুস্তক ছাপা হয়ে প্রকাশিত হলে সমগ্র খ্রীস্টান জগতে ওলটপালট তোলপাড় হয়ে যাবে।" অল্পদিন পরে ভদ্রলোকের ছুটিতে ফরাসীদেশে যাওয়ার কথা ছিল ; তিনি স্বামীজী মহারাজকে অনুরোধ করেন যেন ছুটিতে দেশে যাওয়ার সময় ঐ পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ফরাসী দেশের প্রধান প্রধান মনীষীদের ঐ পাণ্ডুলিপি দেখান। স্বামীজী মহারাজ আপত্তি করেননি এবং পাণ্ডুলিপি ফরাসী বন্ধুর হাতে তুলে দেন! দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ ভদ্রলোক আর চন্দননগরে তথা ভারতে ফেরেননি, এবং সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বলিত পাণ্ডুলিপিও। সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন খবরও পাননি। স্বামীজী মহারাজ নিজ মুখে কোন দিন কিছু বলেননি, বর্ষীয়ান শিষ্যদের নিম্নস্বরে কোন কোনদিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শোনা যেত। কেউ কেউ বলতেন যিশুর গুরু জন্-দি-বেপটিস্ট জেরুজালেমে এক গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন ; সভ্যরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপনে সাধনাভ্যাস করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল ঐ গুপ্ত সমিতির সদস্যরা ক্রিয়াযোগের অভ্যাস করতেন।

শ্রীযুক্তেশ্বরজী যুগধর্মে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মহামুনি বাবাজি মহারাজের সঙ্গে মিলন তথা কৈবল্যদর্শন প্রণয়নও যুগ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছিল সেই বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় ছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামীজী মহারাজ দেখিয়েছেন যে ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে যুগ পরিবর্তনকারী সৌরমণ্ডলের অর্ধবৃত্তাকার গতি প্রযুক্ত ঊর্ধ্বমুখী কলিযুগের অবসান হয় এবং

নূতন দ্বাপর যুগের সূচনা হয়। এই নব যুগের আবির্ভাবে জগতের মানুষ সূক্ষ্ম বিষয় অনুভবের শক্তি অর্জন করে এবং উন্নত ধর্মের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভবশক্তির ক্রমবিকাশের প্রমাণস্বরূপ গ্রন্থের ভূমিকায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তথা সমাজ ও রাজনীতিতে উন্নতির এক তালিকা নিবদ্ধ করেছেন। বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে পৃথক প্রবন্ধে "যুগ ও যুগধর্ম" শিরোনামে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

কৈবল্যদর্শন গ্রন্থ চার অধ্যায়ে সমাপ্ত; প্রতি অধ্যায়ে সংস্কৃত ও ইংরাজী শিরোনাম। প্রথম অধ্যায় "বেদ" বা "গসপেল" (Gospel), দ্বিতীয় অধ্যায় "অভীষ্ট" বা "গোল" (Goal), তৃতীয় অধ্যায় "সাধনা" বা "প্রসিডিয়র" (Procedure), এবং চতুর্থ অধ্যায় "বিভূতি" বা "রেভেলেশন" (Revelation)।

বেদ অধ্যায়ে মূল তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, অভীষ্ট অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের অভীষ্ট নির্ণয়; সাধনা অধ্যায়ে অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত উপায় দর্শন এবং বিভূতি অধ্যায়ে সাধনায় অগ্রগতির নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন অনুভূতির উল্লেখ করা হয়েছে।

বেদ

বেদ হিন্দুর অকাট্য সত্যরূপে গণ্য; বিনা প্রতিবাদে, বিনা দ্বিধায় বেদবাক্য গ্রহণ করা হিন্দুত্বের পরিচায়ক। বেদবিরোধী হওয়ায় ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। বেদ দৃষ্ট, উপলব্ধ সত্য, কারও মস্তিষ্কপ্রসূত নয়—অপৌরুষেয়। গসপেলও "ঈশ্বরপুত্র" ভগবান যিশুর বাণী, প্রতি খ্রীস্টান এই বাণী বিনাপ্রশ্নে সত্যরূপে গ্রহণ করেন। সর্বশাস্ত্রসম্মত এবং সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বসমূহের অবতারণা করা হয়েছে বলেই অধ্যায়ের নাম "বেদ" করা হয়েছে।

প্রথমেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রকৃত প্রস্তাবে কি বর্ণিত হয়েছে; সৎ-চিৎ-আনন্দ—এই তিন তত্ত্বের ঘনীভূত মূর্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। প্রথম সূত্রে

"সৎ" এর বর্ণনা করে "চিৎ" ও "আনন্দ" কি তার বর্ণনা প্রদত্ত। বলা হয়েছে নিত্যপূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই একমাত্র "সৎ" বস্তু। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে ঐ সৎ বস্তুতে সর্বজ্ঞ প্রেমবীজ "চিৎ" এবং সর্বশক্তি-বীজ "আনন্দ" নিহিত। (১)

মানুষ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিশ্বাস পোষণ করে যে দৃশ্যমান সমুদায় বস্তু তথা সকলপ্রকার অনুভবের পশ্চাতে এক সনাতন সত্তা বিদ্যমান, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে মায়াবদ্ধ হয়ে সেই নিত্য জগদাধার সত্তার অনুভব হয় না। জীব এই মোহান্ধকার থেকে স্বীয় আত্মাকে উত্থিত করতে পারলেই জগদাধার পরমপিতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব সম্ভব হয়। এই নিত্য অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় সত্তা ভগবান যিশু কথিত পরমপিতা—গড্-দি-ফাদার বাইবেলে উক্ত হয়েছে ;

"বিশ্বাসই প্রত্যাশিত বস্তুর সার, অদৃষ্ট বস্তুর সাক্ষী।"

(বাইবেল—হীব্রু/১১,১)

"যিশু বললেন তোমরা যখন মানবপুত্রকে উত্থিত করতে পারবে তখনই জানবে "আমিই" তিনি। (বাইবেল/যোহন—৮—২৮)

"মানবপুত্র" বলতে যে স্বীয় আত্মা বা জীবাত্মা নির্দেশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হয়েছে।

উক্ত দুই বীজ সর্বজ্ঞ প্রেমবীজ "চিৎ" এবং সর্বশক্তিবীজ "আনন্দ"-বিপরীতধর্মী ; প্রেমবীজ চিৎ আকর্ষণধর্মী সত্যের প্রকাশক, শক্তিবীজ আনন্দ বিক্ষেপণী শক্তি বিশিষ্ট বিশ্বসৃষ্টির কারণ। মহাভারত কাহিনীর মহারাজা শান্তনু ও তৎপত্নীদ্বয় গঙ্গা ও সত্যবতীর ব্যাখ্যা এস্থলে উল্লেখনীয়। সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ সৃষ্টির আদি তত্ত্ব। মানব পরমেশ্বরের প্রতীকরূপে সৃষ্ট ; সুতরাং পরমেশ্বরের উক্ত তত্ত্বও মানবে বিকশিত : আনন্দবীজ ইচ্ছা বা বাসনারূপে এবং চৈতন্যবীজ ভোক্তারূপী চেতনাশক্তিরূপে অনুভব হয়।

---

(১) "নিত্যং পূর্ণমনাদ্যনন্তং ব্রহ্মপরমং তদেবৈকমেবাদ্বিতীয়ং সৎ।"

(কৈবল্য/১,১)

তত্র সর্বজ্ঞ প্রেমবীজশ্চিৎ সর্বশক্তিবীজমানন্দশ্চ ।"—(কৈবল্য/১,২)

বাইবেলে উক্ত হয়েছে ঃ

"এবং ঈশ্বর মানবকে আপন প্রতীকরূপে সৃজন করলেন, ঈশ্বরের প্রতিরূপভাবেই তাকে সৃষ্টি করলেন ; তিনি তাদের পুরুষ ও নারীরূপে সৃজন করলেন।"……(ইবিদ্-সৃষ্টিতত্ত্ব—১/২৭)

"আনন্দ" বিক্ষেপণী শক্তি, জড় প্রকৃতি-বীজ, এবং প্রেমবীজ চৈতন্য আকর্ষণী শক্তি। চৈতন্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বিক্ষেপধর্মী প্রকৃতির কম্পন হয় এবং কম্পনের ফলে ঝংকার এবং ঝংকার দ্বারা নাদ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয়। ধ্বনির সহচররূপে অন্য তিন ভাবেরও প্রকাশ হয় ; যথা ধ্বনির ব্যাপ্তিরূপ দেশ বা দিক, ক্রমরূপ সময়ান্তর কাল এবং এককরূপ অণু প্রকাশিত যয়। ধ্বনি, দিক, কাল ও অণু প্রকাশিত হয়ে অনন্তচৈতন্যের আকর্ষণকে আবৃত করে। ঐ ধ্বনি হিন্দু অধ্যাত্ম শাস্ত্রমতে ঈশ্বরবাচক প্রণব নাদ এবং সামগ্রিকভাবে ঐ আবরণকে মায়া বলা হয়, যার ক্ষুদ্রতম অংশকে ব্যষ্টিভাবে অবিদ্যা বলে। খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থে ঐ নাদকে "আমেন" বা স্বর্গীয় সঙ্গীত নামে অভিহিত করা হয়। প্রণব নাদের প্রকাশের দ্বারা যে মায়াবরণ সৃষ্ট হয় তদ্বারা অনন্ত অখণ্ড সত্তার খণ্ডভাবের উদয়ের সূত্রপাত হয়। প্রেমবীজ আকর্ষণী চৈতন্যরশ্মি এই আবরণে প্রতিহত হয় ; প্রকৃতি সেই রশ্মি গ্রহণ করে না ; প্রতিহত করে। প্রতিহত চৈতন্যরশ্মি তখন প্রতিবিম্বিত হয়। ঐ প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরশ্মি চৈতন্য-স্বরূপ, পৃথক বস্তু নয়। প্রতিবিম্বিত রশ্মি সাংখ্যদর্শনে আভাসচৈতন্য বা পুরুষ নামে অভিহিত এবং খ্রীস্টানধর্মে ঐ প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরশ্মি "ঈশ্বরের পুত্র" বলে বর্ণিত। অনন্ত সর্বজ্ঞ প্রেমবীজই হিন্দু অধ্যাত্ম শাস্ত্রোক্ত কূটস্থ চৈতন্য পুরুষোত্তম ও খ্রীস্টমতে পরমপিতা পরমেশ্বরের বেদী প্রাঙ্গণ বা পবিত্র আত্মা, হোলি ঘোস্ট। পরন্তু এই তিন তত্ত্ব পৃথক কিছু নয়, নিত্যপূর্ণ অনন্ত সত্তারই রূপমাত্র।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের বর্ণনা দ্বারা খ্রীস্টধর্মের ত্রিমূর্তি গড-দি-ফাদার, গড্-দি-সন অব গড্ এবং গড্-দি হোলিঘোস্ট বর্ণিত হল।

বাইবেলে উক্ত হয়েছে ঃ

"এইসকল বস্তু যাকে আমেন বলা হয় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টির আরম্ভের বিশ্বস্ত এবং সত্যদ্রষ্টা সাক্ষী"……… (রেভেলেশন—৩/১৫)

"আদিতে শব্দ ছিল, শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং শব্দ ঈশ্বরই ছিল।"
(যোহন—১/১)
তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁকে ব্যাতিরেকে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে কিছুই হয়নি।"...... (যোহন—১/২,৩

"এবং আমাদের মধ্যে রক্ত ও মাংসে পরিণত হয়।"(যোহন—১/২৪।

বাইবেলে উক্ত ইংরাজী "ওয়ার্ড" শব্দের অর্থ এস্থলে "শব্দ" করা হয়েছে ধ্বনি করলেই হিন্দুদর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। ইংরাজী "ওয়ার্ড" শব্দে আভিধানিক অর্থ ধ্বনিও হয়, শব্দও হয়। ভগবান যিশুর বাণী আদিতে হীব্রু ভাষায় লিখিত হয়েছিল; পরে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। ক্রম অনুবাদের ফলে, যিশুর বিভিন্ন উক্তি কিছু বিকৃত হওয়াও বিচিত্র নয়। "ওয়ার্ড" শব্দের অর্থ শব্দ তথা ধ্বনি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ধ্বনি অর্থেই এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাইবেলে যিশুর বাণীতে পরমপিতার সিংহাসনের চারটি পশু বলে বর্ণিত তথ্য বস্তুতঃ উল্লিখিত নাদ-দিক-কাল-অণু বিশিষ্ট মায়াকেই চিহ্নিত করা হয়েছে বাইবেল বলছেন—

"এবং সিংহাসনের মধ্যে এবং আশেপাশে চারটি পশু আছে-যাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ চক্ষুবিশিষ্ট।"...... (রেভেলেশন—৪/৪)

সামনে ও পিছনে চক্ষুবিশিষ্ট হওয়ার অর্থ হয় সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ উভয় দিকেই দেখা যায়। হিন্দুদর্শনে সৃষ্টি চতুর্দশ ভুবনে ব্যাখ্যাত হয়েছে,— সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। সপ্তস্বর্গের মহর্লোক প্রণবধ্বনির লোক, এই লোককে দশম দ্বার বলা হয়। দ্বার অর্থে উন্মুক্ত যাওয়া আসার দরজারূপ পথ। মহর্লোক জপ, তপ, সত্য নামক চৈতন্য জগৎ এবং ভূ, ভুব, স্ব লোকের মধ্যবর্তী—দ্বারস্বরূপ। নাদ দিক কাল অনু রূপ চার উত্থিত ধারণা দ্বারা মায়াবরণ সৃষ্টি হয়ে চৈতন্য ও সৃষ্ট জগৎ বিভক্ত বলে এই চারটি বাইবেলে পশু নামে বর্ণিত হয়েছে।

সর্বজ্ঞ প্রেমবীজ চিৎ শক্তি পরা প্রকৃতি—মায়া বা অবিদ্যা আবরণ দ্বারা চৈতন্যরশ্মিকে প্রতিহত করলেও চৈতন্যের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। এই আকর্ষণের প্রভাবে মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত জড়শক্তি প্রভাবিত হয়।

অব্যাক্বত প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ সাম্যাবস্থায় স্থিত ; পরন্তু চৈতন্যরশ্মির আকর্ষণ প্রভাবে ঐ সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় এবং তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। প্রথম প্রকাশিত তত্ত্বের নাম মহৎতত্ত্ব বা চিত্ত। মহৎতত্ত্বে চৈতন্য উপহিত হয়ে সত্ত্ব গুণান্বিত সত্ত্ববুদ্ধি এবং তদ্বিপরীত মন প্রকাশিত হয় এবং গুণান্বিত অবস্থার চরমে "অহঙ্কার" তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই অহঙ্কার ভাব মানবে দৃষ্ট হয় না, একে বলে ঐশ্বরিক অহঙ্কার। এই ভাবের উদয় হলেই অখণ্ড সত্তার পৃথকস্বভাবের উদয় হয়। একে হিন্দুশাস্ত্রে "জীব" বা জীবাত্মা বলা হয়, এবং বাইবেলে ভগবান যিশু একেই "মানবপুত্র" (সন-অব-ম্যান) নামে অভিহিত করেছেন। চৈতন্যশক্তির আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে ব্যক্ত বুদ্ধি ও মনের প্রকাশ চৌম্বিক-বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে অবস্থিত চৌম্বিক বস্তুর আকর্ষণী বিক্ষেপণী ধর্মপ্রযুক্ত দুই প্রান্তের আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনীয়। চুম্বকের দুই বিপরীতধর্মী প্রান্তবিন্দুর মধ্যবর্তী বিন্দুকে নিরপেক্ষ বিন্দু বলা হয়। কিন্তু স্বামীজী মহারাজ বলতেন ঐ বিন্দুই প্রকৃত ক্রিয়াশীল বিন্দু রজোগুণসমন্বিত। এই বিন্দুর শক্তি প্রমাণিত হয় যখন দুই প্রান্তবিন্দুকে সংযুক্ত করলে দুই প্রান্তই নির্গুণ হয়ে যায়। চৈতন্য প্রভাবে সত্ত্ব রজ তমোগুণ সমন্বিত প্রকৃতির রজোগুণ ক্রিয়াশীল হয়ে সত্ত্বগুণকে প্রকাশ ক'রে সত্ত্ববুদ্ধির উদ্ভব হয় এবং আনুষঙ্গিক ভাবে সত্ত্ব-বিপরীত তমোগুণের প্রকাশ হয়ে মন বা আনন্দস্বভাব প্রকাশ হয়। প্রকৃতি পুরুষ তথা প্রকৃতির ত্রিগুণ প্রকাশিত হয়ে গুণান্বিত হওয়ার অন্তর্নিহিত রহস্যের প্রকাশ বাইবেলে নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে।

"তাঁর মধ্যেই জীবনরশ্মি ছিল, সেই রশ্মিই মানবের অন্তর্জ্যোতি।"

(যোহন—১/৪)

"ঐ জ্যোতি অন্ধকারে দীপ্ত, পরন্তু অন্ধকার তাঁকে গ্রহণ করে না।"

(যোহন—১/৫)

"তিনি নিজস্বের কাছে এসেছিলেন কিন্তু নিজস্ব তাঁকে গ্রহণ করল না।"

(যোহন—১/১১)

প্রেমবীজ চৈতন্যশক্তির আকর্ষণ প্রভাবে অহঙ্কার তত্ত্ব পুনঃ বিকারপ্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টির মূল কারণস্বরূপ পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। উক্ত সত্ত্ব, রজ,

তম তিনগুণ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র গুণ নয় ; ঐ তিন গুণেরই সংযুক্ত গুণ। সত্ত্বগুণে অপর দুই গুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণের আধিক্য ; অপর দুই গুণেরও প্রকৃতি ঐরূপ। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের মধ্যবর্তী সত্ত্ব-রজ ও রজস্তম অবস্থিত ; সুতরাং গুণান্বিত এই তত্ত্বকে পাঁচ ভাগে অর্থাৎ সত্ত্ব, সত্ত্ব-রজ, রজ, রজস্তম এবং তমোগুণে বিভক্ত বলা হয়। এই গুণান্বিত অবস্থা থেকেই পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশ হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চ মহাতত্ত্বকে পুরুষের কারণ শরীর বলা হয়। উক্ত পাঁচ ভাগের প্রত্যেকের সত্ত্বগুণাংশ থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ রজোগুণাংশ হতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তমাংশ হতে পঞ্চ-তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম বিষয়ের উদ্ভব হয়। মন, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সপ্তদশ সূক্ষ্ম তত্ত্বকে সম্মিলিত ভাবে পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর বলা হয়। পঞ্চ তন্মাত্র চিৎশক্তির আকর্ষণ প্রভাবে পুনঃবিকৃতি প্রাপ্ত হয়ে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমরূপ স্থূল পঞ্চভূত প্রকাশি করে। এই স্থূল পঞ্চভূতকে সম্মিলিতভাবে, পুরুষের স্থূল শরীর বলা হয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত—এরাই সাংখ্যদর্শনে প্রকাশিত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই বাইবেলে চতুর্বিংশতি প্রধানরূপে বর্ণিত হয়েছে।

"ঐ সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে চব্বিশটি আসন আছে এবং
ঐ আসনে চব্বিশজন প্রধান উপবিষ্ট দেখলাম।"……

(রেভেলেশন—৪/৫

উল্লিখিতরূপে পুরুষের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের সৃজন হয়ে সর্বশক্তি বীজ জড়প্রকৃতি আনন্দের বিক্ষেপণী ক্রিয়ার অবসান হয় এবং চিৎশক্তি চৈতন্যের আকর্ষণী শক্তি প্রভাব বিস্তার করে। স্থূল পঞ্চমহাভূতসমূহ পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, স্থাবর, জঙ্গম, তৃণ-গুল্ম বৃক্ষাদি এবং স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রাণীসমূহ সৃষ্টি হয়ে পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ পরিশোভিত হয় এই সৃষ্টির আদি অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে এই সৃষ্টি বস্তুতঃ অবিদ্যাজনিত ভ্রমাত্মকভাব হতে উদ্ভূত এবং মূলতঃ বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। এই সৃষ্টির অনুভব পরমপিতা পরমেশ্বরের লীলা খেলা মাত্র।

চতুর্দশ ভুবন

উপরে বিবৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, পরমপিতা পরমেশ্বর হতে প্রকাশিত বিভিন্ন স্তরকে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে চতুর্দশ ভুবন নামে বিভক্ত বলে ব্যাখ্যা করেছে। সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতালে বিভক্ত এই চতুর্দশ ভুবন।

সপ্ত স্বর্গ

প্রথম স্বর্গ—সত্যলোক : সপ্তস্বর্গের প্রথমেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত পরমব্রহ্ম বস্তুই সত্যলোক। কোন নামেই এই স্তরকে চিহ্নিত করা যায় না, সেইজন্য এর অপর নাম—"অনাম"।

দ্বিতীয় স্বর্গ—তপোলোক : কূটস্থ চৈতন্য বা পুরুষোত্তম, খ্রীস্টধর্মমতে পরমপিতার যজ্ঞ বেদী পবিত্র আত্মা, দ্বিতীয় স্বর্গ তপোলোক। কূটস্থ চৈতন্যের প্রেমবীজরূপী চির আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে জগৎ সংসার বিধৃত; এই কারণে কূটস্থ চৈতন্যকে তপঃ বা অনন্ত ধৈর্যও বলা হয়। কোন মানবের পক্ষেই এইস্থানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য একে "অগম" বলা হয়।

তৃতীয় স্বর্গ—জনলোক : এই লোক চৈতন্যরশ্মি—আভাসচৈতন্য বা পুরুষের স্থান, খ্রীস্টধর্মের মতে "ঈশ্বরপুত্রের" আবাস। এই স্তরও চৈতন্যময় কারণ আভাসচৈতন্য কূটস্থ চৈতন্যেরই আভাস বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সাধারণ মানুষের অনুভবের অতীত অবস্থা হওয়ায় একে "অলক্ষ্য" বলা হয়েছে। একমাত্র যিশুখ্রীস্টের মত মুক্ত পুরুষরাই এই স্তরে বিরাজ করেন।

চতুর্থ স্বর্গ—মহর্লোক : প্রণবধ্বনি প্রকাশের দ্বারা যে মায়া ও অবিদ্যার আবির্ভাব হয় তাই মহর্লোকরূপ চতুর্থ স্তর। এই স্তরকে "দ্বার" বা হিন্দুদর্শনের ভাষায় "দশমদ্বার" বলা হয়। এই স্তরের পরেই সৃষ্টির জগতের আরম্ভ। বাইবেলে বর্ণিত সম্মুখে ও পশ্চাতে চক্ষুবিশিষ্ট চার পশুরূপী চার মৌলিক ভাবের উদয়ের দ্বারা মায়াবরণের সৃষ্টির স্তর এই চতুর্থ স্বর্গ। সপ্ত পাতালের ব্যাখ্যায় দেখা যাবে কেন এই স্তরকে দশম দ্বার বলা হয়েছে।

পঞ্চম স্বর্গ—স্বর্লোক : পঞ্চম স্বর্গে সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল কোন বস্তুর প্রকাশ নেই; এই কারণে এর নাম "মহাশূন্য,"—স্বর্লোক। একে বিজ্ঞানের ভাষায়

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক বা চৌম্বিক-বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বলা যেতে পারে। এই ক্ষেত্র থেকেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি সম্ভব হয়।

ষষ্ঠ স্বর্গ—ভুবর্লোক : ষষ্ঠ স্বর্গে সূক্ষ্ম বস্তুর আবির্ভাব হয়। সূক্ষ্ম ব দৃষ্ট হয় না এবং শূন্যবৎ বলে এর নাম "শূন্য"। এই স্তর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তি স্তর। একে ভুবর্লোক বলা হয়।

সপ্তম স্বর্গ—ভূলোক : পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ সপ্তম স্বর্গ—যার না ভূলোক।

সপ্ত পাতাল

পাতাল শব্দে সাধারণতঃ পৃথিবীর তলদেশকে বোঝায়। পাতালের ভি ভিন্ন বর্ণনাও পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন শাস্ত্র গ্রন্থে শরীরের নাভিদেশে নিচের ভাগকে পদতল পর্যন্ত সাতপ্রকার পাতাল নামে বিভক্ত করা হয়েছে আবার অন্যত্র ভূপৃষ্ঠের নিচে সাত পাতাল অবস্থিত বলা হয়; যথা সর্বনি স্তর মহাতল এবং তদূর্ধ্বে যথাক্রমে রসাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অত ও পাতাল—এই সপ্ত পাতাল। বস্তুতঃ ভূ বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এই বর্ণন অলীক বোধ হবে। কারণ মহাতলকে তা হলে ভূ গোলকের কেন্দ্রবিন্দু ধরতে হয়। ভূ গোলকের যে কোন স্থানের অপর পৃষ্ঠে তো পুনরায় ভূপৃষ্ঠ মহর্লোককে দশম দ্বার বলায়ও এই বর্ণনার ত্রুটি লক্ষিত হয়।

স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরজীর মতে সপ্ত পাতাল শরীরাভ্যন্তরস্থি সুষুম্না নাড়ীতে প্রকাশিত চৈতন্যের সাতটি স্থান—ষটচক্র ও সহস্রদলচক্র মনুষ্য শরীর ভূলোক অন্তর্গত হওয়ায় মহর্লোক দশম স্থানে পড়ে; ভূলোকে সাত, ভুব আট, স্বর্লোক নয় এবং মহর্লোক দশ। কথায় বলে যমের দশ দুয়ার; মহর্লোক পর্যন্তই জন্ম-মরণশীল অবস্থা-যমের রাজ্য। তার উপরে চৈতন্যলোক—যমের প্রভাবের ঊর্ধ্বে। বাইবেল গ্রন্থে উদ্ধৃত ভগবান যিশু বাণীতে এই বর্ণনার একপ্রকার সমর্থন পাওয়া যায়।

"আমি ঘুরে সাতটি পিলসুজ দেখলাম।"

"এবং সাত পিলসুজের মধ্যে একজন যেন মানবপুত্র।"

'এবং তাঁর দক্ষিণ হস্তে সাতটি নক্ষত্র ছিল।"

'......ঐ সাত নক্ষত্র সাতটি গীর্জার দেবদূত ছিল;"

এবং সাত পিলসুজ যা দেখেছ সাত গীর্জা।"—

(রেভেলেশন—১/১২, ১৫, ১৬/২০)

হিন্দু যোগশাস্ত্রে বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যায় যে উন্নত যোগী সাধক ষট্‌-চক্রস্থিত বিভিন্ন পদ্মে চৈতন্যের প্রকাশস্বরূপ বিভিন্ন জ্যোতিদর্শন করতে সক্ষম হন। বাইবেলে উল্লিখিত উক্তি এই তথ্যেরই সমর্থক।

পঞ্চ কোষ

বেদান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত "পঞ্চকোষ" বলতে গেলে হিন্দু অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ক অনুপম বিবর্তনবাদ। সর্বশক্তিবীজ জড় প্রকৃতি সর্বজ্ঞ প্রেমবীজ দ্বারা াকৃষ্ট হয়ে পুরুষের স্থূল শরীর পর্যন্ত যে পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি হয়েছে পুরুষ" বা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সে সব স্তরে কোষে আবৃত অবস্থায় বর্তমান। ক একটি কোষের আবরণ উন্মুক্ত হলে এক এক স্তরের বা জাতির আবির্ভাব য়। কোষ পাঁচটি—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কাষ। সর্বশক্তিবীজ আনন্দের ক্রিয়া সমাপ্ত হলে প্রেমবীজ চৈতন্যের আকর্ষণে ল মহাভূতসকল একত্রিত হয়ে পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়। প্রেমবীজ চতন্যের আকর্ষণ থাকায় এক্ষণে উক্ত আবরণসমূহ ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়।

অন্নময় কোষ : পরিদৃশ্যমান অচেতন বস্তু অন্নময়; এক বস্তু থেকে অন্য স্তুতে পরিণত হয়—একে অন্যের অন্নস্বরূপ। এটাই বহিরাবরণ; এই আবরণ ন্মোচিত হলে প্রাণের প্রকাশ হয়।

প্রাণময় কোষ : অন্নময় কোষের অপসারণে প্রাণময়ের প্রকাশ হয়। াণ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্যোতক এবং প্রাণময়ের প্রকাশে কর্মেন্দ্রিয়যুক্ত উদ্ভিদ-গতের উদ্ভব হয়।

মনোময় কোষ : প্রাণময় কোষ অপসৃত হয়ে মনোময় কোষের প্রকাশ । এবং ফলস্বরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের উদ্ভব হয়। এই কারণে কর্মেন্দ্রিয় ও ানেন্দ্রিয় এবং মনযুক্ত প্রাণীজগৎ সৃষ্ট হয়।

বিজ্ঞানময় কোষ : বুদ্ধি বিজ্ঞানময়; মনোময় কোষ উন্মোচিত হয়ে বুদ্ধি-

যুক্ত বিজ্ঞানময় কোষ উন্মুক্ত হয় এবং কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের সহি বুদ্ধিযুক্ত প্রাণী তথা মানবের সৃষ্টি সম্ভব হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিক বৃত্তি; এ বুদ্ধির বলেই মানব প্রকৃতি জয় করার চেষ্টায় প্রযত্নশীল।

আনন্দময় কোষ : মানবের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বর তথা পরমাত্মা বিশ্বাস দ্বারা সযত্ন প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানময় কোষের অপসারণ সম্ভব হয় বিজ্ঞানময় কোষ অপসৃত হলে মানব প্রেমবীজ চৈতন্য দ্বারা আকৃষ্ট হয় এ প্রণবনাদ প্রকাশিত হয় দিক, কাল ও অনুরূপ মায়াবরণযুক্ত চিত্তস্তরে উন্নী হয়। এই স্তরে উপনীত মানব নিজেকে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

মুক্ত সন্ন্যাসী বা খ্রীস্টত্ব : প্রণবনাদে নিমজ্জিত হয়ে সাধনমগ্ন হ চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হয়ে যায় ও মানব আনন্দময় কোষ থেকে উত্থিত হয়ে চৈত রাজ্যে প্রবেশ করে। চৈতন্যরাজ্যের প্রথম স্তর পুরুষ বা আভাসচৈতন্যের স্ত —ঈশ্বরপুত্রের স্তর। এই স্তরে উপনীত ভাগ্যবান সাধক মায়ার বন্ধনের উ মুক্ত সন্ন্যাসী বা খ্রীস্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

অধ্যায়ের আরম্ভ থেকে এ যাবৎ দর্শিত তথ্যসমূহ : বিশ্বের স্থূ সূক্ষ্ম, কারণ ইত্যাদি ক্রম আবর্তনের জ্ঞান লাভ দ্বারা অনুমান হয় যে বি প্রপঞ্চ যে রূপে বা যে আকারে প্রতিভাত স্বরূপতঃ তা নয়। আন্দাজ হয় মানবের সকল অনুভূতি বস্তুতঃপক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে উৎস মন বুদ্ধি দ্বারা বাহিত প্রবাহমাত্র। এই প্রকার জানাকে পরোক্ষ জ্ঞা বলে। পরোক্ষভাবে উক্ত সব তত্ত্ব বোধগম্য হলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষে ঐ সবের সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।

প্রতি মানুষেরই অন্তরে ভগবদ্‌প্রেম বিরাজিত; কিন্তু বিষয় ইন্দ্রি সম্বন্ধযুক্ত মানববুদ্ধি পরিচ্ছন্ন না হওয়ায় এই প্রেম অনুভবে অসমর্থ। ত সম্পূর্ণ সমহার নয়। এই আকাঙ্ক্ষা তীব্রতম হলে, নিষ্ঠা দৃঢ় হলে পথে প্রকৃত জ্ঞাতা ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ হয়; এইরূপ ব্যক্তিই ত্রাণকর্তা সদ্‌গুরুরূ জীবনে আবির্ভূত হন। এইরূপ তত্ত্বদর্শী দিব্যপুরুষের সান্নিধ্য এবং কৃপ লাভ করে প্রকৃত পথের উপদেশ প্রাপ্ত হন। শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে ঐ উপদেশ পালনের দ্বারা, প্রাপ্ত সাধনপ্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধক ইন্দ্রিয় সমূহকে অন্তর্মুখ করতে সমর্থ হন; প্রত্যাহার অবস্থা লাভ করে ইন্দ্রিয়গ

বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে—সুষুম্নাদ্বার ত্রিকুটীতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এ সময় সাধক অন্তরে এক অপূর্ব নাদ শ্রবণ করেন এবং দিব্যজ্যোতি দর্শনে ধন্য হন। ঐ ধ্বনিই হিন্দু অধ্যাত্ম শাস্ত্র বর্ণিত ওঁকারনাদ, বাইবেলে যে ধ্বনিকে "স্বর্গীয় সঙ্গীত" আমেন নামে উক্ত করা হয়েছে। এবং দৃষ্ট জ্যোতি বৈষ্ণবের পরম আরাধ্য শ্রীরাধা, বাইবেলে যে জ্যোতি "ঈশ্বর প্রেরিত" সত্যসাক্ষী যোহন বলে বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের নিম্নোক্ত উপদেশ অর্থবহ ঃ

> "যিনি আমেন, বিশ্বস্ত এবং সত্যসাক্ষী, যিনি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টির আদি, তিনি বলেন······"—(রেভেলেশন—৩/১৪)
>
> "দেখ আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি এবং আঘাত করছি ; যদি কেউ আমার ডাক শোনে এবং দ্বার খোলে আমি তার কাছে যাব, তার সঙ্গে আহার করব এবং সেও আমার সঙ্গে আহার করবে।" ······(রেভেলেশন—৩/২০)
>
> "একজন ঈশ্বর হতে প্রেরিত পুরুষ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল যোহন।"
>
> "তিনি সেই জ্যোতি ছিলেন না, পরন্তু সেই জ্যোতির সাক্ষীস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন।"
>
> "আমি "প্রান্তরে" ক্রন্দনরত একজনের ধ্বনি ; প্রভুর পথে সোজা চল।"—(যোহন—১/৬, ৮, ১৩)

প্রণবনাদ বা ওঁকারধ্বনি প্রকাশিত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রুত হয় : এই কারণে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মসম্প্রদায় এই ধ্বনিকে হিন্দুর প্রকৃত আধ্যাত্মিক পবিত্র নদী গঙ্গা ও যমুনা মনে করেন। খ্রীস্টীয় ধর্মাবলম্বীর পবিত্র জোর্ডান নদীও প্রকৃত "স্বর্গীয় সঙ্গীত" আমেন তথা প্রণবনাদ। নদীরূপী নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রুত প্রণবনাদে নিমজ্জিত, নিমগ্ন হওয়াকেই প্রকৃত ভক্তিযোগ বলা হয়। এই ধ্বনিস্রোতে অভিষিক্ত সাধকই প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিজ বলে গণ্য হন ; ঐ ধ্বনি প্রকাশের দ্বারাই সাধক চৈতন্যরাজ্যে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। এই অবস্থা প্রাপ্তিকেই "জীবাত্মার" উত্থান নামে বাহ্য বিষয় হতে প্রত্যাবর্তনরূপ যোগাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বলা যায়। ইংরাজী রিলিজিয়ন

(Religion) শব্দ এই তথ্যেরই দ্যোতক ; মূল লাটিন শব্দের অর্থ হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে যাওয়া। হিন্দুধর্মেও এই ভাবকে "উজানে" অর্থাৎ স্রোতের বিপরীতে বহা বলে ; যে ধারা নিম্নগতি হয়ে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তারই "উজানে" চললে অর্থাৎ বিপরীত গতিতে—"রাধাই" একমাত্র পথ বা উপায়। এইপ্রকার সাধন প্রযত্ন দ্বারাই পরমাত্মার পরাপ্রকৃতি তথা পরমেশ্বরের লীলা উপলব্ধ হয়, যা একমাত্র অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞানের অন্তর্গত। বাইবেলে এই তথ্যের সমর্থক নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি পাওয়া যায় :

> "সত্য ! আমি সত্য বলছি পুনরায় জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না।"·········(যোহন ৩/৩)
>
> "যাঁর উপর বিশুদ্ধ আত্মাকে অবস্থান করতে দেখবে তিনিই সেই পুরুষ যিনি পবিত্র পুরুষোত্তম দ্বারা দীক্ষিত।"—(যোহন—১/৩০)

উপরে বিবৃত দ্বিজত্বপদ লাভের পর কৈবল্যপদ লাভের পথ সুগম হয় সেই পথও প্রণবধ্বনিতে নিরন্তর নিমজ্জিত থাকা। এইভাবে প্রণবধ্বনিতে নিমগ্ন থাকলে হৃদয় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হয় ; তখন চৈতন্যরশ্মি প্রতিহত বা প্রতিবিম্বিত না হয়ে গৃহীত বা প্রকাশিত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্তিই প্রকৃত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া, বাইবেলে উক্ত ত্রাণকর্তা খ্রীস্টপদ প্রাপ্ত হওয়া উক্ত চৈতন্যরশ্মিতে অভিষিক্ত হয়ে জীবাত্মা, বা বাইবেলের ভাষায় "মানব-পুত্র", চৈতন্য রাজ্যে পুরুষ বা চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয় এবং চিরতরে সকল প্রকার মায়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয়।

> "যে সকল ব্যক্তি তাঁকে গ্রহণ করে তাঁদের এবং যাঁরা তাঁর নামে বিশ্বাস রাখে তাঁদের সকলকে তিনি ঈশ্বরপুত্র হওয়ার ক্ষমতা দান করেন !"······(বাইবেল—যোহন—১/১২)
>
> "সত্য ! আমি সত্য তোমায় বলছি কেউ যদি জল এবং পবিত্র আত্মা হতে পুনর্জন্ম লাভ না করে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।···(যোহন-৩/৫)

মানুষ এই প্রকারে চৈতন্য জগতে প্রবেশ করে বিশুদ্ধ-আত্মা পুরুষোত্তমকে পরিপূর্ণ ও অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং স্বীয় আত্মাকে অখণ্ড প্রণবধ্বনির অংশমাত্র বোধ হয়। অতঃপর সেই বিশুদ্ধ-আত্মায়, ঈশ্বরের

াদাপীঠে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং একমাত্র নিত্য অনাদি অনন্ত ং বস্তুতে মিলিত হয়ে যায়। এই হল কৈবল্যপ্রাপ্তি।

> "যে অতিক্রম করতে সমর্থ হয় তাকে আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমনভাবে আমিও অতিক্রম করেছি এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছি।"
>
> (রেভেলেশন—৩/২১)

অভীষ্ট

বেদ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে মৌলিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা এবং প্রতিপাদিত াদ্ধান্ত পর্যালোচনা করলে প্রত্যেক মননশীল ব্যক্তিরই অনুভব হয় অবিদ্যা-নিত অজ্ঞানতার জন্যই প্রকৃত সত্য উপলব্ধ হয় না, এবং প্রকৃত সত্যবস্তুর ঙ্গে সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ জ্ঞান না হলে জীবনের দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। মভীষ্ট" অধ্যায়ে সেইজন্য প্রথমেই মুক্তি কাকে বলে সে প্রশ্নের অবতারণা। াই সূত্রে বলা হয়েছে "স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।" পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে । পরমাত্মার সহিত আত্মার একীভূত হওয়াই স্বরূপস্থ হওয়া; স্বরূপ অবস্থা াপ্ত হলেই হৃদয়ের সকল বাসনা তৃপ্ত হয়ে কামনার অবসান হয় এবং সকল-াকার দুঃখ বা ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কামনা পূরণ না হয় তক্ষণ জন্মমৃত্যু রূপ আবর্তনের অবসান হয় না।

সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বোধ হওয়ার নাম অবিদ্যা। এই াবিদ্যাই সকল ক্লেশের মূল। আপাতসুখও ক্লেশের মধ্যে গণ্য। অবিদ্যার ই প্রকার শক্তি বা বিশিষ্টতা আছে; একটি আবরণী শক্তি, অপরটি াক্ষেপণী শক্তি। এই আবরণী ও বিক্ষেপণী শক্তিযুক্ত অবিদ্যাই অস্মিতা, াগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ নামক অপর চার ক্লেশের আধার বা আশ্রয়। াবিদ্যার আবরণী শক্তি হতে অস্মিতা ও অভিনিবেশ, এবং বিক্ষেপণী শক্তি তে রাগ ও দ্বেষরূপ ক্লেশের উত্থান হয়। পাতঞ্জল যোগসূত্রেও ক্লেশের র্ণনা সামান্য ভিন্নরূপে একই প্রকার দৃষ্ট হয়। কৈবল্যদর্শনে অস্মিতার সংজ্ঞা প্রভু ও শক্তির অভিন্ন জ্ঞান" বলা হয়েছে; এবং অভিনিবেশকে বলা হয়েছে

"প্রাকৃতিক সংস্কার"। পাতঞ্জলে অস্মিতার বর্ণনায় "দৃক্ ও দর্শন শক্তির একাত্মতা", এবং অভিনিবেশের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে "সংস্কার প্রবাহ যা থেকে পণ্ডিতগণও মুক্ত নন।" উভয় গ্রন্থের সংজ্ঞা সমার্থক হলেও কৈবল্যদর্শনে উক্ত সংজ্ঞা সহজবোধ্য এবং কম জটিল প্রতীত হয়। রাগ ও দ্বেষ বিষয়ে উভয় গ্রন্থে একই প্রকার সংজ্ঞা পাওয়া যায়। সুখকর বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণাকে "রাগ" এবং দুঃখদায়ক বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা বা অনীহা "দ্বেষ"।

সকলপ্রকার ক্লেশের মূল কারণ কর্ম; কর্মজাত দুর্দশাই দুঃখ। এই দুঃখের নিবৃত্তি না হলে "স্বরূপে অবস্থান" রূপ মুক্তির আশা অসম্ভব; নিবৃত্তি অর্থে পূর্ণ নিবৃত্তি পুনরাবৃত্তিরোধ। সকল কামনা পূর্ণ হলে দুঃখের মূল ক্লেশ নিবৃত্ত হয় এবং পরমার্থ সিদ্ধ হয়। কামনা উত্তীর্ণ সাধকই "সচ্চিদানন্দময়" অবস্থা লাভ করে। সদ্‌গুরু প্রদত্ত সাধনপ্রণালী অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা প্রাপ্তিকে আনন্দ বলে; প্রসন্নচিত্ত সাধকের সকল প্রকার দুঃখের অবসান হয় এবং "চিৎ" বা চৈতন্যের উদয় হয়। চৈতন্যের উদয়ে নিজের নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় এবং এই অবস্থাকে পুরুষের স্বরূপ বলা হয়।

সাধনা

পূর্ব অধ্যায় দুটিতে প্রতিপাদিত কৈবল্যপদ প্রাপ্তিরূপ মুক্তির উপায় বর্ণনা সাধনা অধ্যায়ের বক্তব্য। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদ এবং কৈবল্যদর্শনের সাধন অধ্যায় তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে অনেক সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। পরন্তু কৈবল্যদর্শনের বক্তব্য শ্রুতি উক্ত তত্ত্বের উপর অধিক নির্ভর মনে হয়। অধিকন্তু কৈবল্যদর্শন সাধক জীবনের বিভিন্ন স্তরে অনুভূতির উপর মানবের জাতি-ধর্ম বৈশিষ্ট্য তথা ব্যক্তিগত যুগের মৌলিক নির্ভরতা ব্যাখ্যাত হয়ে এই দর্শন এক অনুপম ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

প্রথম সূত্রে অধ্যাত্ম সাধনাকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা গীতার উপদেশের অনুকূল মনে হয়; তপস্যা, স্বাধ্যায়, এবং ব্রহ্ম-নিধান রূপ কর্মকে যজ্ঞ সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনে যজ্ঞের স্থলে

ক্রিয়াযোগ এবং ব্রহ্ম নিধানের স্থলে ঈশ্বর প্রনিধান উক্ত হয়েছে। কৈবল্য-দর্শনের যজ্ঞ সংজ্ঞা বস্তুতঃ গীতায় প্রতিপাদিত তত্ত্বের অনুরূপ। (১)

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখদুঃখ বোধ হয় সেইসবকে তিতিক্ষা বা ধৈর্যসহকারে সহ্য করাকে তপস্যা বলে। গীতায়ও একইপ্রকার উপদেশ লিপিবদ্ধ। (২) বিষয়সকল অনিত্য, তাদের স্পর্শজাত বোধও অনিত্য সুতরাং সে সকলকে সহ্য করাই শ্রেয়।

আত্মতত্ত্ব উপদেশ শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসনকে অধ্যবসায় বলে: অধ্যবসায় দ্বারা সদ্‌গুরু উপদেশ তথা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, শ্রবণ, অনুচিন্তন এবং শ্রুত বিষয়ের যথাযথ অর্থবোধের প্রযত্নকে স্বাধ্যায় বলে।

ব্রহ্মনিধানের সংজ্ঞা গূঢ়ার্থবোধক। উপনিষদের উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় স্বরূপ প্রণবধ্বনিতে নিমগ্ন হয়ে ঐ ধ্বনিতে আত্মসমর্পণকে "ব্রহ্মনিধান" বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৩) মুণ্ডক উপনিষদে প্রণবধ্বনিকে ধনুক, আত্মা বা নিজবোধরূপকে তীর এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলে উপমা দেওয়া হয়েছে। (৪) নিজেকে প্রণবে স্থির রাখলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়।

প্রণবনাদ প্রকাশের সম্ভাবনা হয় শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি অনুষ্ঠানের দ্বারা; সুতরাং শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি শব্দের অর্থবোধ প্রয়োজন।

প্রতি মানুষেরই দৈবী এবং আসুরী এই দুই প্রকার ভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ বা প্রেমকে দৈবী ভাব বলে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংসর্গজাত অন্তরের যে টান তাকে আসুরীভাব বলা যায়। মহৎ বা ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক প্রেম। ভগবান যিশু এই

(১) "তপঃ স্বাধ্যায় ব্রহ্মনিধানানি যজ্ঞঃ।"—(কৈবল্য—সাধনা/১)

(২) "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদা।
আগমাপায়িনো হনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ (গীতা—২/১৪)

(৩) "প্রণব শব্দএব পন্থাব্রহ্মণি, তস্মিন আত্মসমর্পণং ব্রহ্মনিধানম্
(কৈবল্য/সাধনা/৪)

(৪) "প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ॥" (মুণ্ডক—২/৩৬)

প্রেমকে "প্রথম প্রেম" বলেছেন। এই স্বাভাবিক আকর্ষণ বা প্রেমের বেগ বৃদ্ধির নাম শ্রদ্ধা। স্বাভাবিক প্রেমের উৎকর্ষ হলে জীব বিভ্রান্তকারী অসৎ সংসর্গ ত্যাগ করে সৎসঙ্গ ও সত্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়, এবং অবশেষে সদ্গুরুর দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়। বাইবেলের নিম্নোক্ত উক্তিতেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়।

"... তোমার সকল কাজ সকল পরিশ্রম আমি জানি।"
"এবং তোমার ধৈর্য, আমার নাম বহন করায় ক্লান্ত হওনি।"
"কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে কথা আছে, তুমি তোমার প্রথম প্রেম ত্যাগ করেছ।"...(রেভেলেশন—১/২,৩,৪)

উল্লিখিত শ্রদ্ধা উৎকর্ষতা লাভ করে সদ্গুরুর সাক্ষাৎ এবং তাঁর উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেই উপদেশ ও সাধনা নিষ্ঠা সহকারে পালন করলে নৈতিক সাহস বর্ধিত হয়। নৈতিক সাহস বৃদ্ধি "বীর্য" লাভ। সদগুরুলাভ তো ইচ্ছা হলেই হয় না, সৎসঙ্গের অনুসন্ধান করতে হয়। যে সঙ্গ বা যে ব্যক্তির সান্নিধ্যে মনের দুঃখ ক্ষোভ বিনষ্ট হয়, যাঁর উপদেশে সংশয় ছিন্ন হয় এবং শক্তি পাওয়া যায় সেই সঙ্গই "সৎ" বুঝতে হবে, তার বিপরীত সঙ্গ সর্বপ্রকারে বর্জন করতে হয়। সঙ্গ বলতে শারীরিক সান্নিধ্যই নয়, চিন্তা বুদ্ধি একসূত্রে গ্রথিত বুঝতে হবে। বস্তুতঃ পরমাত্মা, পরমপিতা পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য বস্তু; এবং পরমাত্মাই একমাত্র প্রকৃত সদ্গুরু, সেই পরমাত্মাই বহুরূপে প্রকাশিত বা প্রতিভাত হন; এই বিষয়ে বাইবেলে নিম্নরূপ উক্তি পাওয়া যায়ঃ

"যিশু বললেন, তোমাদের শাস্ত্রে কি লিখিত নেই যে আমি বলছি তোমরা ঈশ্বর— ।"......(যোহন—১/৩৪)
"আমি বলছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র।"
......(সাম—৮২/৬)

উপরে যে বীর্যলাভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যম ও নিয়ম পালনের দ্বারাই তা সম্ভব হয়। যম নিয়ম পদ্ধতি সদ্গুরু হতে প্রাপ্ত হতে হয়। অহিংসা, অসাধুতা বর্জন, পরদ্রব্যে নিস্পৃহা, ব্রহ্মচর্য বা স্বাভাবিক জীবনযাপন, এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ না করা রূপ সংযম অভ্যাসকে "যম" বলে

শৌচ বা শারীরিক এবং মানসিক পবিত্রতা রক্ষা, চিত্তের সন্তোষ বিধান এবং সদগুরু উপদিষ্ট সাধন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানকে "নিয়ম" বলা হয়।

স্বাভাবিক জীবনযাপনের কৈবল্যদর্শনে প্রদত্ত উপদেশ গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশের অনুরূপ। যোগপ্রার্থীর আহার বিহার, নিদ্রা ও অন্যান্য আচার ব্যবহারে সর্বথা আধিক্য বর্জন করতে হবে; অধিক আহার বা অনাহার, অধিক নিদ্রা বা অনিদ্রা—এই প্রকার জীবনের সকল ব্যবহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই স্বাভাবিক জীবনযাপন। যম নিয়ম পালনের দ্বারা বীর্যলাভই কেবল হয় না, আটপ্রকার ক্ষুদ্রতারূপ বন্ধন থেকেও উত্তীর্ণ হওয়া যায়। গ্রন্থে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, কুৎসা, জাত্যাভিমান, কৌলাভিমান এবং আত্ম-গরিমাকে আট প্রকার ক্ষুদ্রতারূপ বন্ধন বলে বিবৃত করা হয়েছে। এই অষ্টপাশ বা বন্ধন ছিন্ন হলে হৃদয়ের মহত্ত্ব বা বীরত্ব লাভ হয়; বীরত্ব লাভে সাধকের গার্হস্থাশ্রমোপযোগী আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার সাধনার যোগ্যতা হয়। বলা বাহুল্য, যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার যোগেরই অঙ্গ। কৈবল্য-দর্শনে শ্রদ্ধা বীর্য বীরত্ব ইত্যাদি আয়ত্তের উপর এই সকল যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের যোগ্যতা হয়—দেখান হয়েছে।

স্থির ও আরামে সাধন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে উপবেশন করার পদ্ধতি আসন প্রক্রিয়া। স্থিরভাবে আরামে বসাই "আসন" প্রক্রিয়ার মূলনীতি; কোন বিশেষ আসনের বিধান নির্দিষ্ট হয়নি। পাতঞ্জল তথা সাংখ্য প্রবচন সূত্রেও একই নীতি উচ্চারিত হয়েছে।

সূত্রে প্রাণবায়ু সংযম করাকে প্রাণায়াম বলা হয়েছে। অন্য তাৎপর্য বাদ দিয়েও এই গ্রন্থে প্রাণায়ামের এক তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—যা বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিযুক্ত। দেহে কচ্ছপ যেমন নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিজ দেহের ভিতরে টেনে নেয়, ইন্দ্রিয়সমূহও সেইপ্রকার প্রত্যাহার অবস্থায় অন্তর্মুখ হয়ে যায়। প্রত্যাহার দ্বারা অন্তর্জগতে প্রবেশের পথ সুগম হয়। এই অবস্থা লাভ হয় দীর্ঘ সময় আসনে উপবিষ্ট হয়ে সযত্নে প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা।

প্রত্যাহারের ফলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ ছিন্ন হয়ে সুখদুঃখরূপ প্রবাহ চিত্তে প্রতিফলিত হয় না এবং চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যায়। তখন চিত্তে

সমুদায় ভাবের উদয় হয়, চৈতন্যের ধারণা হয়। এই গ্রন্থে এরূপ অবস্থাকে "স্মৃতি" বলা হয়েছে, পাতঞ্জল দর্শনে এই অবস্থার নাম "ধারণা"। এই স্মৃতিতে অব্যাহত ভাবে নিবিষ্ট হলে পূর্ণ একাগ্রতারূপ সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন নিজত্ববোধও লুপ্ত হয়ে যায়, আরাধ্য বস্তুর আভাসমাত্র অবশিষ্ট থাকে। স্মৃতি ব: ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি প্রায় এক সঙ্গেই উদয় হয়; এইজন্য পাতঞ্জল যোগসূত্রে এই তিন অবস্থাকে একসঙ্গে "সংযম" আখ্যা দেওয়া হয়েছে "সংযম অবস্থায় অপূর্ব জ্যোতির প্রকাশ হয় এবং ব্রহ্মপ্রকাশক ওঁকার নাদ স্বতঃ উৎসারিত হয়। ওঁকারনাদে নিমগ্ন থাকাকে ভক্তিযোগ বলে. ভক্তিযোগপ্রাপ্ত যোগী "দিব্যত্ব" প্রাপ্ত হন। প্রণবনাদে অবিচ্ছিন্নভাবে নিমজ্জিত থাকতে থাকতে "জীবাত্মা" বা "মানবপুত্র" অবিদ্যা আবরণ ভেদ করে উর্ধ্বে চৈতন্যরাজ্যে উত্থিত হয়। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে দুই প্রকারের নাড় আছে—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। নাড়ী অর্থে প্রাণবায়ুবাহক তন্তু বা গতিপথ নিদ্রা বা বিশ্রামের দ্বারা যে সকল নাড়ীর ক্রিয়া বিশ্রান্ত হয় তাদের ঐচ্ছিক নাড়ী বলে—যথা দেখাশোনা ইত্যাদি কাজ যদ্দ্বারা সাধিত হয়। দেখা যায় বিশ্রাম বা নিদ্রার পরে ঐসব নাড়ী সবল ও সতেজ হয়, পূর্ণ কর্মক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্ত চলাচল আদি ক্রিয়া অনৈচ্ছিক নাড়ী দ্বারা সাধিত হয়; বিশ্রাম নিদ্রা কোন সময়েই ঐ নাড়ীসমূহের বিশ্রাম হয় না। পরন্তু প্রাণায়াম ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐ সকল অনৈচ্ছিক নাড়ীও বিশ্রামলাভ করে, এবং জীবদেহের নিরন্তর কর্মনিবন্ধন যে স্বাভাবিক ক্ষয় হয় তার নিবারণ হয়, এবং প্রাণায়াম অভ্যাসকারী ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হয়। মৃত্যু হলে সমুদায় ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক নাড়ীর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় পরন্তু প্রাণায়াম সাধন দ্বারা ঐ প্রকার সাময়িক বিশ্রাম লাভ হয়ে সকল নাড়ী সতেজ সবল ও পূর্ণ কর্মক্ষম হয়ে যায়। বাইবেলেও এই প্রকার "সাময়িক" মৃত্যুর উল্লেখ আছে।

"প্রভু যিশুকে তোমাদের বিষয়ে আমার যে গৌরব তার দোহাই দিয়ে বলছি, আমি প্রতিদিন মরি।"—(সন্ত পল)

"তুমি মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, আমি তোমাকে জীবন মুকুট দেব।"

"যে জয় করে তার দ্বিতীয় মৃত্যু ভোগ করতে হয় না।"

(রেভেলেশন—২/১০,১১)

প্রাণায়াম ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাণবায়ুবাহিকা নাড়ী বিশ্রামলাভ করে, এবং ফলস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে বিপরীতমুখী হয়ে নাড়ীর কেন্দ্রস্থল সুষুম্নালগ্ন ত্রিকুটীতে সংযত হয়। এই অবস্থাই প্রত্যাহার। এই অর্জিত অবস্থাকে দ্বিতীয়বার জন্ম বলা হয়েছে। কৃতী সাধক তখন "দ্বিজত্ব" লাভ করেন।

সাধনার পূর্বাবস্থা থেকে আরম্ভ করে চিত্তের শুদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত পাঁচ প্রকারের চিত্তের অবস্থা লক্ষিত হয়: মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা। চিত্তের এই প্রকার অবস্থা ব্যক্তির জাতিত্ব তথা ব্যক্তিগত যুগভাবের সূচক।

মূঢ়ত্ব অবস্থায় চিত্তের "বিপর্যয়" বৃত্তি হয়। বস্তুকে সত্যরূপে দর্শন করার অক্ষমতাকে বিপর্যয় বৃত্তি বলে। অর্থাৎ বস্তু যা সেরূপে তাকে দেখতে না পারার নাম বিপর্যয় বৃত্তি। চিত্তের বিপর্যয় বৃত্তি "শূদ্রত্বের" সূচক, এবং ব্রহ্মের চতুষ্কলের একমাত্র কল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়ের অনুভবমাত্র বর্তমান থাকায় ঐ ব্যক্তির "কলিযুগ"।

ব্রহ্মের প্রথম কলা পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় কলারম্ভের প্রারম্ভে সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভূতি প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে,—সন্ধিক্ষণে—চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিক্ষিপ্ত অবস্থা "প্রমাণ" বৃত্তিগুণসম্পন্ন। এই অবস্থায় জীব কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হতে পারে না, পরন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান-লাভের অবস্থাও হয়নি। সেই অবস্থায় জীব সমস্ত দৃষ্ট বিষয়ের প্রমাণ অনুসন্ধান করে। এই হল জীবের "ক্ষত্রিয়ত্ব"। এই অবস্থাগত ব্যক্তি সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন আদি কার্যে ব্রতী হয়। ভাগ্যগুণে সদ্‌গুরুলাভ হলে এবং সদ্‌গুরু প্রদর্শিত সাধন প্রকরণ শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হলে ক্রমশঃ "সংযম" অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মবাচক প্রণবনাদের প্রকাশ হয়ে ভক্তিযোগ তথা দিব্যভাব প্রাপ্ত হয়ে উন্নততর লোকে প্রবেশ করে।

লোক সাতপ্রকার—ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ এবং সত্য। চতুর্দশ ভুবনের (বর্ণনা পূর্বাধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে ; চতুর্দশ ভুবনের) সপ্ত স্বর্গ এবং এই সপ্ত লোক একার্থক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল ভূতমণ্ডলী ভূলোক ; ইন্দ্রিয়াদি বৈদ্যুতিক গুণসম্পন্ন সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য বস্তুমণ্ডল ভুবর্লোক বা শূন্য ; স্বর্লোক কি

স্থূল কি সূক্ষ্ম বস্তুর অবর্তমানে "মহাশূন্য" নামে অভিহিত,—একে চৌম্বিক শক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্র বলা হয়। মহর্লোক অবিদ্যা "অণু"-র মণ্ডল—প্রণবনাদের স্থান এবং নাদ সংশ্লিষ্ট দিক, কাল, অণুপ্রকাশক মায়াবরণ। ভূলোক থেকে স্বর্লোক পর্যন্ত মায়ার সৃষ্ট জগৎ। জনলোক কূটস্থ চৈতন্যরশ্মির প্রতিবিম্ব আভাসচৈতন্য বা পুরুষলোক—"ঈশ্বরপুত্রের স্থান; তপোলোক পবিত্র বিশ্বজনীন আত্মা পুরুষোত্তম, কূটস্থচৈতন্য, এবং সত্যলোক অদ্বিতীয়, অখণ্ড, নিত্য, অনাদি অনন্ত সত্যবস্তু।

উপরে বিবৃত ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়ে সাধক উত্তরোত্তর উন্নতলোকে উত্থিত হয়। প্রথমে ভুবর্লোক প্রাপ্ত হয়ে সূক্ষ্ম পদার্থযুক্ত অন্তর্জগতের অনুভূতি হয়ে ব্রহ্মের দ্বিতীয় কলা প্রকাশক "দ্বাপর যুগ" অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সাধক "দ্বিজত্ব" প্রাপ্ত হন। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত সাধকের বৈদ্যুতিক ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ হয়। সৌরজগতে সাধারণভাবে সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানলাভের অবস্থাকে জগতের দ্বাপরযুগ বলা হয়। ব্যক্তির এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তিচিত্তে "বিকল্প" বৃত্তি হয়; বিকল্প বৃত্তি অর্থে বস্তু নেই অথচ মনে একপ্রকার বস্তুজ্ঞান হয়।

ভক্তিযোগে অর্থাৎ প্রণবনাদ শ্রবণে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিবিষ্ট থাকলে চিত্তে বিকল্প বৃত্তি তিরোহিত হয়ে "একাগ্রতা" বৃত্তির উদয় হয় এবং ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ জগৎ কারণ প্রকৃতির জ্ঞানপ্রাপ্তির অবস্থায় "ত্রেতাযুগের" আবির্ভাব হয় সাধক এই অবস্থায় "বিপ্রত্ব" অবস্থা প্রাপ্ত হন। সামগ্রিকভাবে জগতে এ জ্ঞানের প্রকাশ হলে জগতের ত্রেতা যুগ বলা হয়। সাধকের এই অবস্থায় চিত্ত প্রায় শুদ্ধ হয়ে যায়।

প্রণবনাদে আরও ঘনিষ্ঠরূপে নিবিষ্ট হলে সাধক মহর্লোকে উন্নীত হয় তখন চিত্ত "নিরুদ্ধ" অবস্থা প্রাপ্ত এবং প্রকৃতি বিকৃতি রুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় —আত্মা যে ব্রহ্মবস্তু তার অনুভব হয়। এই হল ব্রহ্মের চতুর্থপাদ "তুরীয়" অবস্থার প্রকাশ, এবং সৎবস্তুর প্রকাশের কারণ, "সত্যযুগ"। এই অবস্থায় উন্নীত সাধককে "ব্রাহ্মণ" বলা হয়।

ভক্তিযোগে আবিষ্ট হয়ে যখন সাধক মহর্লোক থেকে উত্থিত হয় তখন মায়ার রাজ্যের ঊর্ধ্বে চৈতন্য রাজ্যে উন্নীত হয়। চৈতন্যরাজ্যের প্রথম স্তর

বা লোককে জনলোক বলে ; এই হল "পুরুষ" বা "ঈশ্বরপুত্রের" লোক—জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীর লোক। এই অবস্থায় চৈতন্যরশ্মি প্রতিহত না হয়ে গৃহীত হয় ; চৈতন্যে অভিষিক্ত হয়। একে বাইবেলোক্ত "আত্মা" বা চৈতন্যে জন্মগ্রহণ বলে। এই রাজ্য প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যিশু বলেছেন :

"সত্য, আমি তোমায় সত্য বলছি যদি কেউ জল এবং চৈতন্যে জন্ম-গ্রহণ না করে তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।"

(যোহন—৩/৫)

"যিশু তাঁকে বলেন আমিই পথ ও সত্য ও জীবন ; আমার মধ্য দিয়ে না এলে কেউ আমার পিতার নিকট আসতে পারে না।"

(যোহন—১৪/৩)

জনলোকে উত্থিত সাধক নিজেকে অনন্তচৈতন্য পরমপিতার সামান্য অংশমাত্ররূপে অনুভব করে ; পরমপিতার "বেদীতে," কূটস্থচৈতন্যে তথা তপোলোকে আত্মসমর্পণ করে পৃথক অস্তিত্বের ভাব, পৃথক সত্তা, পরিত্যক্ত হয়ে বিশ্বপিতা—অনন্তচৈতন্যে মিলিত হয়ে যায়। এই হল সত্যলোক—কৈবল্য মুক্তি। বাইবেলে যথোক্ত যিশুর বাণী :

"সেই মৃতেরা ধন্য যারা এখন থেকে প্রভুতে মরে।"

(রেভেলেশন—১৪/১৩)

"আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি, এবং জগতে এসেছি ; আমার জগৎ পরিত্যাগ করছি এবং পিতার নিকট চলে যাচ্ছি।" (যোহন—১৬/২৮)

বিভূতি

বিভূতি শব্দের অর্থ বিশেষ প্রকাশ। পূর্ব অধ্যায়ে সৃষ্ট জগতের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ, মানবজীবনের অভীষ্ট এবং অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় বর্ণনা করে গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সাধনায় সিদ্ধির পথে বিভিন্ন তত্ত্বের অনুভূতি তথা প্রকাশের মৌলিক নীতি বিবৃত করে গ্রন্থের উপসংহার করা হয়েছে। অধ্যায়ের

ক্রিয়া-

প্রথম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—মানবের এই তিন দেহে: শুদ্ধি সম্পাদন হলে সিদ্ধিলাভ হয়। বেদ অধ্যায়ে পুরুষের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে।

স্থূল পঞ্চভূত দ্বারা সংগঠিত পরিদৃশ্যমান জগৎ তথা মানবশরীরই স্থূ: দেহ ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর. এবং চিত্তের বিকৃতির ফলস্বরূপ অহংকারত পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশ পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর। এই তিন প্রকারের দেহের শুদ্ধি প্রয়োজন। অবিদ্যার প্রভাবেই এই সমুদায় সৃষ্ট হয়েছে। এই শুদ্ধির উপা: সদ্‌গুরুলাভ এবং তদ্‌প্রদর্শিত উপায় অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব হয়। মানবে অন্তর্নিহিত ঈশ্বরপ্রেম যার নাম শ্রদ্ধা—সেই "প্রথম প্রেমকে" অবলম্বন ক অগ্রসর হলে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ লাভ হয়। সদ্‌গুরু উপদেশ মতো যথায কার্যদ্বারা উক্ত তিন প্রকার শুদ্ধি সম্পাদন সম্ভব হয়।

স্থূল দেহশুদ্ধি ঃ গুরু উপদেশ মত প্রকৃতিজাত দ্রব্যসমূহের যথায ব্যবহার দ্বারা স্থূল দেহের শুদ্ধি হয়। দেহের চঞ্চলতা দূরকারী স্বাস্থ্যক খাদ্য এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের ঔষধ সেবন করে দেহের সুস্থতা এ শুদ্ধতা প্রতিপাদন করতে হয়। এইপ্রকার জীবন পরিচালিত কর অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হয় তখন সেই প্রকার বীর্যলাভ হয়। সদ্‌গু উপদেশ পালনে রত ব্যক্তির প্রবর্তক সাধক নাম।

সূক্ষ্ম দেহশুদ্ধি ঃ বীর্যের অধিকারী হয়ে সদ্‌গুরু প্রদত্ত "যম" "নিয়মের অভ্যাসে নিযুক্ত হওয়া দরকার। "যম" চঞ্চলকারী আহার, ব্যবহার, আচা অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার অভ্যাস। "নিয়ম" মনের ও শরীরের সুস্বা এবং সাম্যতা প্রদানকারী আচারের অনুষ্ঠান। বস্তুতঃ যম এবং নিয়ম কতগু "নিষেধ" এবং "বিধির" বিবরণ। "যম" "নিয়ম" অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের ম বা বীরত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং অভ্যাসকারী যোগক্রিয়া অনুষ্ঠান—যথা আস প্রাণায়াম, প্রত্যাহার অনুষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করে। যোগক্রিয়াপ্রা ব্যক্তিকে সাধকাবস্থাপ্রাপ্ত বলা হয়।

কারণ দেহশুদ্ধি ঃ শ্বাস-প্রশ্বাস সংযম রূপ কর্মকে "মন্ত্র" বলে ; স্থি হয়ে আরামে উপবিষ্ট হয়ে এই মন্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বিষ

থকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে বিপরীত মুখে ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থল সুষুম্না নাড়ীর মুখে ত্রিকুটিতে সংহত হয়। ইন্দ্রিয়ের এই বিপরীতমুখী গতি প্রাপ্তি প্রত্যাহার। কচ্ছপ যেমন নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করে নেয় প্রাণায়ামী সাধকও সেইরূপ নিজ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী করতে সমর্থ হন। প্রত্যাহার যথাযথ আয়ত্ত হলে চিত্তে ভাবের উদয় হয় এবং ঈশ্বরবাচক অনাহতধ্বনি প্রণব প্রকটিত হয়। তখন সাধকের সিদ্ধাবস্থা। এই প্রণবনাদে আত্মসংযম করলে ক্রমে সুষুম্নান্তর্গত ষট্‌চক্র এবং মস্তিষ্কে সহস্রদল পদ্ম প্রকাশিত হয়. এবং তৎ তৎ চক্রে বিভিন্ন বর্ণের জ্যোতির প্রকাশ হয়। এই অনুভূতি সপ্ত পাতাল দর্শন এবং সপ্ত ঋষির সাক্ষাৎকাররূপে বর্ণিত হয়েছে।

ঐ স্ফুরিত প্রণবধ্বনিতে জ্ঞান যুক্ত করে নিবিষ্ট হলে ক্রমশঃ অবিদ্যার কারণভূত নাদ, কাল, দেশ ও পাত্রের অনুভব হয়। উক্ত চার ভাবের দ্বারা অবিদ্যা সৃষ্ট হয় এবং অখণ্ড অনন্ত পরমেশ্বরের সত্তায় খণ্ডের ভাব উপহিত হয়। মানবের উৎপত্তি অবিদ্যাজনিত ঐ চার ভাবের উপর নির্ভরশীল ; অন্য ভাষায় ঐ চার ভাব মানবের জনয়িতা "মনু"। উক্ত চার ভাবে উৎপন্ন অবিদ্যা অবস্থা জ্ঞাত হলে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়, যাকে ভূত জয় করা বলা হয়। ভূত জয় হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ সিদ্ধ সাধকের অষ্ট ঐশ্বর্যের অধিকার হয়। এই অষ্ট ঐশ্বর্য, যাদের অষ্ট সিদ্ধি বলা হয় তারা নিম্নরূপ।

(১) **অণিমা :** শরীরকে বা যে কোন বস্তুকে ইচ্ছানুসারে অণু থেকে অণু, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্ররূপে পরিণত করার ক্ষমতা।

(২) **মহিমা :** শরীরকে বা যে কোন বস্তুকে ইচ্ছামত বৃহৎ করার শক্তি।

(৩) **লঘিমা :** শরীরকে বা যে কোন বস্তুকে ইচ্ছানুসারে লঘু বা হালকা করার সামর্থ্য।

(৪) **গরিমা :** শরীরকে বা যে কোন বস্তুকে যেমন ইচ্ছা গুরু বা ভারি করার ক্ষমতা।

(৫) **প্রাপ্তি :** যে কোন বস্তু ইচ্ছামত প্রাপ্ত হওয়ার সামর্থ্য।

(৬) **বশীত্ব :** যে কোন বস্তুকে বশে আনার শক্তি।

(৭) **প্রাকাম্য ঃ** ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কাম্যবস্তু সকল লাভ দ্বারা কামনা তৃপ্ত করার সামর্থ্য।

(৮) **ঈশিত্ব ঃ** প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব করার শক্তি।

উক্ত সকল শক্তিকে সিদ্ধ যোগী সাধকের ঐশ্বর্য বলা হয়। এই প্রকার ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত যোগী সাধকের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ সকল জ্ঞান লাভ হয় এবং সকল কামনার নিবৃত্তি হয়। সর্ব কামনা-বাসনার নিবৃত্তি হলে সাধক মায়ামুক্ত হয়ে মায়ায় সৃষ্ট বন্ধনের ঊর্ধ্বে উত্থিত হন এবং নিজেকে অখণ্ড পরমাত্মার ক্ষুদ্রতম অংশরূপে দর্শন করেন। ঐ দর্শনের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়াই কৈবল্য।

যুগ ও যুগধর্ম

কাল অনন্ত, অসীম; এই কালের পরিমাপক এককের—নির্ণয়ে হিন্দু সংস্কৃতির যুগের বর্ণনা এক অভিনব অবদান। সর্বকালে সূর্যই কাল নির্ণয়ের মূল ভিত্তি: সূর্যের উদয় অস্তরূপ ক্রম বিবর্তন মানবের কালের পরিমাপক জ্ঞানের উৎস। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এবং পুনঃ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় সৃষ্টির আরম্ভ থেকে দিন ও রাত্রির অনুভব মানুষে প্রকাশিত হয়েছে। পাশ্চাত্য গণনায় এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের দ্বারা একটি দিন ও একটি রাত্রি সংঘটিত হওয়ার সময়কে চব্বিশ ভাগে ভাগ করে প্রতিভাগকে এক ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টাকে ষাট ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগকে এক মিনিট এবং প্রতি মিনিটকে ষাট ভাগে ভাগ করে এক সেকেণ্ড নির্ণীত হয়। সেকেণ্ড অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতম কাল সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ বা দশমাংশ রূপে বর্ণিত হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতেও সূর্যই কাল নিরূপণের প্রধান উপায়। পরন্তু সকল প্রকার প্রকাশ অপ্রকাশরূপ আবর্তনকে অহোরাত্র বা দিবারাত্রিরূপে অভিহিত করে কালের নিরূপণকে এক সার্বভৌম সর্বাবস্থা-প্রযোজ্য রূপ প্রদান করা হয়েছে। প্রধানতঃ সূর্যই সকল প্রকার অহোরাত্র নির্ণয়ের প্রধান কারণ। অহোরাত্রের নীতি নির্ধারণে বলা হয়েছে—কি মানুষে কি দৈবিকে সূর্যই দিবারাত্রি তথা অহোরাত্র বিভাজন করেছে। অহঃ বা দিবা কর্মপ্রচেষ্টার কাল এবং রাত্র নিদ্রা বা বিশ্রামের কাল। এই মূল নীতির দ্বারা সকলপ্রকার কর্মচেষ্টা ও কর্মের বিরতি অহোরাত্র নামে বর্ণিত হয়েছে। (১) মানুষের যে অহোরাত্র তাকেও বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কালে পরিণত করা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে বর্ণিত আছে যে আঠার নিমেষ বা চক্ষু-পাল্টানোর কালে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশ কলায় এক

(১) "অহোরাত্র বিভাজতে সূর্যো মানুষ দৈবিকে
রাত্রি স্বপ্নায় ভূতানাম চেষ্টায়ৈ কর্মণামহঃ॥'

মূহূর্ত এবং ত্রিংশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র হয়। (১) এই গণনায় নিমেষকেই একক গণ্য করা হয়েছে।

মানুষের বা জাগতিক অহোরাত্র যেমন বলা হয়েছে, সেইপ্রকার পিতৃলোকের অহোরাত্র, দেবতাদের অহোরাত্র এবং ব্রহ্মারও অহোরাত্র বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মার অহোরাত্র বর্ণনায় চারযুগের ধারণার অবতারণা হয়েছে পুনরায় উক্ত চার যুগের সংযুক্ত তথা মোট কালকে একটি দৈব যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্যালোকের প্রকাশ ও অপ্রকাশ জাগতিক অহোরাত্র, কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের আবর্তন পিতৃলোকের অহোরাত্র এবং সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতি দ্বারা দেবতাদের অহোরাত্র। চারিযুগের মোট পরিসংখ্যান দ্বারা যে এক দৈব-যুগ হয় সেই প্রকার এক হাজার দৈবযুগে ব্রহ্মার একদিন এবং উক্তপ্রকার সময়ে ব্রহ্মার একরাত্রি। ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টি প্রকাশিত থাকে যে সময়কে এক কল্প বলা হয়, এবং ব্রহ্মার রাত্রিকালে সৃষ্টির প্রলয় হয়। দিনের পর যেমন রাত্রি এবং রাত্রির পর যেমন পুনঃ দিন হয় সেই প্রকার সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টি হয়। এইপ্রকার সকল প্রকার আবর্তন এক এক প্রকার অহোরাত্র নামে চিহ্নিত।

ব্রহ্মাণ্ডের সব বস্তুই গতিশীল, তাই তার অপর নাম জগৎ। গীতায় নাম দেওয়া হয়েছে "অব্যয় অশ্বত্থ"। অশ্বত্থমব্যয়ং—নদীর এক বিন্দু জলও স্থির থাকে না—নিরন্তর বহমান, কিন্তু নদীর প্রবাহ একরূপই থাকে। সেইরূপ এই জগৎ ও। যা কিছু পরিদৃশ্যমান সবই গতিশীল, ঘূর্ণায়মান। গ্রহ, নক্ষত্র উপগ্রহ সকলেই নিজ নিজ গতিযুক্ত। সংজ্ঞায় বলা হয় উপগ্রহ গ্রহের চতুর্দিকে এবং গ্রহ নক্ষত্ররূপী সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তনশীল। নক্ষত্রকে গতিহীন স্থির বলেই এতকাল সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গবেষণায় নক্ষত্রকেও স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে বলা হত সূর্য পৃথিবী পরিক্রমা করে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল—কারণ পৃথিবী ভগবানের সর্বোত্তম সৃষ্টি। প্রথম যে

(১) "নিমেষা দশাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশৎতাতুকলা।
ত্রিংশৎকলামুহূর্ত স্যাৎঅহোরাত্রতুতাবত ॥"

মহাপুরুষ দাবী করেন সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ ওঠে এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। বর্তমানকালে শিশুও জানে যে পৃথিবীই ঘুরছে—সূর্য নয়। মানুষ চিরদিনই সংস্কারপন্থী; নূতন পরিচয় নূতন ব্যাখ্যা সহজে গ্রহণ করতে চায় না।

যাই হোক, পৃথিবী গোলক দিবারাত্রিতে নিজ অক্ষরেখার চতুর্দিকে একবার ঘুরে দিন ও রাত্রি সংঘটিত করে। ঘূর্ণনের কারণ পৃথিবীর এক অর্ধ সূর্যের মুখোমুখী হয়ে সূর্যালোকপ্রাপ্ত হয় এবং সেই অর্ধে হয় দিন; পুনরায় এই ঘূর্ণনের কারণবশতঃ অপরার্ধ সূর্যের মুখোমুখি হয়ে সেই অর্ধ দিনের আলোক-প্রাপ্ত হয়। অক্ষের চতুর্দিকে পৃথিবীর এই ঘূর্ণন নিরবচ্ছিন্ন: একে আহ্নিক গতি বলা হয়।

পিতৃ অহোরাত্র: চন্দ্র সূর্যের উপগ্রহ। পৃথিবীর সঙ্গে চন্দ্রও বিঘূর্ণিত হয়। কিন্তু এছাড়া চন্দ্রেরও একটি পৃথক আবর্তনগতি আছে—যদ্বারা চন্দ্র পৃথিবী পরিক্রমায় রত। এই পরিক্রমা দুই পক্ষে একবার সমাপ্ত হয়। চন্দ্রের এছাড়া অন্য কোন গতি নেই; চন্দ্র বরাবর তার একই অর্ধ সূর্যের দিকে মুখ করে রাখে। সূর্যের দিকের অর্ধভাগ সূর্যালোক প্রাপ্ত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিন্তু অপরার্ধ চিরকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন। চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে উপস্থিত হয় তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্ধভাগই পৃথিবীর দিকে থাকায় কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং তখন অমাবস্যা হয়েছে বলা হয়। আবর্তন গতি নিবন্ধন যখন চন্দ্র ঐ মধ্যাবস্থা থেকে সরতে থাকে তখন একটু একটু করে উজ্জ্বলাংশ পৃথিবী থেকে দৃষ্ট হয়, এবং দৃষ্ট উজ্জ্বলাংশের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দৃষ্ট আংশিক উজ্জ্বলাংশকেই চন্দ্রের কলা বলা হয়। চন্দ্রের কলা দ্বারা তিথি নির্ধারিত হয়। আবর্তন গতিতে যখন চন্দ্র পৃথিবী থেকে সূর্যের ঠিক বিপরীত কেন্দ্রে উপস্থিত হয় চন্দ্রের উজ্জ্বলাংশ সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকে দৃষ্ট হয়ে পূর্ণিমা হয়েছে বলা হয়। মনে রাখতে হবে যে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের সমভূমি হতে প্রায় পাঁচ ডিগ্রী উর্ধ্বে থাকে। সেই কারণে সূর্য থেকে আলোক প্রাপ্তিতে পৃথিবী অন্তরায় হয় না। আবর্তন গতি নিবন্ধন অবশ্য মাঝে মাঝে চন্দ্র, পৃথিবী এবং সূর্য সমভূমিতে এসে যায়; তখন পূর্ণিমার দিন চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ায় পড়ে যায়, এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে বলা হয়। অপরপক্ষে অমাবস্যার দিন এইভাবে এই

তিন জ্যোতিষ্ক সমভূমি প্রাপ্ত হলে পৃথিবীর কোন কোন অংশে সাময়িকভা
সূর্যের কোন কোন অংশ অথবা সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ট হয় ; তখন সূর্যগ্রহণ বলা হয়
পৃথিবী বা চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোকরশ্মি নেই। সূর্যের আলোকে
আলোকিত। পূর্ণিমার দিন থেকে চন্দ্র পুনরায় ক্রমশঃ সূর্যের নিকটে আ
এবং তার উজ্জ্বলাংশের অল্প অল্প পৃথিবী থেকে দৃষ্ট হয় না। পুনরায় সূর্যে
নিকটস্থ কেন্দ্রে উপস্থিত হলে অমাবস্যার দিন উজ্জ্বলাংশের সম্পূর্ণ অর্ধভা
পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পক্ষকে
কৃষ্ণপক্ষ এবং অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পক্ষকে শুক্লপক্ষ বলা হয়। এ
দুই পক্ষ কালযুক্ত সময়কে হিন্দু পঞ্জিকা মতে এক মাস বলে। এ এ
চান্দ্রমাস। মনুস্মৃতি বলেছেন এই মাস বস্তুতঃ পিতৃলোকের অহোরাত্র
(১) কৃষ্ণপক্ষ অহ বা দিন এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষে পিতৃলোক জাগরি
থাকে এবং শুক্লপক্ষে বিশ্রামপ্রাপ্ত হয়। সেই কারণে হিন্দুর পিতৃপুরুষে
উপলক্ষে পিণ্ডদান আদি শুভকার্য কৃষ্ণপক্ষেই সম্পাদিত হয়। স্বামী
মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরজীর মতে পিতৃলোক অর্থে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যব
"ত্রিশঙ্কু" অবস্থাপ্রাপ্ত জীব পিতৃলোক নয়। পিতৃলোক শব্দের প্রকৃত অ
পিতামাতা হতে প্রাপ্ত রক্তমাংসাদি সপ্তধাতুনির্মিত মনুষ্যদেহ। একটি চান্দ্র
মাসকালে দেহের সমস্ত রক্তাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় নূতন ধাতুতে শরীর
সতেজ করে। উক্ত পিতৃলোকের অহোরাত্র অর্থে এই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানি
সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র কীটাণুদের মধ্যেও এই প্রকার অহোরা
ব্যবহার দেখা যায় ; যেমন মধুমক্ষিকা। পূর্ণ কৃষ্ণপক্ষ কাল মধুমক্ষিকা
মধু আহরণ করে মধুচক্রে সংগৃহীত করে এবং শুক্লপক্ষে মধুচক্রের মধ্যে থে
সংগৃহীত মধু পান করে। সেই জন্য মধুসংগ্রহকারীরা মুখ্যতঃ অমাবস্যা
দিন মধুর চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে নেয়।

দৈব অহোরাত্র : মনুস্মৃতিতে একটি সৌরবর্ষকে দেবতাদের এক অহোরা
বর্ণনা করা হয়েছে ; উত্তরায়ণের ছয় মাস কাল অহ বা দিন এবং দক্ষিণায়ণে
ছয় মাস কাল রাত্রি। দেখা যায় সূর্য শীতকালে আকাশে দক্ষিণে সরে যা

(১) "পিত্র্যোরাত্র্যহনীমাস বিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
কর্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণ শুক্ল স্বপ্নায় শর্বরী ॥"

এবং গ্রীষ্মের সময় পুনরায় উত্তরে হেলে যায়। বৎসরে সূর্যের এই দক্ষিণ থেকে উত্তরে এবং পুনরায় দক্ষিণদিকে গমনকে সূর্যের বার্ষিকগতি বলা হয়ে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণে দুটি প্রান্তসীমাও পরিলক্ষিত হয়: কাল্পনিক বৃত্ত দ্বারা এই সীমা চিহ্নিত। উত্তরপ্রান্ত বৃত্তকে কর্কটক্রান্তি এবং দক্ষিণপ্রান্ত বৃত্তকে মকরক্রান্তি বলে। পৃথিবী গোলকের ঠিক মধ্যস্থলে দুই ক্রান্তির সমান্তরাল আর এক বৃত্তরেখা কল্পিত; এই বৃত্তরেখাকে বিষুবরেখা বলে; মকরক্রান্তিরেখা হতে সূর্যের উত্তরাভিমুখে গমনকে উত্তরায়ণ, এবং কর্কটক্রান্তি থেকে দক্ষিণমুখে গমনকে দক্ষিণায়ণ বলে। সূর্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ উভয় গতিপথে বিষুবরেখা অতিক্রম করে। জ্যোতিষ গণনায় এইসকল বৃত্তরেখার গুরুত্ব অসীম। বস্তুতঃ সূর্য গমনাগমন করে না: পৃথিবীর আপন কক্ষপথে সূর্য পরিক্রমার সময় সূর্যের এই পরিবর্তন প্রতিভাত হয় মাত্র।

পৃথিবীর দুই প্রকার গতি—অক্ষরেখার চতুষ্পার্শে ঘূর্ণন গতি দ্বারা দিনরাত্রি সংঘটিত হয়, এবং কক্ষপথে সূর্য পরিক্রমা দ্বারা সৌরবর্ষ প্রতিপাদিত হয়। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র, পৃথিবীর উভয় গতিতেই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবী গোলক এমনভাবে পরিক্রমা করে যে পৃথিবীর অক্ষরেখা কক্ষপথের উপর প্রায় সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি (৬৬½°) হেলে থাকে এবং অক্ষরেখাটি বরাবর সমান্তরালভাবে থাকে। এই হেলে থাকার ফলে উপবৃত্তের একপ্রান্তে যখন পৃথিবা উপস্থিত হয় তখন গোলকের অর্ধভাগ সূর্যের নিকটস্থ হয়ে যায়; অপর প্রান্তে উপস্থিত হলে গোলকের অপরার্ধ সূর্যের নিকটে আসে এবং পূর্বার্ধ সূর্য হতে দূরে সরে যায়। সূর্যের নিকটস্থ অর্থে গ্রীষ্মকাল এবং দূরস্থ অর্থে শীতকাল—সূর্যের দূরত্বনিবন্ধন। এই প্রকারে পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার কারণে মনে হয় যেন সূর্যই উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে একবার করে বৎসরে গতিশীল হয়। কক্ষপথের অন্যান্য স্থানে পৃথিবী উপস্থিত হলে সূর্য হতে দূরত্বের উপর বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হয়। এখন উক্ত হয়েছে উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রি। (১)

---

(১) "দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রি স্যাৎ দক্ষিণায়ণম্ ॥"

স্বামীজী মহারাজ বলেছেন দেবতা বলতে উর্ধ্বলোকের অধিবাসী অং নয় ; শরীরের সূক্ষ্ম দিব্য ইন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সকল উপনিষদে দেব শব্দ দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল বর্ণিত হয়েছে। সেই অর্থেই দৈব অহোরাত্রে প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে হয়। উত্তরায়ণকালে সূর্যের দক্ষিণ থেকে উত্ত গোলার্ধে স্থিত আর্যাবর্তের দিকে আগমন শারীরিক সূক্ষ্ম উপকরণ—যথ ইন্দ্রিয়াদি অধিক সতেজ ও ক্রিয়াশীল হওয়ার সূচক গণ্য হত। এই কারণে এই সময়কে আর্যাবর্তের জীবের ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম বস্তুর সতেজতা প্রাপ্তি স্বরূপ দিনের আরম্ভকে ধর্মীয় পরবের দিন মানা হয়।

ব্রহ্মার অহোরাত্র : মনুস্মৃতি বলছেন এখন ব্রহ্মার অহোরাত্র কি জান হলে তবে সকলপ্রকার অহোরাত্রের জ্ঞানলাভ হয়ে যায়। এই অহোরাত্র বর্ণনায় এক এক করে সকল যুগের বর্ণনাও অনুধাবন প্রয়োজন। (১) চার সহস্র বৎসরে সত্যযুগ হয়, তার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমসংখ্যক শতবৎসর এব অপর তিনযুগও তাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহস্রে ও শতে এক এক করে কম হয়। (২)

সত্য. ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ : কলিযুগের কাল চার হাজার বৎসর এবং তার সন্ধ্যা চারশত বৎসর, সন্ধ্যাংশও চারশত বৎসর। ত্রেতাযুগ তিন হাজার বৎসর, ত্রেতার সন্ধ্যা তিনশত বৎসর, সন্ধ্যাংশ তিনশত বৎসর। দ্বাপরযুগ দু হাজার বৎসর দ্বাপরের সন্ধ্যা দুইশত বৎসর সন্ধ্যাংশ দুইশত বৎসর, এবং কলিযুগ এক হাজার বৎসর, কলি সন্ধ্যা একশত বৎসর এবং কলি সন্ধ্যাংশ একশত বৎসর। এই হিসাব বুঝতে সুবিধা হয় পরপৃষ্ঠার তালিকা থেকে :

(১) "ব্রহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণম্ সমাসত।
এৈকেকসো যুগানাং তু ক্রমশঃ তন্নিবোধতঃ॥"

(২) "চত্বার্যাহু সহস্রানি বর্ষাণাংতু কৃতং যুগম্।
তস্য তাবৎ শতি সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥"

"ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্তন্তে সহস্রানি শতানি চ॥"

ুগের নাম	যুগবৎসর	যুগসন্ধ্যাকাল	যুগসন্ধ্যাংশ	মোট যুগকাল
ত্যযুগ	৪০০০ বৎসর	৪০০ বৎসর	৪০০ বৎসর	৪৮০০ বৎসর
ত্রেতাযুগ	৩০০০ ,,	৩০০ ,,	৩০০ ,,	৩৬০০ ,,
াপরযুগ	২০০০ ,,	২০০ ,,	২০০ ,,	২৪০০ ,,
লিযুগ	১০০০ ,,	১০০ ,,	১০০ ,,	১২০০ ,,
				১২০০০ ,,

চতুর্যুগের মোট ভুক্তিকাল বার হাজার বৎসর।

দৈবযুগ : উপরে প্রাপ্ত চতুর্যুগের মোট কালের যোগফল বার হাজার ৎসরকে মনুস্মৃতি মতে, একটি দৈবযুগ বলা হয়। (১) একহাজার দৈবযুগে হ্মার একদিন এবং সমসংখ্যক একহাজার দৈবযুগকে ব্রহ্মার একরাত্রি বলা য়। (২) মনুস্মৃতিতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের সংজ্ঞা এবং দৈবযুগের জ্ঞা স্পষ্টভাবে এবং পৃথকভাবে দর্শিত হয়েছে।

জাগতিক অহোরাত্রে যে প্রকার আলোকের প্রকাশ এবং অপ্রকাশের বাহ চিরন্তন, পিতৃলোকের অহোরাত্রে সেই প্রকার কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষের, র দৈব অহোরাত্রে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের, ব্রহ্মার অহোরাত্রেও সেই কার সৃষ্টির প্রকাশ ও অপ্রকাশ তথা উদ্ভব ও প্রলয়রূপ প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন। ই ব্যাপারে মনুস্মৃতি মন্বন্তরের সংজ্ঞা প্রদান করে এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ পষ্টতররূপে বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে একাত্তর দৈবযুগে এক মন্বন্তর হয় বং সৃষ্টি এবং প্রলয়ে মন্বন্তরের সংখ্যা গণনাতীত, এবং পরমেশ্বর খেলনার ত এই সকল মন্বন্তর পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন। (৩) এই হিসাবে এক কল্পে

---

(১) "যদেতৎ পরিসংখ্যাতং আদাবেব চতুর্যুগম্।
এতদ্ দ্বাদশ সহস্রং দেবানাং যুগং উচ্যতে॥"

(২) "দৈবিকানাং যুগানাস্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মং একং অহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেবচ॥"

(৩) "যৎ প্রাক দ্বাদশসহস্রমুদিতম দৈবিকম যুগম।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে॥"
"মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গ সংহারমেবচ।
ক্রিড়ড়ন্নৈবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্টি পুনঃ পুনঃ॥"

ব্রহ্মার দিনে, অন্ততঃ চোদ্দ মন্বন্তর হওয়া দরকার। হিন্দু পঞ্জিকাদিতে চো মনুর নাম পাওয়া যায় এবং এক এক মনু এক এক মন্বন্তরের অধীশ্বঃ পঞ্জিকাতে আরও বলা হয় যে বিশ্ব এখন বর্তমান কল্পের সপ্তম মনু বৈবশ্ব মনুর অধিকারে মধ্য অবস্থায় অবস্থিত। ব্রহ্মার অহোরাত্ররূপ সৃষ্টি এবং প্রঃ যেমন—পুনরাবর্তনশীল মন্বন্তরেরও পুনরাবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মার অহোরাত্রের আবর্তন এবং তৎসহ সৃষ্টি প্রলয় সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। (১) গীতার সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখি আছে যিনি সহস্রযুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার দিন এবং সহস্রযুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার রা জানেন তিনিই অহোরাত্রজ্ঞানী। দিনের আগমনে অব্যক্ত থেকে সর্বব ব্যক্ত হয় এবং রাত্রি আগমনে ঐ অব্যক্তেই লয়প্রাপ্ত হয়। সমুদায় পরিদৃশ্যম বস্তু দিবাগমে সৃষ্ট হয় এবং রাত্রির আগমনে আপনা আপনি প্রলয় প্রাপ্ত হ পুনরায় দিনের আগমনে সৃষ্ট হয়। (২) গীতায় যে সহস্র যুগ বলা হয়ে মনুস্মৃতির বিবরণ অনুসারে ঐ যুগ দৈবযুগ।

সৃষ্টি এবং প্রলয় যখন নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ অন্যান্য বিবৃত অহোরাত্রের ম দৈবযুগেও অব্যাহত গতিতে সংঘটিত হয়ে চলেছে। এখন প্রশ্ন দৈবযু সংগঠনক্রম কি প্রকার; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এবং তারপর পরব দৈবযুগ সংগঠনে কোন যুগের আবির্ভাব হয়? সাধারণ্যে প্রচলিত ধার কলিযুগের অন্তে বিশ্বে এক বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার পর পুনরায় সত্য থেকে আরম্ভ হবে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্তন এইভাবে সংঘটিত হয় ন

(১) "সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যৎ ব্রহ্মণোবিদুঃ।
রাত্রিংযুগসহস্রান্তাং তে অহোরাত্র বিদো জনাঃ॥"
—(গীতা—৭/১৭

(২) "অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥"
"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমে অবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥"
(গীতা—৭/১৮, ১৯

বতরণ যেমন ক্রমশঃ হয় ,উত্তরণও ক্রমশঃ হতে বাধ্য। অমাবস্যার পরে মন ক্রমশঃ চন্দ্রের এক এক কলা বর্ধিত হয়ে পূর্ণিমার ষোলকলা পূর্ণ হয় ।· পূর্ণিমার পরে ক্রমশঃ এক এক কলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অমাবস্যায় ষোল লাই অদৃশ্য হয়, এক লাফে হয় না, প্রাকৃতিক যুগ পরিবর্তনও সেইরূপ মশঃ সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক।

হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে চন্দ্র ও পৃথিবীর মত সূর্যও আবর্তনগতিযুক্ত। থিবীর দৈনিক তথা বার্ষিক গতিতে চন্দ্র যেমন পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ তিতে বিঘূর্ণিত হয়, নিজ নিজ গতি ছাড়াও সূর্যের পরিক্রমা গতিতেও হ উপগ্রহাদি যুক্ত থাকে। সূর্য দূরের অপর একটি নক্ষত্রের সঙ্গে ভাবে পরস্পরকে পরিক্রমা করে, এবং এই গতির কারণ একবার সৃষ্টির ন্দ্রস্থল বিষ্ণুনাভীর যথাসম্ভব নিকটে আসে এবং আবর্তন গতিতে ক্রমশঃ থাসম্ভব দূরে চলে যায়, পুনরায় বিষ্ণুনাভীর নিকটস্থ হয়। এই প্রকারে ষ্ণুনাভীর নিকটস্থ ও দূরতম কেন্দ্রে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়। পৌরাণিক তিবৃত্ত অনুসারে বিষ্ণুনাভী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থল, এবং বিষ্ণুনাভী ষ্টির সমুদায় শক্তির কেন্দ্র। সৌরজগৎ ঐ বিষ্ণুনাভীর যতই সন্নিকটস্থ য় জগতে চতুষ্পাদ ধর্ম ক্রমশঃ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সৌরজগৎ বিষ্ণুনাভী তে যত দূরে সরে যায় চতুষ্পাদ ধর্মও ক্রমশঃ একে একে লুপ্ত হয়ে যায়— রতম কেন্দ্রে উপস্থিত হলে একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। স্বামীজী হারাজের মতে চৈতন্য, চৌম্বিক, বৈদ্যুতিক এবং স্থূল জড় পদার্থিক=চতুষ্পাদ র্ম। সত্যযুগে যখন সৌরজগৎ বিষ্ণুনাভীর নিকটে থাকে তখন চার প্রকার মই সম্পূর্ণ প্রকাশিত থাকে ; ক্রমে সৌরজগৎ যখন বিষ্ণুনাভীর দূরে সরতে াকে তখন উক্ত চতুষ্পাদ ধর্মের প্রথমে ত্রেতাযুগে চৈতন্যধর্ম এবং তারপর াপর যুগে চৌম্বিক ধর্মের অনুভবও লুপ্ত হয়। কলিযুগে বৈদ্যুতিক ধর্মও প্ত হয়ে যায়। তখন সৌরজগৎ বিষ্ণুনাভী, সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল, হতে দূরতম দেশে চলে যায়। ঐ দূরতম প্রদেশ থেকে পুনরায় যখন সূর্য গ্রহ, উপগ্রহ মভিব্যাহারে বিষ্ণুনাভী অভিমুখে উর্ধ্বগামী পথে অগ্রসর হয় পূর্বোক্ত প্ত ধর্ম ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে বৈদ্যুতিক ধর্ম প্রকাশিত য়ে উর্ধ্বগামী দ্বাপরযুগ সূচিত হয় ; অতঃপর বিষ্ণুনাভীর আরও নিকটস্থ

হয়ে চৌম্বিক ধর্মও পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং ত্রেতাযুগের আবির্ভাব সূচনা করে বিষ্ণুনাভীর আরও নিকটে যখন সূর্য উপস্থিত হয় জগতে চৈতন্য ধর্মের প্রকাশ হয়ে সত্যযুগের আবির্ভাব সূচিত করে। বিষ্ণুনাভীর নিকটে এ পুনঃ দূরে সরে যাওয়া—সূর্যের এই আবর্তন গতি অনুসারে জগতে চতুর্যুগে দুই প্রস্থ আবির্ভূত হয়; এক প্রস্থ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) যখ বিষ্ণুনাভীর নিকটস্থ কেন্দ্র থেকে দূরে সরতে থাকে—যাকে নিম্নগামী গা বলা যায়—এবং দ্বিতীয় প্রস্থ (কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য) যখন সূ বিষ্ণুনাভী হতে দূরতম কেন্দ্র হতে পুনঃ বিষ্ণুনাভী অভিমুখে অগ্রসর হয়- যাকে সূর্যের উর্ধ্বগামী গতি বলা যায়। সূর্যের এই এক পূর্ণ আবর্তন গা দ্বারা চতুর্যুগের দুই প্রস্থ আবির্ভূত হয়। মনুস্মৃতি মতে চতুর্যুগের সম বার হাজার বৎসর; সুতরাং সূর্যের এক পূর্ণ আবর্তনের কাল চব্বিশ হাজ বৎসর। নিম্নগামী—অর্ধ আবর্তনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি আবির্ভূ হয়; এবং উর্ধ্বগামী অর্ধ আবর্তনে কলি, দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য আবির্ভূ হয়। সূর্য সিদ্ধান্তে এই চব্বিশ হাজার বৎসরকে এক মহাযুগ বলা হয়েছে

যুগাবির্ভাবের সঙ্গে নভোমণ্ডলে আর এক অতি জাগতিক ঘটনা প্রাচী কাল থেকেই লক্ষিত হয়ে আসছে—যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ "বিষুব সংক্রা বিন্দুর অগ্রগমন" বলেন; ইংরাজীতে বলা হয় 'প্রিসিসন অব দি ইকুইনক্স লক্ষিত হয়েছে যে রাশিচক্রের যেই বিন্দুতে এই বৎসর সূর্য বিষুবরেখা সংক্রা করে পরের বৎসর ঠিক সেই বিন্দুতে বিষুব সংক্রমণ হয় না, কিছু আগে সংক্রমণ হয়। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গণনায় এই অগ্রগম বার্ষিক চুয়ান্ন সেকেণ্ড (৫৪″) পরিমাপের। একটি বৃত্তে মোট ৩৬০° ডি কৌণিক মাপ হয়; প্রতি ডিগ্রির ষাটভাগের একভাগকে এক মিনিট এ প্রতি মিনিটের ষাট ভাগের একভাগকে এক সেকেণ্ড বলা হয়। প্রতি বৎস ৫৪″ সেকেণ্ড অগ্রগমন হলে ৩৬০° অগ্রগমন হতে লাগে $\left(\frac{৩৬০ \times ৬০ \times ৬}{৫৪}\right.$ ২৪০০০ বৎসর; অর্থাৎ দুই দৈবযুগের সম পরিমাণ।

স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁর জ্যোতিষগণনা এবং অন্যা শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা দেখেছিলেন যে বিগত সত্যযুগের আরম্ভ হয় ১১, ৫০১ খ্রী

র্বাব্দে যখন মেষরাশির প্রথম বিন্দুতে জলবিষুব সংক্রমণ সংঘটিত হয়। সই হিসাবে বর্তমানে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে সেই সময় হতে ১৩, ৪৮২ বৎসর তিক্রান্ত হয়েছে; অর্থাৎ এক দৈব যুগোপযোগী অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলিযুগের কালোপযোগী ১২০০০ বৎসর গত হয়েও আরও ১৪৮২ বৎসর ার হয়েছে। এর অর্থ আর এক কলিযুগের সমান ১২০০ বৎসর অতীত য়েও ২৮২ বৎসর হয়ে গেছে। ৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে বার হাজারের এক দবযুগ কাল সম্পূর্ণ হয় যখন জলবিষুব সংক্রমণ হয় তুলারাশির শেষাংশে নরায় জলবিষুব সংক্রমণ মেষরাশির প্রথম বিন্দুতে অনুষ্ঠিত হবে ১২,৫০১ খ্রীস্টাব্দে—৪৯৯ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে আরও এক দৈবযুগ প্রমাণ ১২০০০ ৎসর গত হলে। স্বামী শ্রীযুক্তশ্বরজী বলেছেন ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে কৈবল্যদর্শন প্রণয়নের সময় এক দৈবযুগ অতীত হয়ে সূর্যের উর্ধ্বগামী অর্ধবৃত্তেরও ১৩১৮ ৎসর গত হয়; অর্থাৎ উর্ধ্বমুখী ১২০০ বৎসর কাল কলিযুগও সমাপ্ত হয়ে াপরের ১৯৪ বৎসরে পড়েছিল।

বিষুব সংক্রমণ কোন রাশিতে কোন বিন্দুতে সংঘটিত হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী নায়াসেই পরীক্ষা দ্বারা স্থির করতে পারেন, অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। লবিষুব সংক্রমণ বিন্দু ক্রমশঃই কন্যারাশি পার হয়ে বর্তমানে সিংহরাশির কে এগোচ্ছে। চতুষ্পাদ ধর্ম মানসিক ধর্ম; মানসিক সৎগুণের উন্নতিসাধন ারা বৈদ্যুতিক, চৌম্বিক এবং চৈতন্য প্রভাব অনুভবের শক্তি অর্জিত হয়—াধারণভাবে। দ্বাপর যুগে সূক্ষ্ম বিষয়—বৈদ্যুতিক আদি বিষয়ের অনুভব গতের মানবের আয়ত্তে এসে যায়; সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রতিফলন লক্ষিত হয়। স্বামীজী মহারাজ দেখিয়েছেন যে সূর্যের গতিপথের র্ধ্বগামী অর্ধবৃত্তের কলিযুগ প্রমাণ সময় অতীত হয় ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে: এব ার কাছাকাছি সময় থেকে মানুষ সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভূতি তথা সূক্ষ্ম বিষয়ের পর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বাপর যুগের আবির্ভাব না লে এইপ্রকার সূক্ষ্মানুভূতি সম্ভব হত না। চুম্বকশক্তির পূর্ণজ্ঞানের অনুভব খন হতে ২০০০ বৎসরেরও অধিক বাকি। চুম্বকশক্তি বৈদ্যুতিক আদি শক্তির ৎস। এখন কেবলমাত্র কিছু কিছু অনুমান করা সম্ভব হবে মাত্র।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে স্বামীজী মহারাজ তাঁর এই নব আবিষ্কৃতি

ঘোষণা করেন। ভারতের প্রধান প্রধান নগরে, বিশেষ করে কাশী, পুরী আদি স্থানে যেখানে পণ্ডিত মণ্ডলীর অধিক বাস, সভা আদি অনুষ্ঠান করেএ নূতন তথ্য বিজ্ঞাপিত করেন। সর্বত্রই তাঁর যুক্তি ও বিচার ভূরী ভূরী প্রশংস লাভ করলেও তাঁর মত সাধারণভাবে গ্রহণ করেননি। প্রচলিত ধারণা এখ কলিযুগের সন্ধিকাল মাত্র—(সূর্যের গতির) নিম্নগামী বৃত্তের। শুধু তাই নয় প্রচলিত মত হচ্ছে—সত্যাদি যুগের যে সংজ্ঞা মনুস্মৃতিতে প্রদত্ত, সেখানে যুগের বর্ষকে দৈব বর্ষ গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ জাগতিক ৩৬০ দিনে যদি দৈব অহোরাত্র হয় তবে ঐ দৈব অহোরাত্রের ৩৬০ গুণ হবে এক দৈববর্ষ। তার অথ কলিযুগের ১২০০ বৎসরকে গণ্য করতে হবে (১২০০ × ৩৬০) ৪,৩২,০০০ বৎসর ; এবং কলির সন্ধ্যা বা সন্ধ্যাংশ একশত বৎসরের স্থানে হবে (১০০ × ৩৬০) ৩৬০০০ বৎসর। পূর্বে উল্লিখিত মনুস্মৃতিতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত থেকে এই হিসাব পাওয়া যায় না ; শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যায়ই প্রমাণিত হয়। বর্ষ বর্ষই ; তার দৈববর্ষ বা ব্রহ্মার বর্ষ বলে কিছুই নেই। দৈব যুগ ও দৈববর্ষ দিয়ে হিসাব করা হয়নি। স্বামীজী মহারাজ বলেছেন কলিযুগের কুল্লুক ভট্ট নামে এক পণ্ডিতের টীকাতেই এই ভ্রান্তির প্রথম প্রবেশ ; তবে এই টীকা যে ভ্রান্ত তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

স্বামীজী মহারাজ বলতেন সপ্তাহের সাত দিন যে প্রকার সাতটি গ্রহের নামে হয়েছে এবং বার মাসের প্রত্যেকটির নাম যেমন কোন বিশেষ নক্ষত্রের নামানুসারে করা হয়েছে বৎসর ও প্রাচীনকালে যুগাব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হত। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কোন ঘটনাকে লক্ষ্য করে বর্তমানে যেমন করা হয়, সেরূপ হত না। সত্যযুগের ৪৮০০ বৎসর গতে সত্যাব্দ শেষ হয়ে ত্রেতাব্দ শুরু হত এবং ত্রেতাব্দের ৩৬০০ বৎসর গতে দ্বাপরাব্দ শুরু হত। সম্ভবত গোলমাল হয়ে গেছে সূর্যের নিম্নগামী গতির অর্ধবৃত্তে যখন কলিযুগের আবির্ভাব হয়েছিল। দ্বাপরাব্দের শেষের দিকে ভারত মহাযুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিজয়ের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভারত সিংহাসনে উপবিষ্ট। কলিযুগের আরম্ভের কিছুকাল পূর্বে সভায় পণ্ডিতগণ ঘোষণা করলেন যে কলিযুগ সমাগত ; কলিযুগ পাপযুগ, কোন ধর্মাত্মার এই যুগে বাস করা উচিত নয়। যুধিষ্ঠির তখন স্থির করলেন যে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করে সশরীরে

স্বর্গারোহণের মানসে হিমালয়ের পথে যাত্রা করবেন। পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যভার অর্পণ করে ভ্রাতাগণ ও পত্নী দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন; সভার সকল পণ্ডিত সমাজও তাঁর পশ্চাৎ গমন করলেন। হস্তিনাপুরের রাজসভায় আর কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত রইলেন না। দ্বাপর যুগের ২৪০০ বৎসর পূর্তির পর যখন কলিযুগ শুরু হয় তখন নূতন যুগের নামে কল্যাব্দ ১ না বলে পুরাতন সংখ্যানুযায়ী ২৪০১ লেখা হল। দ্বাপরাব্দও লেখা হল না কল্যাব্দও লেখা হল না। কলিযুগের অন্তে কল্যাব্দ ১২০০র স্থানে হল ৩৬০০ বর্ষ; আরও ১২০০ বর্ষ পরে সেই সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ৪৮০০। প্রাকৃতিক জগতে তখন সূর্যের ঊর্ধ্বমুখী গতির এক কলিযুগও সমাপ্ত। তারপরে বর্তমানে ২৮২ বৎসর গতে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০৮২। হিন্দু পঞ্জিকাদিতে এই সংখ্যাই দেখানো হয় কলির সন্ধ্যার ভুক্তবর্ষরূপে। এর মধ্যে কোন পণ্ডিতের যে এই ভ্রান্তি নজরে পড়েনি তা সম্ভব নয়। তবে কুল্লুক ভট্টের টীকায় প্রাপ্ত উদ্ভট বর্ষের ব্যাখ্যা পেয়ে তাকেই গ্রহণ করে ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চলে আসছে।

পঞ্জিকা প্রদত্ত আর এক ভ্রান্ত উল্লেখের স্বামীজী মহারাজ প্রচণ্ড সমালোচনা করে গেছেন। সেটা হল বিষুব এবং উভয় ক্রান্তি সম্বন্ধীয় সংক্রান্তি বিষয়ের। মকরক্রান্তি, বিষুবরেখা ও কর্কটক্রান্তি বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মকরসংক্রান্তি দিনে পৃথিবীতে বৎসরের সর্বাপেক্ষা বড় রাত্রি এবং সর্বাপেক্ষা ছোট দিন; কর্কটসংক্রান্তি দিবসে ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় দিন এবং সর্বাপেক্ষা ছোট রাত্রি। উভয় বিষুবসংক্রান্তি দিনে দিন রাত্রি সমান সমান হয়। বৈদিক সময় থেকে ভারতের রীতি ছিল মহাবিষুব সংক্রান্তির পরদিন থেকেই নববর্ষের আরম্ভ গণ্য করা। এখনও তাই হয়, তবে প্রকৃত মহাবিষুব সংক্রমণ হয়ে যায় ৩১শে চৈত্রের প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে। রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করলেই এই সত্য প্রমাণিত হয়। মকরসংক্রান্তি অনুষ্ঠিত হয় ৩০শে পৌষ। অথচ মকরসংক্রান্তি অনুষ্ঠিত হয়ে যায় ৭।৮ পৌষ। এই দিক থেকে ইংরাজী পঞ্জিকা অনেকটা ঠিক। ২৪শে ডিসেম্বর বৎসরের সর্বাপেক্ষা ছোট দিন—কারণ ঐ দিনই সূর্যের মকর সংক্রমণ সংঘটিত হয়ে থাকে। সেই কারণে ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসব; ঐদিন

থেকেই দিন বাড়তে আরম্ভ হয়। এই প্রকার সব সংক্রান্তি। পূর্বে যে বিষুং সংক্রমণ বিন্দুর অগ্রগমনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে আমাদের হিন্দু পঞ্জিকায়—এই নিশ্চিত পরিবর্তনের জন্য তারিখে কালশুদ্ধ প্রয়োগ না করার কারণেই এই ভ্রান্তি চলে আসছে। ধর্মবিশ্বাসী হিন্দু মকরসংক্রান্তির স্নান সেরে ধর্মকর্মাদি করেন—কিন্তু প্রকৃত সংক্রান্তি হয়ে থাকে প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্মকর্ম কি প্রকার হচ্ছে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধানবাদনিবাসী মহাত্মা রামনাথ শাস্ত্রী কাশীধামে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামীজী মহারাজ যখন পঞ্জিকা শুদ্ধ তথা যুগ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা বিমোচনের আন্দোলন করছিলেন উক্ত শাস্ত্রী মশাই কাশীধামেই ছিলেন, এবং স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থকার যখন কার্যব্যপদেশে তিন বৎসর ধানবাদে ছিলেন তখন শাস্ত্রীজীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল। তখনও তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রশ্নপত্র করতেন। একদিন তিনি বলেন, "তোমার স্বামীজীর যুগ বিষয়ে বিচার যুক্তি অকাট্য এবং অতুলনীয়। মুশকিল কি হল জান, উর্ধ্বগামী যুগ চতুষ্টয়ের আবির্ভাব বিষয়ে শাস্ত্রে কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না।" এই মহাত্মাই গ্রন্থকারকে তাঁর নিজস্ব হিন্দিতে "মনুস্মৃতি" গ্রন্থটি দিয়ে বলেন, "এ তুমি অন্য কোথাও পাবে না।"

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী মহারাজ শিষ্য ও ভক্তগণকে ডেকে বলেন, "যুগ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে; পূর্ণ দ্বাপর যুগ আরম্ভ। এখন নূতন উন্নত যুগোপযোগী কিছু কর।" এরই প্রভাবে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে সৎসঙ্গ সভার প্রতিষ্ঠা হয়—যার উত্তরসূরী যোগদ সৎসঙ্গ। স্বামীজীর নির্দেশানুসারে বৎসরে চারদিন সৎসঙ্গ সভার, সেই কেন্দ্রেই হোক আর শাখায়ই হোক, উৎসব হবে মকরসংক্রান্তি, জলবিষুব সংক্রান্তি, মহাবিষুব সংক্রান্তি ও কর্কটসংক্রান্তি দিবসে। প্রকাশিত গ্রন্থেও ইংরাজী খ্রীস্টাব্দের সঙ্গে দ্বাপরাব্দ লেখার প্রচলন শুরু করেন।

স্বামীজী মহারাজের গণনা এবং সিদ্ধান্ত যে যথার্থ ছিল তার প্রমাণ তাঁর ঘোষণার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে যখন স্বাধীন ভারত সরকার পঞ্জিকা পরিশোধন কমিশন গঠন করেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাথ সাহাকে

নিয়ে। এই কমিশনও সুপারিশ করেন যে নূতন বৎসর ৭।৮ চৈত্র শুরু হওয়া উচিত ; অর্থাৎ মহাবিষুব সংক্রান্তির পরের দিন থেকে। হলে কি হবে প্রাচীন পন্থী সমাজ সে সুপারিশ গ্রাহ্য করেনি। চিরাচরিত ভুল পদ্ধতিই চলে আসছে। স্বামীজী মহারাজের অন্তর্দৃষ্টি, নির্ভুল জ্যোতিষগণনা এবং সর্বোপরি অদম্য সাহস—এ দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

যুগ ও যুগধর্ম বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা ক্রিয়াযোগ জিজ্ঞাসায় এই কারণে লিপিবদ্ধ করা হল যে "যুগধর্ম" কেবল সাধারণভাবে জাগতিকই নয় ব্যক্তিগতও বটে। "কৈবল্যদর্শন" আলোচনায় এই বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া আছে। সকলেই জানে পৃথিবীর একবার সূর্য পরিক্রমায় বার মাস লাগে এবং প্রতি মাসকে সৌর মাস বলা হয়। হিন্দুর জাতীয় পঞ্জিকায় কিন্তু চান্দ্রমাসকেই মাস বলা হয়। সৌর বার মাসে চন্দ্র বার বার পৃথিবী পরিক্রমা করে ও তার সমান হয় না ; বার চান্দ্র মাসে মোট ৩৬০ দিন হয়। অথচ বার সৌর মাসে, অর্থাৎ এক সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিনেরও কিছু অধিক হয়। এই কারণে প্রতি তিন বৎসর অন্তর কয়েকটি মাসের দিন বাড়িয়ে সৌর মাসের সঙ্গে সমান করে নেওয়া হয়। বাড়তি দিন সম্পন্ন মাসকে মল মাস বলা হয়। মোট হিসাবে দেখা যায়, তিন বৎসরে অর্থাৎ ৩৬ সৌর মাসে ৩৭টি চান্দ্র মাস হয়। যুগের বয়স শত সহস্র বর্ষে দেওয়া হয়। উক্ত হিসাবে যুগের আয়ুষ্কালকে চান্দ্র মাসে পরিণত করে নিলে একটু বোধগম্য হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া তার একটা ব্যবহারিক দিকও আছে। কলিযুগের বার শত বৎসরে $\left(\frac{১২০০}{৩} \times ৩৭\right)$ ১৪৮০০ চান্দ্রমাস হয়। সেইরূপ অন্যান্য যুগ।

ক্রিয়াযোগ প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কস্থ দেহসূর্য এবং চন্দ্ররূপী মন দ্বারা চন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমার প্রক্রিয়া দেহে অনুষ্ঠান করা ক্রিয়াযোগ সাধনার একটি রহস্যপূর্ণ দিক। এই প্রক্রিয়া দ্বারা একমাস কালের ক্রিয়া সম্পন্ন করতে এক মিনিট সময়ও লাগে না। এই প্রক্রিয়া নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে এক জীবনেই কেবল যে এক দৈবযুগ প্রমাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে তা নয় ; এক কল্প প্রমাণও সম্পাদিত হতে পারে।

বাহ্যজগতে বাহ্যসূর্যকে বলা হয় বিশ্বের কারণ শরীর, চন্দ্রকে সূক্ষ্ম শরীর এবং গ্রহউপগ্রহাদি স্থূল শরীর। বিশ্বের প্রতীকরূপে মানবের সৃষ্টি হওয়ায়

বিশ্বের প্রতীকরূপী সকল দেহই মানব শরীরে বর্তমান। মানব মস্তিষ্কে আজ্ঞাচক্র সূর্যের প্রতীক এবং মানবের মন চন্দ্রের প্রতীক। বহির্বিশ্বে যে প্রকার পৃথিবী পরিক্রমায় একবার সূর্যের নিকটস্থ হয়ে অমাবস্যা সংঘটিত করে পরে সূর্য হতে দূরতম প্রদেশে সরে গিয়ে পূর্ণিমা সংঘটিত করে এবং পুনঃ সূর্যের নিকটস্থ হয়ে এক চান্দ্রমাস সংঘটিত করে, সেইরূপ দেহে বায়ুবেগে চন্দ্ররূপ মনকে একবার আজ্ঞাচক্রের নিকটে তুলে এনে এবং তারপর সুষুম্নাপথে মস্তিষ্ক থেকে দূরতম মূলাধার চক্রে নিয়ে গিয়ে পুনরায় আজ্ঞাচক্রে উত্তোলিত করলে দেহে এক চান্দ্রমাসের অনুরূপ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সুষুম্নাই বহিঃ আকাশের প্রতীক এবং ষট্চক্র রাশির প্রতীক। মনুস্মৃতির পিতৃলোকের অহোরাত্রের বিবরণ মনে রেখে দেহে এইপ্রকার একটি পরিক্রমা সংঘটিত হলে একটি মাসের পরিক্রমার সমতুল হয়—যাতে সময় এক মিনিটও লাগে না। এই প্রকার একটি পরিক্রমাকে এক ক্রিয়া বলা হয়। ৩৭টি ক্রিয়া সম্পাদিত হলে তিন সৌর বৎসর বা এক খণ্ডযুগের সমতুল হয় এবং ১৪৮টি ক্রিয়া সম্পাদিত হলে দ্বাদশ বৎসরের অনুরূপ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। একে ভূতশুদ্ধি বলা হয়। দিনে তিনবার এই প্রকার ভূতশুদ্ধি সম্পাদিত হলে অতি অল্প সময়েই দৈবযুগ সমতুল ক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে যায়। যুগাবির্ভাবে যে ধর্মের প্রকাশ হয় দেহে এই রূপ ক্রিয়াদ্বারাও যুগ সমতুল অনুরূপ ধর্মের বিকাশ সাধিত হয়। ক্রিয়াযোগ জিজ্ঞাসার যুগ ও যুগধর্মের আলোচনা ও বিচার এই কারণেই প্রাসঙ্গিকই কেবল নয়, এ বিষয়ের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

ক্রিয়া

ক্রিয়াযোগ সাধন প্রণালীতে মূল সাধন প্রক্রিয়ার নাম ক্রিয়া এবং ক্রিয়া াধককে ক্রিয়াবান নামে চিহ্নিত করা হয়। এই সাধন অতি প্রাচীন; াগীরাজ লাহিড়ী মহাশয় বলেছেন প্রাচীন কালে যে সকল গৃহস্থের অগ্নি-হাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার প্রথা ছিল, এই ক্রিয়াই সেই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। ত্যযুগে প্রায় সকলেই এই ক্রিয়া করতেন, কিন্তু ত্রেতাযুগ থেকেই সাধারণের ধ্যে এই প্রচলন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোন সময়েই এই াধন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়নি; গুপ্তভাবে যোগীমুনিদের মধ্যে প্রচলিত য়ে এসেছে। যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের অপার করুণায় ।গত শতাব্দীর শেষার্ধে এই মহান সাধন পদ্ধতি আগ্রহী সাধারণ নরনারীরও প্রাপ্ত হওয়ার পথ সুগম হয়েছে।

ক্রিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদ্যা। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে "বিদ্যা দুই প্রকার—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা এবং বিদ্যা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। ঋক্ বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ —অপরাবিদ্যা, এবং পরাবিদ্যা তাকেই বলা হয় যদ্দারা অক্ষরকে জ্ঞাত হওয়া যায়।" (১) উপনিষদের নির্দেশ পরা ও অপরা বিদ্যা উভয়ই জানা প্রয়োজন। সাধারণের ধারণা হতে এই নির্দেশ নিশ্চয়ই ঠিক নয়। অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা হেয় বলে গণ্য বলা হয়, এবং বিদ্যা বা পরাবিদ্যাই পরমার্থ সন্ধানীর একমাত্র কাম্য মনে করা উচিত। আজ প্রায় চার দশকের কথা;

---

(১) "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদোবদন্তি, পরা চৈবাপরাচ।"

"তত্রাপরা ঋগবেদোযজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥" মুণ্ডকোপনিষদ—

১ম মুণ্ডক / ১ / ৪, ৫

গ্রন্থকার তখন যুবক। এক বিরাট দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত অবিভক্ত বাংলার অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক এবং বয়স্ক সর্বজন সম্মানিত ব্যক্তি গ্রন্থকারকে বলছেন, "ভাই! এইসব যোগ ফোগ ছেড়ে দাও, ওসব অজ্ঞানীর কথা। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যুক্তি বিচারের দ্বারা একবার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। এসব ছেড়ে দাও, আমার কাছে এস—একটি একটি করে উপনিষদের পাঠ দেব ; দু-বৎসরের মধ্যে তৈরী হয়ে যাবে।" যুবক হলেও গ্রন্থকারের যোগ বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা ছিল ; পণ্ডিত প্রবরের এই মন্তব্য সানন্দে গ্রহণ করতে পারল না, বলল, "ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা" একবার যুক্তি দিয়ে বুঝে নিয়ে বাক্সবন্দী করলেই হয়ে যাবে? জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে না?" বিদগ্ধ পণ্ডিত শাস্ত্রমর্ম বোঝেন বৈকি! বললেন, "না! না! তা তো বটেই! তোমাদের আধার ভালো, আর্যপন্থাই অবলম্বন কর।" আর্যপন্থা বলতে শাস্ত্রপাঠ বোঝায়। বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরও নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রোক্তিকে বক্রভাবে বিশ্লেষণ করার প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিতে অজ্ঞাত নয়। উক্ত শ্রুতি বলছেন—চতুর্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ইত্যাদি সবই অপরা বিদ্যা! এবং সবই জানা দরকার—"বেদিতব্য"। বেদকে অপরাবিদ্যা বলা পণ্ডিতগণেরও বিস্ময়ের কারণ। উপর্যুক্ত উপনিষদবাণী এই বিষয়ে একমাত্র শ্রুতি নয়। ঈশ উপনিষদে তো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই উপনিষদের নবম ও একাদশ সূত্রে বলছেন—

"যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা (আত্মদর্শন প্রতিরোধী) অন্ধকারে প্রবেশ করে ; যারা কেবল (কর্ম পরিত্যাগ করে) বিদ্যাতে রত থাকে তারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।" (১)

(১) অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ঃ ইবতে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥"

(ঈশ উপনিষদ-৯

"যিনি বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই উভয়কে এক সঙ্গে জানেন তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।" (১)

অব্যাকৃত, অপ্রকাশ পরমব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মের ও আত্মার প্রকাশ হয়; তার থেকেই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত। ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, এবং দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বই নেই—শ্রুতি কোন স্থানে বলেননি। পরন্তু ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাত হওয়াই বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সূত্রে ব্যক্ত।

বেদ অপরা বিদ্যার অন্তর্গত ঘোষিত হওয়ায় ভাষ্যকার টীকাকার বিভ্রান্ত; তাঁরা বেদের কর্মকাণ্ডকেই "বেদ" শব্দে লক্ষিত হয়েছে বলার চেষ্টা করেছেন। গীতায়ও বেদকে ত্রিগুণাত্মক "ত্রৈগুণ্য বিষয়" বলা হয়েছে। ত্রৈগুণ্য শব্দে প্রকৃতিজাত বুঝতে হয়। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, "বেদ ত্রিগুণাত্ম বিষয়ক, তুমি ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে উত্থিত হও।" (২) যোগীরাজ বেদান্তদর্শনের লাহিড়ী মহাশয় "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "ব্রহ্মবিদেরা বলিয়াছেন, সমুদয় জানিবার নিমিত্ত অপরা ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব অর্থাৎ পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও (সমুদয় মিলিয়া) উত্তরের বায়ু ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা সমুদয় জানা; শিক্ষা—শেখা, কল্প—কল্পনা করা, ব্যাকরণ—বিশেষ রূপে অনুভব করা, নিরুক্ত নিঃশেষ রূপে বলা, ছন্দ—দেখা, জ্যোতিষ—সব জ্যোতিষ জানা, এসব জানার দ্বারা অনুভব করিতে পারেন,—এই অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা সম্বন্ধে বলেছেন, "কূটস্থের মধ্যে সমুদয় যাহা কিছু দেখা যায় এ সকল জানিয়া অনুভব করিতে পারেন; ভালো লোকেরা যাহা জানিয়া লিখিয়া গিয়াছেন তাহাকে শাস্ত্র কহে। শাস্ত্র তখনই হইল যখন সমুদয় এক হইল। এক হইলেই সমুদয় জানা গেল অর্থাৎ ব্রহ্মযোনি হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই লয় এই ব্রহ্ম।"

এই প্রসঙ্গে হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতিতে বেদের সংজ্ঞা কি জানা নিতান্ত

---

(১) বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া হমৃতমশ্নুতে॥"
(ঈশ উপনিষদ—১১)

(২) "ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জুন॥"—গীতা—২/৪৫

প্রয়োজন। বেদ কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কনিঃসৃত তত্ত্ব নয়; বেদ অপৌরুষেয়। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে ক্ষীর সমুদ্র মন্থনের সময় বেদহস্তে ব্রহ্মা উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ বেদ সর্বকালিক চিরন্তনী। পুঁথি রূপে যে বেদ আমাদের জানা—তা প্রকৃত বেদের বিবরণ মাত্র। বেদ দৃষ্ট—উপলব্ধ সত্য। এই নিরিখেই বেদ হিন্দুর নিকট অকাট্য, অভ্রান্ত সত্য। যে বেদ মানে না সে হিন্দু নামের অধিকারী হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে পরমহংস যোগানন্দের কথোপকথন উল্লেখযোগ্য: —গ্রন্থকার ঐ মিলন সময়ে উপস্থিত ছিলেন। যোগানন্দজী ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা থেকে ভারতে আসেন—ভারতের শক্তিমান সাধকদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন—তাঁর পরবর্তী "যোগীর আত্মজীবনী" (Biography of a Yogi) গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে। একদিন সংবাদ পাওয়া গেল আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সাময়িকভাবে কলকাতা এসেছেন এবং তদীয় শিষ্য কলকাতার প্রখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ অরুণ মুখার্জীর কলকাতাস্থ বাড়িতে অবস্থান করছেন। ভূপেন্দ্রনাথ যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের ক্রিয়াযোগী শিষ্য ছিলেন। বেথুন কলেজের পশ্চিমের রাস্তায় ডাঃ মুখার্জির বাড়ি ছিল। যোগানন্দজীর সঙ্গে গ্রন্থকারও আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ দর্শনে যান। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাবাজী মহারাজ বিষয়েও আলাপ হয়। সান্যাল মহাশয় বেদের বিষয় উত্থাপন করে বলেন, একবার ঠাকুরকে একটি পত্র লিখে জানতে চেয়েছিলাম—পাশ্চাত্য মোক্ষমুলার প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ ঋগ্‌বেদে গ্রাম্য পরিবেশের বিবরণ দেখে বলেন ঋগ্‌বেদ এক গ্রাম্য সভ্যতার প্রতিচ্ছবি—এ কি সত্য?" পত্রের উত্তরে যোগীরাজ স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুসারে ঐ চিঠিই ফেরত পাঠিয়ে প্রশ্নের পার্শ্বে হ্যাঁ, না, লিখে নিজ মতামত জানাতেন। আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ যে উত্তর পেলেন তাতে প্রশ্নের পার্শ্বে লেখা ছিল, "পরে বুঝিবা।" মৃদু হেসে আচার্যদেব বলেন—"পরে বুঝেছি।" বলার ভঙ্গিতে বুঝতে অসুবিধা হল না যে বেদে যে সকল উক্তি আছে সব আভ্যন্তরিক অনুভূতির —উপলব্ধির বিষয়।

যাই হোক শ্রুত্যুক্ত বিদ্যা শব্দ দ্বারা বিদ্যা এবং অবিদ্যা তথা পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যাকেই বুঝতে হবে। ক্রিয়াই এই পর্যায়ের একমাত্র সম্পূর্ণ

বিদ্যা। অক্ষর পরম ব্রহ্ম হতে স্তরে স্তরে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে সেই সৃষ্টির মূল বা উৎস সন্ধান ঐ সকল স্তর পার হয়েই সম্ভব; সৃষ্টির যে ধারা বা স্রোত চলে এসেছে তার বিপরীত মুখে অগ্রসর হওয়া দরকার। বৈষ্ণবের ভাষায় এই উজানে যাওয়া বা "রাধা" পথ অবলম্বন করা। চৈতন্য ও জড় মিশ্রিত হয়ে যে সৃষ্টির প্রকাশ সেই চিৎ-জড় গ্রন্থি উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। ক্রিয়াযোগ পদ্ধতিতে তাই বিভিন্ন প্রকারের শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, যথা জড় শুদ্ধি, নাড়ি শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি। দেহযন্ত্রকে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উপযোগী করা অত্যাবশ্যক।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত আছে যে অগ্রে এক অদ্বিতীয় অসৎ বা অপ্রকাশরূপ ছিল, এবং ঐ অসৎ হতেই সতের প্রকাশ হয়; পরে নিজেই আত্মা সৃষ্টি করলেন—সেই কারণে একে "সুকৃত" বলা হয়েছে।
ঐতরেয় উপনিষদেও আছে, "অগ্রে একমাত্র আত্মাই ছিল; অন্য কিছুই ছিল না। সে ইচ্ছা বা ইক্ষণ করল যে সৃষ্টি করব।" উক্ত সুকৃৎ বা "ইক্ষণ"-ই বস্তুত ক্রিয়া। মনুস্মৃতি উক্ত "তপ"-ই সুকৃৎ, তপই "ইক্ষণ"। সৃষ্টির মূল এই সুকৃতের বা ক্রিয়ার আবিষ্কার হিন্দু অধ্যাত্ম সংস্কৃতির এক মৌলিক এবং অমূল্য সম্পদ। ক্রিয়া সাধনার মূল লক্ষ্য স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের শুদ্ধি সম্পাদন করে সকল কামনাবাসনার উৎপত্তির কারণসমূহ তত্ত্বতঃ, তাত্ত্বিকভাবে জ্ঞাত হওয়া; তদ্বারা সকল কামনাবাসনার উৎস, অজ্ঞানতা বা ভুল বোঝা বিদূরিত হয়; এবং ক্রিয়াবান ব্রহ্ম প্রকাশক ওঁকারনাদ শ্রবণের যোগ্য হয়। ওঁকারনাদে বিশিষ্টভাবে চিত্ত সংযত হলে পরাবিদ্যারূপ জ্ঞান পূর্ণ তেজরূপে প্রকাশিত হয়।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ক্রিয়া সাধন পদ্ধতি শ্রুতি, গীতা, যোগসূত্র, তন্ত্রশাস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ যোগশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বের সংমিশ্রণ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুগোৎপাদক জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতির অনুকরণে উদ্ভাবিত।

ক্রিয়া কয়েক প্রকারের হয়। কেউ কেউ বলেন যোগীরাজ প্রদর্শিত ক্রিয়ার সংখ্যা ১০৮ প্রকার; অপর কেউ বলেন গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সমতুল ক্রিয়ার সংখ্যাও অষ্টাদশ। বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় একস্থানে যোগীরাজ ত্রিংশতম ক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এর

মধ্যে প্রথম চারটি ক্রিয়াই ক্রিয়া-সাধনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় অপর ক্রিয়া উন্নত ক্রিয়াবান নিজেই প্রায় সবগুলি উদ্ভাবন করে নিতে পারেন। প্রথম তিনটি, এমনকি প্রথম দুই ক্রিয়াসাধন দ্বারাও অনেকে কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। প্রথম ক্রিয়াতেই সাধনার মূলতত্ত্ব নিহিত, অপর উন্নত ক্রিয়াদ্বারা সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছান ত্বরান্বিত হয়।

প্রথম ক্রিয়ায় নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান অঙ্গীভূত :

(১) **মহামুদ্রা :** এই প্রক্রিয়া তন্ত্র থেকে নেওয়া। এর অনুষ্ঠানে শরীরের—বিশেষ করে—পায়ের স্নায়ু ও পেশীসমূহ সতেজ হয়, এবং অস্থি গ্রন্থিসমূহ শিথিল হয়। ক্রিয়া অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বেই মহামুদ্রা প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য। মহামুদ্রার অনুষ্ঠান হলে বহুক্ষণ আসনে উপবেশন করার শক্তি ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; বাত বা ব্যথা হতে নিস্তার পাওয়া যায়। আসনে বসেই মহামুদ্রার অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

(২) **আসন :** আসন কি প্রকারের হওয়া দরকার পূর্বাধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে ক্রিয়াবানদের পদ্মাসন করে আসনে উপবেশন করার বিধান। এই বিধানের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; ক্রিয়া অনুষ্ঠান সময়ে শরীরে বিশেষ করে মস্তকে, নেশার ভাবের উদয় হয় পদ্মাসন করে উপবেশন না করলে শরীর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং মস্তকে আহত হওয়ারও সম্ভাবনা হয়।

(৩) **ক্রিয়া বা প্রাণায়াম :** নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা রকমের প্রাণায়াম প্রণালী দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ শ্বাসের রেচক, পূরক, কুম্ভকরূপ প্রক্রিয়াকে প্রাণায়াম বলা হয়ে থাকে। যোগীরাজ প্রদর্শিত ক্রিয়া পরন্তু গীতোক্ত প্রাণাপানের গতিরুদ্ধ রূপ যজ্ঞই এই প্রাণায়াম। প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে আহুতি প্রদান করে এই প্রাণায়াম ক্রিয়া সম্পাদন করতে হয়। আহুতি দান প্রক্রিয়া এই প্রাণায়াম পদ্ধতির গুপ্ত কৌশল; গুরুমুখ থেকে শুনে এবং উপদিষ্ট হয়ে এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করা হয়। গীতায় উক্ত শ্লোকে কিন্তু কুম্ভকের উল্লেখ নেই, কুম্ভক অভ্যাসের দ্বারা আপনা আপনি হয়ে যায়। এই কুম্ভককে সেইজন্য কেবলী কুম্ভক বলা হয়। এই প্রাণায়াম প্রক্রিয়াকেও অনেকে কেবলী প্রাণায়াম

লে থাকেন। "যুগ ও যুগধর্ম" আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে সৌরমণ্ডলের যুগউৎপাদনকারী গতির অনুকরণে এই ক্রিয়া প্রবর্তিত। বহিঃস্থ সূর্যকে বিশ্বের কারণ শরীর বলা হয়, চন্দ্রকে সূক্ষ্ম শরীর এবং গ্রহউপগ্রহাদি স্থূল শরীর। মানব বিশ্বেরই অংশ সম্ভূত হওয়ায় মানব শরীরেও ঐ তিন দেহের প্রতীক-রূপ বর্তমান। শরীরস্থ মস্তিষ্ককে দেহসূর্য এবং মানবমনকে দেহস্থ চন্দ্র বলা হয়। বহিঃস্থ চন্দ্র যে প্রকার পৃথিবী পরিক্রমার সময় একবার সূর্যের নিকটতম বিন্দু, তারপর সূর্য থেকে দূরতম বিন্দু এবং পুনরায় সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে পৌঁছে একটি চান্দ্রমাস উৎপাদন করে, শরীরে চন্দ্রের প্রতীক মনকে বায়ুবেগ দ্বারা মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ডের দূরতম এবং নিম্নতমকেন্দ্র, মূলাধার থেকে, সুষুম্নাপথে মস্তিষ্কের নিকটতম কেন্দ্রে উন্নয়ন করে পুনরায় দূরতম কেন্দ্র মূলাধারে নীত করলে একটি চান্দ্রমাস উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরই নাম একটি ক্রিয়া।

"যুগ ও যুগধর্ম" অধ্যায়ে যুগের আয়ুষ্কাল শতসহস্র বর্ষকে চান্দ্রমাসে পরিণত করা যায় দেখান হয়েছে। প্রতি তিন বৎসরে সাঁইত্রিশ মাস হয়, এই হিসাবে একটি কলিযুগোপযোগী চান্দ্রমাসের সংখ্যা (১২০০ ÷ ৩ × ৩৭) বা ১৪৮০০ হয়। এক চান্দ্রমাসোপযোগী একটি ক্রিয়া সম্পন্ন করতে এক মিনিট অপেক্ষাও কম সময়ের দরকার। এক আসনে বসে ক্রিয়াবান যদি ৩৭টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তবে শরীরে তিন বৎসরোপযোগী, এক খণ্ডযুগের, পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হন। প্রতিদিন তিনবার এই প্রকারে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলে এক দিনেই নয় বৎসরের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন সাধিত হয়; আর দিনে চারবার অনুষ্ঠিত হলে প্রতিদিনই বার বৎসর সমতুল পরিবর্তন সাধিত হয়। কিছুকাল অভ্যাসের পর ক্রিয়াবান এক আসনেই ১৪৮ ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকেন। দিনে দুইবারও এই সংযম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলে প্রতিদিনে ২৪ বৎসরের পরিবর্তন সাধিত হয়। পঞ্চাশ দিনেই অর্থাৎ দুইমাস কালেরও কম সময়ে একটি কলিযুগ প্রমাণ কার্য সাধিত হয়ে যায়। দ্বাপর যুগোপযোগী ক্রিয়া সম্পাদিত হবে আরও চার মাসে, ত্রেতাযুগোপযোগী আরও ছয় মাসে। অর্থাৎ এক বৎসরকালের মধ্যেই কলি, দ্বাপর ও ত্রেতাযুগোপযোগী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে চৈতন্যপ্রকাশক সত্যযুগের আবির্ভাব সন্নিকট হয়ে যায়। এই

প্রকারে, ক্রিয়াসাধন অনুষ্ঠিত হয়ে একটি দৈবযুগ প্রমাণ পরিবর্তন অল্পকাল মধ্যেই সাধিত হওয়া সম্ভব। এক হাজার দৈব যুগোপচিত এক কল্পের উপযোগী আন্তরিক ধর্মের প্রকাশও এক জীবনেই সম্ভব হয়, যদি অন্য উচ্চ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। উচ্চ উচ্চ ক্রিয়ার উদ্ভাবন এই উদ্দেশ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে।

প্রাণ শব্দের সঙ্গে আয়াম শব্দের সংযুক্তিতে প্রাণায়াম শব্দ নিষ্পন্ন। আয়াম অর্থে বিশ্রাম বা বিস্তার। প্রাণের বিশ্রাম বা বিস্তার সাধিত হলে অনৈচ্ছিক নাড়ীসমূহও বিশ্রামপ্রাপ্ত হয় এবং বিশ্রামের পর সতেজ হয়ে পূর্ণ কর্মক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ প্রাণ ও মন যুক্তভাবেই থাকে ; প্রাণের চাঞ্চল্যে মনও চঞ্চল হয়। প্রাণের বিস্তাররূপ স্থিরতা সাধিত হলে মন ঐ সংযুক্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। পুনঃ পুনঃ এইপ্রকার বিচ্ছিন্নতা সাধিত হয়ে ক্রমশঃ মন প্রাণ নিরপেক্ষ হয়ে আসে এবং মনকে তখন ক্রিয়াবান সাধক যে কোন বিষয়ে সংযত করতে সক্ষম হয়।

এই প্রাণায়াম প্রক্রিয়ায় আর এক বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন হয়। শরীরে রক্ত চলাচলের জন্য হৃৎপিণ্ডের কাজ অম্লজান বায়ুর সাহায্যে হয়। প্রাণায়াম প্রক্রিয়ায় গভীর শ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কয়েকবার গভীর শ্বাসগ্রহণ দ্বারা কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ হৃৎপিণ্ডের অম্লজান বায়ুর প্রয়োজন হয় না, এবং হৃৎপিণ্ড ঐ সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়—অনৈচ্ছিক নাড়ীসমূহও তৎকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করে। এর দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যে রুদ্ধ হয়ে যায় তাই কুম্ভক ; ক্রিয়া সম্পাদনে আপনা আপনি উদয় হয় বলে কেবলী কুম্ভক বলা হয়। অধিক অনুষ্ঠানের দ্বারা এই কেবলী কুম্ভক গভীর হয়ে ক্রিয়াবানের সমাধি অবস্থারূপ ক্রিয়ার পরাবস্থার উদয় হয়; এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়।

জড়শুদ্ধি : ত্রয়োদশ—সূত্রপাত সময়ে চতুর্দশ—প্রাণায়াম ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা দেহের জড়তা কেটে শুদ্ধ হয়ে যায় ; সেইজন্য এই অবস্থা প্রাপ্তিকে "জড়শুদ্ধি" বলা হয়।

নাড়ীশুদ্ধি : তিন বৎসরে এক খণ্ড যুগ হয়, এবং ঐ সময় সাইত্রিশ

চান্দ্রমাসের সমান। সাঁইত্রিশ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা এক খণ্ডযুগ প্রমাণ কার্য সাধন হয়, এবং এই কার্যকে এক "নাড়ীশুদ্ধি" প্রক্রিয়া বলা হয়।

ভূতশুদ্ধি: বার বৎসরকে সাধারণভাবে যুগ বলা হয়, এবং ঐ সময় ১৪৮ চান্দ্রমাসের সমপরিমাণ; ১৪৮ প্রাণায়াম ক্রিয়া সম্পাদন করলে উক্ত বার বৎসর কালের কার্য সম্পন্ন করা যায়। প্রতি বার বৎসরে দেহের রক্ত, মাংস, অস্থি আদি পরিবর্তিত হয়ে দেহ প্রায় নূতন ধাতু দ্বারা গঠিত হয়ে যায়, যাকে "ভূতশুদ্ধি" কার্য বলা হয়। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ক্রিয়াবানের প্রতিদিন তিনবার ভূতশুদ্ধি অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; অর্থাৎ সৌরজগতে বার বৎসরে যে উন্নতিসাধন হয় ক্রিয়াবান সাধক একদিনেই ঐপ্রকার উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। অধিক হলেও অপরিহার্য কারণে দুই একদিন ক্রিয়া অনুষ্ঠান বাদ গেলেও ৩৬ দিনের মধ্যেই এক কলিযুগের সমপরিমাণ আভ্যন্তরিক প্রকাশ সম্পাদন সম্ভব হয়। ৭২ দিনে দ্বাপর যুগ সমতুল, ১০৮ দিনে ত্রেতাযুগ সমতুল এবং ১৪৪ দিনে সত্যযুগ সমতুল আভ্যন্তরিক উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ প্রায় একবৎসর সময়ের মধ্যেই এক দৈবযুগে উৎপন্ন মানসিক উৎকর্ষ সাধন হয়ে যায়। এক কল্প পরিমাণের উৎকর্ষও এক জীবনে সাধিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন দ্বিতীয়, তৃতীয় আদি উন্নত ক্রিয়া-প্রণালীর অনুষ্ঠান। অনেক সমর্থ ক্রিয়াবান ৬।৭ বৎসরের মধ্যে উক্তরূপ উৎকর্ষ লাভ করেছেন জানা যায়। দীর্ঘকাল দীর্ঘ সময় ধরে, নিরন্তর শ্রদ্ধা সহকারে এই ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা এই উৎকর্ষ লাভ সম্ভব।

ধ্যান: ক্রিয়ার নির্দিষ্ট সংখ্যা অনুষ্ঠিত হলেই ক্রিয়াবানের আসন ত্যাগ করা উচিত নয়। ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা শরীর মনের যে প্রশান্তির উদয় হয় সে প্রশান্তি উপভোগ করে আসনে উপবিষ্ট থাকা প্রয়োজন। অনেক সময় ঐ অবস্থায় অলৌকিক অনুভূতিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ততঃ যতক্ষণ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন শরীরের তাপ শান্ত না হয়, শরীরের ঘর্ম শুকিয়ে না যায়, ততক্ষণ আসন ত্যাগ করা উচিত নয়।

যোনিমুদ্রা: উপযুক্ত ক্রিয়ার অঙ্গাদি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শেষ অঙ্গ হিসাবে "যোনিমুদ্রা" প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিধেয়। যোনিমুদ্রাও এক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তন্ত্রশাস্ত্রে যোনিমুদ্রার বহুল প্রশংসা করা হয়েছে। দুই

হাতের আঙুলের দ্বারা উভয় কর্ণ, নাসারন্ধ্র ও মুখের ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করে যথোপদি ক্রিয়া দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। ঐ চক্রে উজ্জ্বল শ্বেত জ্যোতির বলয়ের মধ্যে ঘোর নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণের ন্যায়, জ্যোতি গোলক দৃষ্ট হয়—যাকে কূটস্থ বলে। ঐ কৃষ্ণবর্ণের গোলকের মধ্যে ক্রমশ উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ গুহার প্রকাশ হয়; ঐ হল মহাজন পথ—চৈতন্যরাজে প্রবেশের পথ। এই মুদ্রা অভ্যাসের দ্বারা সাধক ক্রমশঃ যা কিছু জানবা সবই জানতে পারেন, সর্বজ্ঞ হতে পারেন।

উপরিউক্ত প্রথম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রণালীতেই ক্রিয়াযোগের মূলনীতি নিহিত।

দ্বিতীয় ক্রিয়া ঃ

উন্নত ক্রিয়া অনুষ্ঠানের প্রথম সোপান দ্বিতীয় ক্রিয়া। এই ক্রিয়া দ্বার ক্রিয়াবান সাধকের বায়ুবেগ ধারণের ক্ষমতা অনেক বর্ধিত হয় এবং ঐ ক্ষমতা লাভে সহায়ক "খেচরী মুদ্রা"। এই মুদ্রাও এক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তালুে আলজিভের ঠিক পশ্চাতে যে রন্ধ্র বা নালী আছে জিহ্বা সেই নালীতে প্রবে করে যায়। একে জিহ্বা গ্রন্থি ভেদ করাও বলে। এই প্রক্রিয়া খুব সহ নয়; ধীর স্থিরভাবে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলে এবং সামান্য প্রচেষ্টায় এই কাে সাফল্য লাভ হয়। কিন্তু কোনক্রমেই কোনরকম অস্ত্রের সাহায্য গ্রহ একেবারে নিষিদ্ধ। শোনা যায় পরজাবনে কোন এক প্রসিদ্ধ মহাত্মা পূর্ব জীবনে যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য হয়েছিলেন, এবং তাড়াতাড়ি খেচরী মুদ্রায় সাফল্য লাভ করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপচারের সাহায নিয়েছিলেন; যোগীরাজ তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন।

দ্বিতীয় ক্রিয়া সম্পাদনকালে ঘাড় থেকে মস্তক ঘুরিয়ে ঠোকরের মত ঝাঁকি দিতে হয়; সেইজন্য এই ক্রিয়াকে ক্রিয়াবানগণ "ঠোকরের ক্রিয়া"ও বলেন। এই সময়ে যে বায়ুর বেগ উৎপন্ন হয় "খেচরী মুদ্রা" অনুষ্ঠিত না থাকলে সে বায়ু ধারণ করা যায় না। দ্বিতীয় ক্রিয়ায় জ্যোতিদর্শন আদি অনুভূতি সহজলভ্য হয়, এবং তদ্দ্বারা মনের ও শরীরের প্রশান্তিরও সাম্যতা সাধন হয়। এই ক্রিয়ার দ্বারাও অনেক সাধক ওঁকারধ্বনি শ্রবণে সমর্থ

হন। দেহত্যাগকালে গীতায় বর্ণিত "উত্তরায়ণ" কালও এই ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে।

তৃতীয় ক্রিয়া :

তৃতীয় ক্রিয়াকে ওঁকার ক্রিয়া বলা হয়। এই ক্রিয়া দ্বিতীয় ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক উন্নত ও কঠিন; এই ক্রিয়া অনুষ্ঠানের যোগ্যতা কষ্টসাধ্য এবং দ্বিতীয় ক্রিয়ায় অনেক উন্নতি হলেই কেবল এই যোগ্যতা হয়। ওঁকারক্রিয়া নাম হয়েছে এই কারণে যে এই ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রণবধ্বনি শ্রবণ নিশ্চিত হয়। যোগীরাজ শ্যামাচরণ বলেছেন ওঁকার ক্রিয়ার লক্ষ্য ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ। ক্রিয়ার পরাবস্থা নির্বিকল্প সমাধিস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মানন্দময় অবস্থা, যেখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়—সব ভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থা থেকে সুখের অবস্থা আর নেই। ক্রিয়ার পরাবস্থাই অব্যাকৃত পরমব্রহ্ম অবস্থা। যোগীরাজ আরও বলেছেন ওঁকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আর চতুর্বেদ পাঠ এক জিনিস; পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর—যথাক্রমে ঋক, যজু ও সামবেদ এবং তিন দিক ঘুরিয়ে—দক্ষিণদিক হল অথর্ব বেদ। এর ব্যাখ্যা ভাষায় সম্ভব নয়; অনুভবগম্য। এই ক্রিয়ায় প্রাণ ও অপান বায়ু স্থির হয়ে সমান বায়ুতে অবস্থান হয়, এবং সমান বায়ুর সহায়তায় ক্রিয়ার পরাবস্থার উদয় হয়। সুষুম্না নাড়ীতেই এই তিন বায়ুর ক্রিয়া হয়।

চতুর্থ ক্রিয়া :

যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয় বলেছেন, শরীরে, হৃদয়েতে একশত নাড়ী আছে, আর পাঁচ হাজার একশত চুরাশি লক্ষ নাড়ীতে ব্যান বায়ু বিচরণ করেন এবং ইনিই সমুদয় শরীরে স্থিতরূপে থাকেন। ঐ লক্ষ লক্ষ নাড়ী প্রযুক্ত হৃদয়েতে পাঁচ হাজার একশত চুরাশি লক্ষ ইচ্ছা বা যোনীর সৃষ্টি হয়। বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয় বলেছেন উক্ত নাড়ীসমূহের মধ্যে বাহাত্তর নাড়ী প্রধান; বাহাত্তরকে বাহাত্তর দিয়ে গুণ করলে পাঁচ হাজার একশত চুরাশি হয়। পাঁচ হাজার চক্রে হাজার হাজার ওঁকার ক্রিয়া

এবং ষষ্ঠ চক্রে একশত ওঁকার ক্রিয়া করলে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণরহিত করা হবে অর্থাৎ মোক্ষ হবে। এই মোক্ষ ব্যান বায়ু প্রাণ অপান ব্যতীত হয় না। প্রাণ বায়ুর স্থান হৃদয় হতে চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ, নাসিকা পর্যন্ত, অপান বায়ুর স্থান পায়ু উপস্থ হতে হৃদয় পর্যন্ত আর উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠ।... প্রাণ ও অপানের মধ্যে আকাশ বা সমান বায়ু তার স্থান নাভি অর্থাৎ যেখানে সকল বায়ু সমানরূপে থাকে। এই সমুদয় স্থান ব্যতীত সমুদয় ব্যান বায়ু। প্রাণ, অপান, ব্যান এই ত্রিপাদ গায়ত্রী। চতুর্থ ক্রিয়া এই ব্যানবায়ু ক্রিয়া। উপর্যুক্ত (যোগীরাজের দেওয়া) বিবরণ থেকেই অনুমান হয় এই ক্রিয়া কত কঠিন। বস্তুতঃ এই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলেই ত্রিপাদ গায়ত্রীরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; সাধক সর্বজ্ঞ হন। তৃতীয় ক্রিয়ায় প্রভূত উন্নতি ও অভিজ্ঞতার পরই গুরু চতুর্থ ক্রিয়া প্রদান করে থাকেন।

প্রথম ক্রিয়ার পর থেকে চতুর্থ ক্রিয়া পর্যন্ত সমুদয় ক্রিয়া গুরু বা গুরুস্থানীয় ক্রিয়াবানের নিকট শিখতে হয়; নিজের চেষ্টায় অনুষ্ঠান করা যায় না। প্রথম ক্রিয়া অনেকেই পেয়ে থাকেন; দ্বিতীয় ক্রিয়া খেচরী মুদ্রার যোগ্যতা লাভ সাপেক্ষে অনেকেই প্রাপ্ত হন; তৃতীয় ক্রিয়ার উপযোগী হন কেউ কেউ। চতুর্থ ক্রিয়া অনুষ্ঠানকারীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প; দু-চারজন আছেন কিনা সন্দেহ। চতুর্থ ক্রিয়ার পরেও পঞ্চম ষষ্ঠ ইত্যাদি ক্রিয়া আছে সেইসব ক্রিয়া সমর্থ চতুর্থ ক্রিয়াবান সাধক নিজেই আয়ত্ত করে নিতে পারেন —কারও দ্বারা শেখাবার প্রয়োজন হয় না এবং চতুর্থ ক্রিয়ার পরিপূরকস্বরূপ

পূর্বে বলা হয়েছে যোগীরাজ ত্রিংশ ক্রিয়া অবধি নাম করেছেন। এই সকল ক্রিয়া যোগসূত্রোক্ত বিভিন্ন যোগশক্তি লাভের উপযোগী পদ্ধতি যেমন "পরকায় প্রবেশ"। যোগীরাজ একস্থানে বলেছেন গুরু সহজে এই ক্রিয়া দেন না। যাই হোক, উপর্যুক্ত চার ক্রিয়া সাধনের দ্বারা ক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য লাভ হয়।

যে কোন সাধন প্রণালী, ক্রিয়াযোগ সাধন প্রণালী তো বটেই,—নিষ্ঠার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু সময় ধরে অনুষ্ঠান করতে হয়; নতুবা সুফল লাভ দুষ্কর। এই সাধন—"দুঃসাধ্য, দুরারাধ্য, দুঃপ্রেক্ষ্য, দুরাশ্রয়, দুর্লক্ষ এবং মুনি মনীষীগণেরও দুস্তর ধ্যানের দ্বারা লভ্য হয় বলা হয়েছে। তবে

ব্রহ্ম সত্তার সৃষ্টির সুকৃত স্বরূপে মূল প্রক্রিয়া হওয়ার কারণ এই ক্রিয়া এক মাত্র পরীক্ষিত পথ। সযত্নে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিয়মিত এবং দীর্ঘদিন হলে সফলতা লাভ নিশ্চয়ই হয়।

গীতা বলছেন—"সহস্র সহস্র সাধনার্থীর মধ্যে ক্বচিৎ কেউ সাধনায় সিদ্ধিলাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সিদ্ধ সাধনার্থীর মধ্যেও ক্বচিৎ কেউ আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন।" (১) ক্রিয়াপ্রাপ্ত হয়ে ছটফট করা, তাড়াতাড়ি উন্নতির জন্য চঞ্চল হওয়া উচিত নয়। এ হল সময়, নিষ্ঠা ও প্রযত্নসাপেক্ষ।

সাধনা গভীর হলে ক্রমশঃ সৃষ্টির কারণ-শরীররূপ পঞ্চতত্ত্বের অনুভব—বা দর্শন হয়ে যায়, অনুভব হয় শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য তত্ত্বের। নিম্নে কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হল।

ক্ষিতিতত্ত্ব ঃ প্রাণবায়ু যখন নাসারন্ধ্র দিয়ে পার্শ্বস্পর্শ না করে প্রবাহিত হয়ে, নাসাগ্র থেকে বার অঙ্গুলি দূর পর্যন্ত বহে, গলায় মিষ্ট স্বাদ অনুভব হয়, কূটস্থে পীতবর্ণ দর্শনের ইচ্ছা হয় এবং কূটস্থে পীতবর্ণের চতুষ্কোণ দৃষ্ট হয় তখনই ক্ষিতিতত্ত্ব অনুভূত বলে জানতে হবে। এই ভাব প্রায় বার মিনিট পর্যন্ত থাকে।

জলতত্ত্ব ঃ গলায় কষায় স্বাদ, কূটস্থে শ্বেতবর্ণ দেখার ইচ্ছার উদ্রেক এবং কূটস্থে শ্বেতবর্ণের অর্ধচন্দ্র দর্শন যখন হয় প্রাণবায়ু নাসিকা থেকে ষোল অঙ্গুলি পর্যন্ত নিচে প্রবাহিত হয়—তখন বুঝতে হবে জলতত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে। এই অনুভূতি ষোল মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

বহ্নিতত্ত্ব ঃ বহ্নিতত্ত্বের প্রকাশের পরিচায়ক গলায় তিক্ত স্বাদের অনুভব, কূটস্থে রক্তবর্ণ দেখার ইচ্ছার উদ্রেক, কূটস্থে রক্তবর্ণের ত্রিকোণের প্রকাশ এবং প্রাণবায়ু নাসিকা থেকে চার অঙ্গুলি নিচে পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া। এই অনুভূতি চার মিনিটকাল স্থায়ী হয়।

বায়ুতত্ত্ব ঃ যখন শ্বাস নাসারন্ধ্রের পার্শ্বস্পর্শ করে নাসিকা থেকে আট

(১) মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

অঙ্গুলি দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়, গলায় অম্লরস আস্বাদনের প্রবৃত্তি হয়, এবং অম্লস্বাদ অনুভূত হয়, কূটস্থে নীলবর্ণ দেখার বাসনার উদ্রেক হয় এবং কূটস্থে নীলবর্ণের গোলক দৃষ্ট হয়—তখন বায়ুতত্ত্বের প্রকাশ সূচিত হয়। এই অনুভূতি অধিক থেকে অধিক আধ মিনিটকাল স্থায়ী হয়।

ব্যোমতত্ত্ব : ব্যোমতত্ত্ব প্রকাশের সঙ্গে শ্বাসের গতি প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়, নাসিকার মধ্যেই থেকে যায়—নাসাভ্যন্তরচারী হয়, গলায় ঝাঁঝাল স্বাদ অনুভূত হয় এবং কূটস্থে ধূসর বর্ণের পটভূমিতে নানা বর্ণের বিন্দু বিন্দু দৃষ্ট হয়। এই অনুভূতি চার মিনিটকাল স্থায়ী হয়।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন না—যদি সমুদ্রকে জানতে চাস তবে সমুদ্রকে তো বেড় নিতে পারবি না, সমুদ্রে একটি ডুব দিয়ে দে, তা হলেই সমুদ্র বিষয়ে যা জানবার জানা হয়ে যাবে। এও তাই, পঞ্চ তত্ত্বই জগৎসৃষ্টির মূল উপাদান —উক্তরূপে এই সকল তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হলেই ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সকল জানা হয়ে গেল।

কৈবল্যদর্শন অধ্যায়ে আমরা দেখেছি প্রণবধ্বনি প্রকট হয়ে ঐ ধ্বনিতে আত্মসমর্পণের প্রযত্নই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা। বস্তুতঃ এই পথই গীতা বর্ণিত কর্মযোগ। কূটস্থে আত্ম সংযম করে হৃদয় গুহায় প্রবেশ জ্ঞানযোগ—। উভয় পথই অবশ্য একই ফলদায়ক। প্রণবনাদে নিবিষ্ট হয়ে তন্ময় হলে ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হয়, কূটস্থে সংযম করলেও সেই অবস্থাই লাভ হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থাই পরব্রহ্মের আনন্দময় অবস্থা। প্রথমে এই অবস্থা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। অভ্যাসের দ্বারা এই স্থিতি বর্ধিত হয়।

পরিশিষ্ট

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় ক্রিয়াযোগ

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে দেখা গেছে যে ক্রিয়াযোগ কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না, বরং সকল ধর্মবিশ্বাসের মূলে যে ঐক্যসূত্র পরিলক্ষিত হয় সেই সূত্রই ক্রিয়া। সকল অধ্যাত্মশাস্ত্র বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্যরূপে প্রতিভাত হয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—যে কোন সম্প্রদায়ই হোক না কেন সকল অধ্যাত্ম প্রচেষ্টার মধ্যে সকল সাধক এই ঐক্যসূত্রের সন্ধান পান। প্রকৃত সাধকের মধ্যে তাই সম্প্রদায়গত একদেশদর্শিতা লক্ষিত হয় না। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শাশ্বত বাণী—"যত মত তত পথ"—সকল ধর্মপ্রেমীর মর্মকথা। ভারতে সাধক তাই উদাত্তকণ্ঠে প্রার্থনা করেন, "হে ত্রিলোকপতি হরি! শৈবরা যাঁকে শিব বলে আরাধনা করেন, বেদান্তীগণ ব্রহ্ম বলে, বৌদ্ধেরা বুদ্ধ বলে, প্রমাণকুশলী নৈয়ায়িকগণ যাঁকে কর্তা বলে, জৈন উপাসকরা অর্হৎ বলে, এবং মীমাংসকেরা কর্ম বলে যাঁর উপাসনায় রত, সেই বাঞ্ছিত ফল আমায় জ্ঞাত করাও—দান কর। (১)

বস্তুতঃ ক্রিয়াযোগ এক সাধন বিজ্ঞান। সকল হিন্দু অধ্যাত্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট মৌলিক বিজ্ঞানের উপর এই সাধন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্ম গবেষণার ফলে সৃষ্টির যে মৌলিক নীতি মহাসাধকগণের অধিগত হয় সেই নীতিই এই সাধন পদ্ধতি প্রণয়নের ভিত্তি। এই কারণেই ক্রিয়াযোগ এক সার্বভৌম, সকল সম্প্রদায়ে বিশ্বাসী সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য সাধন প্রক্রিয়া। কি শৈব, কি শক্তি, তান্ত্রিক কিংবা এমন কি খ্রীস্টীয় অথবা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণেরও এই ক্রিয়া সাধন দ্বারা আপন আপন

---

(১) "যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি, ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটব কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসনরতা কর্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্যনাথ হরিঃ

বিশ্বাসোপযোগী মতের পুষ্টিসাধন হয়। দেখা গেছে যোগীরাজ শ্যামাচরণ তথা তাঁর সমর্থ শিষ্যগণও অন্য ধর্মমতাবলম্বীকে ক্রিয়াযোগ দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেছেন,—কারুর নিজধর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়নি।

শ্রুতি, স্মৃতি আদি শাস্ত্রসম্মত জগৎ তথা জীবসৃষ্টির মৌলিক নীতি অবধারণ করে সেই পথেই—পরন্তু বিপরীতমুখী সাধন দ্বারা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মূল যে চৈতন্য পদার্থ তাঁর অনুসন্ধানে রত হওয়ার প্রক্রিয়াই ক্রিয়াযোগ তত্ত্ব। প্রকৃতি সম্ভূত শরীর, মন, প্রাণ সৃষ্টির মূল উৎসের দিকে প্রধাবিত করার ঐক্যতানতা সম্পাদন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে দেহাবয়ব, এবং দেহস্থ সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ দেহের শুদ্ধি সম্পাদনের প্রক্রিয়া ক্রিয়ার মৌলিক অঙ্গ। যথাযথ শুদ্ধি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে দেহযন্ত্র চৈতন্য প্রকাশে সক্ষম হয়। প্রক্রিয়া ঠিক ঠিক ভাবে সযত্নে অনুষ্ঠিত হলে শোধন কার্য অবশ্যই হয়। এই প্রক্রিয়ায় তাই কোন প্রকারের কল্পনা বা চিন্তার অবসর নেই। পরমহংস যোগানন্দজী দীর্ঘকাল আমেরিকায় যোগ প্রচারের সময় উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে এসেছেন যে ক্রিয়াযোগ গ্রহণের জন্য ধর্মান্তরের প্রশ্নই ওঠে না ; খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ক্রিয়াবান হলে খ্রীস্টধর্মে অধিক বিশ্বাসী এবং আস্থাবান হবেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বী হবেন পবিত্র ইসলাম ধর্মে প্রকৃত আস্থাবান। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

এই গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনায় দৃষ্ট হয়েছে যে ক্রিয়াযোগ সাধন বস্তুতঃ হিন্দুর শ্রুতি, স্মৃতি শাস্ত্রে নিহিত গূঢ়তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অব্যয়, অক্ষর, অপ্রকাশ পরব্রহ্ম হতেই ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, এবং উক্ত ব্রহ্মই স্বয়ং আপন অনিচ্ছারূপ ইচ্ছা বা ঈক্ষণ শক্তি দ্বারা "প্রজা" সৃষ্টি করেন। বেদান্তসূত্রে বলা হয়েছে—,"ঈক্ষতে নাশব্দং" ; যোগীরাজ শ্যামাচরণের ব্যাখ্যা অনুসারে ঐ "ঈক্ষণ" অ-শব্দ নয়, অর্থাৎ শব্দ। ঐ শব্দ বা নাদই প্রণব ; প্রণবধ্বনি প্রকাশিত হওয়ার দরুণই ক্রমে বিশ্বের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের প্রকাশ হয়। ঐ পরব্রহ্মের জ্ঞান বা ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় সৃজন প্রক্রিয়ার বিপরীতমুখী গতিতে অগ্রসর হওয়া। এই অগ্রগতি বস্তুতঃ প্রকৃতি সম্ভূত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে সৃষ্টির মূল তত্ত্বে উপনীত হওয়া। শাস্ত্র অর্থে যা শাসন করে বা পথ প্রদর্শন করে। যোগীরাজ শাস্ত্র

শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন—"ভাল লোকেরা যাহা জানিয়া লিখিয়া গিয়াছেন তাহাকে শাস্ত্র কহে। শাস্ত্র তখনই হইল যখন সমুদয় এক হইল। এক হইলেই সমুদায় জানা গেল অর্থাৎ ব্রহ্মযোনি হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই লয় এই ব্রহ্ম।" অন্য ভাষায় বলা যায় শাস্ত্র মহাজন-পথ।

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে ক্রিয়া এক সম্পূর্ণ বিদ্যা—; শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে অগ্রসর হওয়া "অপরাবিদ্যা" এবং ঐ পথে অগ্রগতি লাভ করে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ "পরা বিদ্যা"। ক্রিয়াযোগ প্রক্রিয়ায় এই উভয়বিধ "বিদ্যার" কার্য সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে অপরাবিদ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে পরাবিদ্যার আবির্ভাব সম্ভব নয়। অপরাবিদ্যাকে—অবিদ্যাও বলা হয়, কারণ অবিদ্যারূপ ভ্রান্তিই বিশ্ব প্রপঞ্চের ধারণা স্ফুরণের মূলে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট গুহ্য পথে অবিদ্যাজনিত সৃজনধারা অবলম্বনের দ্বারা বিপরীত মুখে বা "উজানে"—অগ্রসর হতে পারলেই অবিদ্যাপাশের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ বিদ্যার আবির্ভাব সম্ভাবিত হয়। ঈশোপনিষদে তাই ঋষি বলছেন—"অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যা দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হয়," (অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে)। এইপ্রকার বিদ্যা একমাত্র যিনি এই পথের সন্ধান জ্ঞাত—তাঁর কাছেই প্রাপ্ত হওয়া দরকার। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় ভগবান বলেছেন, "এই জ্ঞান তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীই তোমাকে উপদেশ করবেন।" ক্রিয়াযোগে এই কারণেই সদ্‌গুরু লাভের কথা বার বার বিশেষ করে বলা হয়। যিনি তত্ত্বদর্শী তিনি সদ্‌গুরু, আচার্য হবার যোগ্য বিবেচিত হন। শ্রুতিতে আচার্য তাঁকেই বলা হয়েছে যিনি "যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান"—এই তিনপ্রকার কার্যে নিযুক্ত থাকেন। যোগীরাজ এই তিন কার্যের মৌলিক অর্থ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। "যজ্ঞ" শব্দে "ক্রিয়া", "অধ্যয়ন" শব্দে ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকা এবং "দান" অর্থে ক্রিয়ার উপদেশ "দান" বুঝতে হবে। অর্থাৎ যেই সাধক ক্রিয়াবান এবং ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত একমাত্র তিনিই ক্রিয়াযোগ দীক্ষাদানের উপযুক্ত গণ্য হন।

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী কৈবল্যদর্শন গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট এবং সরল ভাষায় বলেছেন যে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ রূপ দেহত্রয়ের শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়। মানবের স্বভাবজ ঈশ্বরের প্রেম প্রসারিত ও গভীরতর হলে

শ্রদ্ধালাভ হয় এবং সদ্‌গুরু লাভ হয়ে তদ্‌প্রদর্শিত পথ অবলম্বিত হলে বীর্য-লাভ এবং আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার সাধন দ্বারা স্মৃতি ও সমাধির উদয় হয়। সেইসঙ্গে প্রণবধ্বনি প্রকাশিত হয় এবং ঐ ধ্বনিতে নিমগ্ন থাকার দ্বারাই ক্রমে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি হয়। এই সাধন প্রক্রিয়ায় কোনপ্রকার কষ্ট কল্পনার স্থান নেই। মানবের প্রকৃতি বা স্বভাবপ্রযুক্ত যেভাবে আস্তরণের পর আস্তরণ দ্বারা জীবের "স্বরূপ" আবৃত হয়ে আছে উক্ত সাধনের দ্বারাই ঐ আবরণ বা আস্তরণ ক্রমশঃ বিদূরিত ও উন্মীলিত হয়ে যায়।

যোগীরাজ বলেছেন পুরাকালে—সত্যযুগে—আপামর নরনারী ক্রিয়ান্বিত ছিলেন, পরে এই পদ্ধতি জনমানসে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফল্গুধারার ন্যায় গিরিগুহাবাসী সমর্থ মহাসাধকদের মধ্যেই এই ক্রিয়া সাধন গুপ্তভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছিল। যুগ পরিবর্তনের সময় ও সন্ধিকালে ত্রিকালদর্শী মহামুনি বাবাজী মহারাজের পূতঃ ইচ্ছায় এই ক্রিয়াযোগ সাধন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এই কার্যে যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের অবদান এবং সাংসারিক জীবের প্রতি অপার করুণা জগতের নরনারী চিরকাল অসীম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। বহু জন্মের অনভ্যাস ও অজ্ঞতার ফলে প্রথমাবস্থায় ক্রিয়াসাধন কঠোর মনে হয়। ক্রিয়াসাধনকে "দুঃসাধ্য, দুরারাধ্য, দুর্লক্ষ্য, দুরাশ্রয়" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত করে শ্রুতিতে এই সাধন প্রক্রিয়ার কঠিনতার বিষয় উক্ত হয়েছে। পরন্তু "ক্রিয়াই" একমাত্র পথ। যোগীরাজ বলেছেন, "অন্ধকারে যেমন প্রথমে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকতে থাকতে সবকিছু দৃষ্ট হয়—এই সাধনাও সেইপ্রকার।" তিনি করজোড়ে সকল নরনারীকে অনুরোধ করে গেছেন যেন সকলেই এই অমূল্য, সার্বভৌম, সর্বজনপ্রযোজ্য সাধনপথ অবলম্বন করেন। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"—

ক্রিয়াযোগ প্রসার

হিমালয়ের ক্রোড়ে রাণীক্ষেতে যোগীরাজ শ্যামাচরণ তাঁর পূর্বজন্মের গুরু শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কৃপালাভ করার সময় হতেই গুপ্ত ক্রিয়াযোগ সাধারণে—আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুসারে প্রসার লাভ করতে আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ শ্যামাচরণের আকুল প্রার্থনায় বাবাজী মহারাজ এই সাধন সংসারী নরনারীকে প্রদানের স্বীকৃতি দান করেন। বর্তমানকালে যে বহু নরনারী এই অমূল্য সাধন প্রক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন সেই সুযোগ যোগীরাজ শ্যামাচরণের দয়া ও মানবপ্রীতির ফলে।

পূর্বে বলা হয়েছে শ্যামাচরণ কেবলমাত্র নিজেই জাতি বর্ণ নির্বিশেষে উপযুক্ত বিবেচনায় এই ক্রিয়াসাধন প্রদান করে এসেছেন তা নয়, তাঁর সমর্থ ক্রিয়াযোগী শিষ্যদেরও ক্রিয়াদানের অনুমতি প্রদান করে ভারতের এই সুপ্রাচীন ও গুপ্ত বিদ্যা প্রসারের পথ সুগম করে গেছেন। স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর, আচার্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পরমহংস স্বামী প্রণবানন্দ গিরি, হংসস্বামী কেবলানন্দ (আচার্য আশুতোষ শাস্ত্রী), পরমহংস কেশবানন্দ, আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, আচার্য রামদয়াল মজুমদার, আচার্য ব্রজলাল অধিকারী প্রভৃতি অনেক সিদ্ধ ক্রিয়াযোগী বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শতসহস্র নরনারীকে ক্রিয়াযোগ দীক্ষায় দীক্ষিত করে ধন্য করেছেন।

হিমালয় গিরি কন্দর থেকে উন্মুক্ত হয়ে এই সাধন প্রক্রিয়ার প্রসারে তিনটি প্রধান ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ যোগীরাজ কঠোরতম নিগড় থেকে এই সাধনরত্ন বহির্জগতে প্রকাশ করেন ; এবং এই ধারাই তাঁর শিষ্যদের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ নিজ কৃপাগুণে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরকে দর্শন দান করে যে উপদেশ প্রদান করেন তার ফলস্বরূপ কৈবল্যদর্শনের মত অনুপম গ্রন্থ প্রণীত হয়ে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের এই গুপ্ত সাধন রহস্য প্রচারের পথ সুগম করে। তৃতীয়তঃ ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে অলৌকিকভাবে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে স্বামী

যোগানন্দের কাশীধামে মিলন হয়ে পাশ্চাত্যে ক্রিয়াযোগ প্রচারের চিহ্নি পুরুষের আবির্ভাব হয়। ক্রিয়াযোগ সাধনার আদিগুরু ত্রিকালদর্শী বাবাজ মহারাজের অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতেই যে এই তিন অভিনব ঘটনা সংঘটি হয়েছিল সামূহিকভাবে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই অনুমিত হয়।

শ্রীযুক্তেশ্বরজী উচ্চবর্ণ বংশোদ্ভব ছিলেন না; বহু উচ্চশিক্ষিত প্রোথিতযশ বিদ্বান শিষ্য তাঁর ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রিয়াযোগ প্রসার তথা তাঁ পঞ্জিকা শুদ্ধি এবং যুগ বিষয়ক নূতন আবিষ্কারের তত্ত্ব প্রচারে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার বহু গ্রামবাসী তাঁর প্রভাবের আওতায় আসে। অল্পশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত, এবং প্রায় অশিক্ষিত শত সহস্র গ্রামবাসীকে তিনি ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁর সহজ, সরল ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণে গভী অধ্যাত্ম এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান তত্ত্ব ভালভাবেই বুঝতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ক্রিয়াযোগের উন্নত শিখরেও উত্থিত হয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ খিদিরপুরের ৺অমূল্যচরণ সাঁতরা, মেদিনীপুরের ৺বিপিন ডাক্তারের না করা যায়। ক্রিয়ায় ৺অমূল্য সাঁতরা অদ্বিতীয় ছিলেন। বস্তুতঃ স্বামীজ মহারাজ একমাত্র সাঁতরা মহাশয়কে চতুর্থ ক্রিয়া প্রদান করেছিলেন; পা সাঁতরা মহাশয় দুই একজনকে এই ক্রিয়া দান করেন। ক্রিয়াযোগের প্রগা যে সমাজের সর্বস্তরে অপ্রতিহত গতিতে প্রসারিত হচ্ছিল—বিশেষ ক স্বামীজী মহারাজের মাধ্যমে এই কর্মপ্রচেষ্টা তারই প্রমাণ। তাঁর মানসপু পরমহংস যোগানন্দজীর পাশ্চাত্য দেশ অভিযান এই কর্মপ্রচেষ্টারই বিস্তৃতি স্বামীজী মহারাজের বর্ষীয়ান শিষ্য আচার্য মতিলাল মুখোপাধ্যায়েরও (স্বা সচ্চিদানন্দ) ক্রিয়াযোগ প্রচার মুখ্যতঃ হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চ নিবদ্ধ ছিল। যোগানন্দজী তো বিদেশবাসীদের মধ্যেই ক্রিয়াযোগের প্রবা ছড়িয়েছিলেন।

যোগানন্দজীকে আমেরিকায় ক্রিয়াযোগ প্রচারে কিছু কিছু অভিনব সংযোজন করতে হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় যোগানন্দজী ভারতীয় সন্ন্যাসী আদর্শে জীবনযাপন করতে থাকেন। অর্থসংগ্রহের দিকে নজরই দিতে না। যে সকল বক্তৃতাদি দিতেন শ্রোতাদের সভাস্থলে উপস্থিতির জন্য কো প্রবেশমূল্য দিতে হত না। বিনামূল্যে যে বক্তৃতা শোনা যায় সেই বক্তৃ

শোনার উপযুক্তই নয় সাধারণ আমেরিকান তাই মনে করতেন। কোন কোন ব্যক্তি ক্রিয়াযোগে দীক্ষাগ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্তের দক্ষিণাস্বরূপ ভারতীয় পাঁচটাকার স্থলে পাঁচ ডলার গ্রহণ করতেন। আমেরিকায় প্রচলিত প্রচার মাধ্যমের সুযোগ গ্রহণ করতেন না—আর্থিক সঙ্গতিও যথেষ্ট ছিল না। প্রথম দুই বৎসর তাঁকে অর্থের অনটনেই চলতে হয়। পিতৃদেব দুই বৎসর যাবৎ মাসোহারা পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। এই কর্মধারার পরিবর্তন হল এই সময়ে, অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসর পরে।

হঠাৎ অযাচিতভাবে তাঁর কার্যে যোগ দিলেন—তাঁরই জাপান যাত্রার জাহাজে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় ইসলামধর্মী ক্যাপ্টেন রসিদ। রসিদ খুব বড় বংশের সন্তান ছিলেন, এবং ইউরোপ আমেরিকা তাঁর নখদর্পণে ছিল। ঐ সকল সমৃদ্ধ দেশের শ্রেষ্ঠ সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। অত্যন্ত ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা ; পয়সা ছিলও না, পয়সার পরোয়াও রাখতেন না। তিনি সব দেখেশুনে বললেন, "স্বামীজী, আপনি এইভাবে চললে এই দেশে কিছুই করতে পারবেন না। এই দেশ প্রচারের দেশ, প্রচার ব্যয়বহুল কিন্তু এই ব্যয়বহুল পন্থাই সাফল্যের একমাত্র পথ।" মূল্যবান প্রাচীরপত্র ছাপলেন—স্বামীজীর আবক্ষ প্রতিমূর্তিসহ। প্রতি প্রাচীরপত্রের তখনকার সময়ে (ষাট বৎসর পূর্বে) খরচ পড়েছিল এক ডলার করে। স্বামীজীকে না বলেই নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত কার্নেগী প্রেক্ষাগৃহ স্বামীজীর বক্তৃতার জন্য ভাড়া করে নিলেন এবং শহরের নামকরা সব সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে সভার বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। দেখে শুনে স্বামীজী তো হতবাক। রসিদকে বললেন, "করেছ কি? টাকা পাবে কোথায়? কার্নেগী হলের ভাড়া না দিতে পারলে তো জেলে যেতে হবে!" রসিদসাহেব এই কথা গায়েই মাখেন না, বলেন "স্বামীজী! পরোয়া কি? আমরা জেলেই যোগদা সৎসঙ্গ শুরু করে দেব!" ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে যখন স্বামীজী ভারতে আগমন করেন তখন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছিলেন, "রসিদের বিশ্বাস আমার অপেক্ষাও বেশী ছিল।" সেইদিন সভাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সভাগৃহের প্রবেশমূল্যও বেশ বড় অঙ্কেই ধার্য হয়েছিল। স্বামীজীর বক্তৃতাও হয়েছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এক সভা করেই কেবল সকল খরচপত্রই উঠে

গেল তা নয়, স্বামীজীও স্বচ্ছল হয়ে গেলেন। ঐ রাত্রে প্রবেশমূল্য বাবদ আ হয়েছিল প্রায় দশ হাজার ডলার। এর পর থেকে আমেরিকার সমস্ত শহ স্বামীজী এইভাবে পরিভ্রমণ ও বক্তৃতাদি করেছেন এবং অর্থ সংগ্রহও হয়ে প্রচুর। একবার যখন আমেরিকার দক্ষিণপ্রদেশে মাইয়েমি (Miami) ে যান—একই প্রেক্ষাগৃহে পর পর কয়েকদিন বক্তৃতা করতে হয়েছিল ; সভা তো স্থান সঙ্কুলান হতই না—পার্শ্বের রাস্তায়ও লোকে লোকারণ্য আমেরিকার ঐ প্রদেশে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের মধ্যে বৈষম্য প্রখর। একজ কৃষ্ণকায় ধর্মযাজক এসে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কতিপয় শ্বেতকা ধর্মযাজকের সহ্য হল না। তাঁরা ষড়যন্ত্র করে বর্ণ বৈষম্য প্রচার করছেন বে স্বামীজীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের অভিযোগ করেন। আসামী কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী যখন হাকিমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর সেই তেজোদৃপ্ত দৃষ্টি হাকিম সহ্য করতে না পেরে বলে ওঠেন—"দৃ সরিয়ে নিন" (Away with that)। যাই হোক মামলায় সসম্মা স্বামীজী খালাস পান। এর পর তাঁর খ্যাতি আমেরিকার প্রদেশে প্রদে আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ক্রিয়া দীক্ষা দান করতে গিয়ে যোগানন্দজী লক্ষ্য করলেন বিশেষ আগ্রহ থাকলেও বহু আমেরিকাবাসীর কিছু স্বাভাবিক অক্ষমতা বর্তমান। প্রথমতঃ অনেকেই পদ্মাসন করে বসতে পারেন না। তাঁদের অসুবিধার জন্য স্বামীজী নির্দেশ দিলেন পদ্মাসনে উপবিষ্ট হতে না পারলে হাতবিহীন সোজা-পেছন এমন চেয়ারে শিরদাঁড়া সোজা করে উপবেশন করে ক্রিয়াভ্যাস করতে পারেন। মহামুদ্রার পরিবর্তে বললেন ক্রিয়াভ্যাসের পূর্বে "যোগদাব্যায়াম" করে নিতে। এই যোগদা ব্যায়াম ভারতে থাকতেই স্বামীজী উদ্ভাবন করেছিলেন এবং রাঁচী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সকলকে প্রার্থনায় বসার পূর্বে এই ব্যায়াম অভ্যাস করে নিতে হত। এই ব্যায়ামেব দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গের পেশীসমূহ শিথিল হয়ে যায় এবং ক্রিয়াভ্যাসের সময় বেশ আরাম বোধ হয়। কচিৎ কেউ পদ্মাসন করতে পারলেও অধিকাংশ চেয়ারে বসেই অভ্যাস করে থাকেন। অপর অসুবিধা খেচরীমুদ্রা প্রক্রিয়ার অক্ষমতা। খেচরীমুদ্রা না করেই তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্রিয়ার অপর অঙ্গ অভ্যাসের

অনুমতি দেন। উচ্চ ক্রিয়াবানরা সকলেই জানেন খেচরী ব্যতীত উচ্চ ক্রিয়া করা যায় না। যাই হোক, একটি প্রক্রিয়া স্বামীজী প্রচলিত করেছেন সেটা হল যোনিমুদ্রার অংশবিশেষ যদ্দ্বারা ওঁকারধ্বনি শ্রুত হয়। বহু আমেরিকান ক্রিয়ান্বিত এই প্রক্রিয়া দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। লস এঞ্জেলস শহরে যোগদা সৎসঙ্গের প্রধান কার্যালয় স্থায়ী ভবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রক্রিয়ার সহায়ক এক যন্ত্রও উদ্ভাবন করেছিলেন যার নাম দিয়েছিলেন—"শান্তিমন্দির" (Temple of silence)। ইস্পাতের একটি গোলাকার পাত স্প্রিংএর মত; শেষ অন্ত দুটি মুখোমুখি এবং ঐ মুখে গোলাকার ছোট দুটি রবারের বল লাগান। বল লাগান অন্তদুটি কানে লাগিয়ে বাইরের শব্দ বন্ধ করে দিয়ে অন্তরে নাদ শ্রবণের চেষ্টাই এই প্রক্রিয়া। আমেরিকার প্রখ্যাত "ক্রিশ্চান সাইন্স" আন্দোলনের অনুকরণে প্রধান কেন্দ্র থেকে ডাকযোগে ক্রিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এছাড়া শতসহস্র নরনারী ডাকযোগে এই শিক্ষার পুস্তিকা ক্রয় করেন। এই পদ্ধতিতে অর্থাগমও প্রচুর হয় প্রচারও হয় বহুল। স্বামীজী যখন ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আসেন তখন বলেছিলেন আমেরিকায় তাঁর ছাত্র-শিষ্য সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ইলিনিয়স (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক হিন্দুত্বের "আমেরিকা অভিযান" শীর্ষক এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের প্রথম পংক্তিতেই বলা হয়েছে "আমেরিকায় প্রায় পাঁচশত স্বামী এবং পাঁচশত বিভিন্ন মতবাদ" প্রচার করছেন। "স্বামী" শব্দে হিন্দু ধর্মযাজককে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুস্তকের উদ্দেশ্য অবশ্য স্বদেশবাসীকে সতর্ক করা যে হিন্দু "স্বামীরা" যা প্রচার করেছেন তাতে মুগ্ধ না হওয়া। পুস্তকের প্রথম অধ্যায় স্বভাবতই স্বামী বিবেকানন্দের "বেদান্ত মিশন" বিষয়ে লিখিত। দ্বিতীয় এবং বৃহত্তম অধ্যায় স্বামী যোগানন্দ ও তাঁর যোগদা সৎসঙ্গ বিষয়ে। অধ্যাপকোচিত বিশ্লেষণের শেষে লেখক বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ যে "সন্দেশ" (Message) আমেরিকায় দিয়ে গেছেন তদপেক্ষা অনেক বড় সন্দেশ আমেরিকা থেকে ভারতে নিয়ে গেছেন। যোগানন্দজী সম্বন্ধে পুস্তকে তাঁর উদারতা ও কর্মধারার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। অবশেষে মন্তব্য করা হয়েছে "যোগানন্দজী আমেরিকাবাসীর জীবন-

ধারায় সম্পূর্ণরূপে ঝাঁপ দিয়েছেন, কি জানি শেষমেষ তাঁর বাণীও বদলে ন যায়।" পুস্তকের বিবরণ থেকে আমেরিকায় স্বামী যোগানন্দের প্রচারকার্যে সাফল্যের প্রমাণ পাওয়া যায় এই এক আমেরিকান বুদ্ধিজীবীর লেখনী থেকে

প্রশ্ন ওঠে যোগ প্রচারে সত্যকারের সফলতা কি তাঁর লাভ হয়েছিল আমেরিকার জমিতে ক্রিয়াযোগ বীজ কি যথার্থরূপে বপন হয়েছিল ? এ প্রশ্নের জবাব সহজ নয়। তবে তাঁর প্রচারকার্য যে অসফল হয়নি, ক্রিয়া বীজ যে সত্য সত্যই উপ্ত হয়েছিল তার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়—যদ্যপি ক্রিয়াযোগ প্রসার ব্যাপারে কিছু অভিনবত্ব তাঁকে সংযোজন করতে হয়েছিল। একটি উদাহরণ দিলেই এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকের কথা। একদিন সায়াহ্নে যোগানন্দজী আশ্র থেকে বাইরে বেরুচ্ছিলেন। তখন তাঁর অধিকারে মোট ছখানি বাষ্পযান তন্মধ্যে দুখানি প্রমোদভ্রমণোপযোগী হাউস কার (House car)। বেরুবা মুখে এক সেক্রেটারী সামনে ইলেকট্রিক অফিস প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরেন। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে যে যদি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বিদ্যুতের খরচ বাবদ এক হাজার ডলার দেওয়া না হয় তবে আশ্রমে বিদ্যু সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেক্রেটারী আরও জানান যে ব্যাঙ্কে সঞ্চি তহবিল শূন্য। ক্ষণজন্মা ভাগ্যের দুলাল যোগানন্দজী এই সংবাদে বিচলি হয়ে পড়েন। কারুকে কিছু না বলে একটি হাউসকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং প্রায় পনের মাইল দূরে অবস্থিত মরুপ্রান্তরে উপস্থিত হন। প গাড়ী ছেড়ে মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে বালুক রাশির উপরই বসে পড়েন এবং হৃদয়ের যত আকুলতা ভগবতী (Divin Mother)-র উদ্দেশ্যে উৎসারিত করতে থাকেন। মনে মনে বলেন, "আমি তো সন্ন্যাসী, এইসকল বৈভব সম্পদ তো আমি চাইনি। আমাকে এই স দেওয়া কেন, আবার এইরকম ঘূর্ণীচক্রে ফেলা কেন ?" এইভাবে অধিক রাত্রি পর্যন্ত অন্তরের বিলাপের পর আশ্চর্যজনক ভাবে হঠাৎ শুনতে পান, "মাভৈঃ মাভৈঃ !" জনমানবশূন্য মরুপ্রান্তরে কোথা হতে এই আওয়াজ আসতে পারে ! মনে মনে ভরসা পান যে তাঁর অন্তরের ক্রন্দনের সাড়া পাওয়া গেছে। নিঃশব্দে উঠে এসে গাড়ীতে চড়ে আশ্রমে ফিরে আসেন এবং আশ্রমের কারও

ঙ্গে কোন কথা না বলে নিজের শয়নকক্ষে চলে যান। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান তাঁর অভাব দূর করে দেবেন। দিন দুই পরে দেখতে পান এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি একটি মোটা অংকের চেক স্বামীজীর নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন এক নির্দিষ্ট দিনে তিনি আশ্রম দর্শনে আসবেন। নির্দিষ্ট দিনে স্বামীজী ধ্যানমগ্ন হয়ে আশ্রমের মন্দির প্রকোষ্ঠে বসে আছেন —আশ্রমবাসীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যদি কোন ব্যক্তি তাঁর দর্শনার্থী হয়ে আসেন তবে যেন তাঁকে মন্দির প্রকোষ্ঠে নিয়ে আসা হয়। যথা সময়ে টাকা প্রেরক ভদ্রলোক উপস্থিত হন এবং মন্দির প্রকোষ্ঠে পা ফেলার সময় মন্দির বেদীতে রক্ষিত যোগীরাজ লাহিড়ী বাবার মূর্তির উপর নজর পড়তেই বিস্মিত হয়ে বলে ওঠেন, এই সাধুই তাঁকে স্বপ্নে টাকা পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ভদ্রলোকের নাম ছিল মিঃ লীন। বিখ্যাত ধনী। আমেরিকার বীমা জগতের মুকুটহীন সম্রাট স্বরূপ।

কিছুকাল যাবৎ লীন দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ উভয়ে পৃথক ভাবে বসবাস করছিলেন। লীন সাহেব সেইজন্য মর্মবেদনায় পীড়িত ছিলেন। এইরকম সময়—স্বামীজী যেদিন মরুভূমিতে আকুল মর্মব্যথা মা ভগবতীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছিলেন—সেইদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন এক ভারতীয় সাধু তাকে বলছেন স্বামী যোগানন্দকে যেন অর্থ সাহায্য পাঠান। লীন সাহেবের এইসব ব্যাপারে বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। ঘুম ভাঙার পর ভাবতে লাগেন ... করেন। টাকার তো প্রাচুর্য ছিলই, তদুপরি পারিবারিক অশান্তিতে মনও ভারাক্রান্ত ছিল। স্থির করলেন স্বপ্নে সাধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু অর্থ সাহায্য পাঠাবেন। পূর্বোল্লিখিত চেক পাঠানোর এই হল পটভূমিকা।

স্বামীজী বলেছিলেন, "লীন মন্দির প্রকোষ্ঠে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সমস্ত প্রকোষ্ঠ নীল হয়ে গেছে, তখনই আমি লীনকে ক্রিয়া দিয়েছি।" ঐ দিন লীনকে বিধিমত ক্রিয়াযোগ দীক্ষাদান করেন। প্রথম দিনেই, প্রথম আসনেই লীন প্রায় দুই ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসেছিলেন। নিজ বাসস্থানে ফিরে গিয়েও সব সময় ক্রিয়াভ্যাসে মগ্ন থাকতেন। আশ্রমে এসেও সোজা মন্দির প্রকোষ্ঠে চলে যেতেন এবং নিজের ধ্যান, প্রার্থনা সাঙ্গ করে চলে যেতেন। অনেকদিন তাঁকে অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন করার সুযোগ হত না।

এরপর থেকে লীন আশ্রমকে কত টাকা অর্থ সাহায্য করেছেন তার হিসাব রাখ কঠিন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী যখন ভারতে আগমন করেন, সঙ্গে বর্তমা দয়ামাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রিচার্ড রাইট (ডিক্) এবং ভগিনী বেটিও ছিলেন লীন ১৯৩৫ মডেলের একটি ফোর্ড টুরিস্ট গাড়ী ক্রয় করেন, গাড়ী নিয়ে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করার যাবতীয় খরচ, স্বামীজী ও তাঁর দুই সঙ্গীর যাবতীয় খরচ, গাড়ী মেরামতাদির যত প্রকার খরচের প্রয়োজন হতে পারে সমুদায় অর্থ লীন সাহেবই দেন। স্বামীজী যখন রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উদ্যান সহ প্রাসাদ কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর কাছে ক্রয় করেন সেই সমুদায় অর্থ লীন মুক্তহস্তে দান করেন। লীন ক্রিয়াযোগে কিরকম উন্নত ছিলেন তার এক নিদর্শন লেখক এই সময় প্রাপ্ত হন।

লেখক স্বামী যোগানন্দের ভারতভ্রমণ সময়ে তাঁর অবৈতনিক সেক্রেটারী ছিলেন। একদিন এক পত্রগুচ্ছ স্বামীজীর নামে এসেছে, স্বামীজী পত্রগুচ্ছ হাতে নিয়ে বেছে হাতে লেখা খামের একটি চিঠি যত্ন সহকারে তুলে নেন এবং পত্রটি পড়তে আরম্ভ করেন। পত্রটও সম্পূর্ণ নিজ হস্তে লেখা। এক সময় আনন্দে স্বামীজী প্রায় লাফিয়ে ওঠেন এবং চিঠিটিকে বার বার চুম্বন করতে থাকেন এবং বলেন, "এই বেটা পূর্ব জন্মে নিশ্চয়ই ভারতীয় যোগী ছিল।" স্বামীজী চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ লেখককে পড়তে দেন। লেখা ছিল, "......আমার কলম থেমে গেল......চতুর্দিকে কেবল জ্যোতি আর জ্যোতি.........।" পত্রের লেখক স্বয়ং লীন। এমন গভীর শ্রদ্ধা ও নিবিষ্টভাবে পত্র লিখেছিলেন যে তিনি "জ্যোতি" দর্শন লাভ করেন। যোগের এ এক উন্নত অবস্থার পরিচায়ক।

স্বামীজী যখন আমেরিকা প্রত্যাবর্তন করেন লীন সাহেব তাঁকে অবাক করে দেবার মানসে—তাঁকে পূর্বাহ্নে কিছু না জানিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এনসিনিটাস নামক স্থানে তিনটি বৃহৎ প্রকৃত স্বর্ণের পাত দিয়ে মোড়া পদ্মফুল সমন্বিত এক মনোরম অট্টালিকা স্বামীজীকে উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন। আমেরিকায় সেই বৎসর যত মনোরম অট্টালিকা প্রস্তুত হয়েছিল তার মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। স্বামীজী আদর করে লীনকে সাধু লীন "সেইণ্ট লীন" নামে অভিহিত করতেন।

্রদিন পরে সেইণ্ট লীন স্থায়ীভাবে আশ্রমবাসী হয়ে যান এবং স্বামীজী কে সন্ন্যাস দান করে রাজর্ষি জনকানন্দ নামে ভূষিত করেন। স্বামীজী হত্যাগের পূর্বে উইল করে গিয়েছিলেন তাঁর অবর্তমানে বিশ্বব্যাপী যোগদা সঙ্গ প্র তষ্ঠানের কর্ণধার হবেন রাজর্ষি জনকানন্দ, এবং তাঁর পরে হবেন গনী দয়া। স্বামীজীর তিরোধনের পর যে স্মৃতি পূজার অনুষ্ঠান হয় জর্ষি জনকানন্দ ঘোষণা করেন, "আমাদের সঙ্ঘের চিরকালের একমাত্র গুরু রমহংস যোগানন্দ। অন্য কেউ গুরু হবেন না।"

দ্বিতীয় উদাহরণ বলা যায় যোগদা সৎসঙ্গের বর্তমান অধিনায়িকা দয়া াতা। রাইট পরিবারের কন্যা স্বামীজীর নিজস্ব সচিবের কাজ করতেন। ান তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতা এবং ভ্রাতা ডিক্ সকলেই প্রায় আশ্রমে তিপালিত। এঁর নাম ছিল কুমারী ফে রাইট। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কর্মকুশলী ং স্বামীজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তিশীলা। স্বামীজী তাঁকে স্থায়ীভাবে শ্রমবাসিনী করে "ভগিনী দয়া" নাম দান করেন। রাজর্ষি জনকানন্দের হত্যাগের পর যোগদা সৎসঙ্গের কর্ণধার হয়ে তিনি যখন ভারতে আসেন ৎকেলিক পুরী গোবর্ধন মঠের উদারপ্রকৃতি শংকরাচার্য মহারাজকে নুরোধ ও যুক্তিদ্বারা তাঁকে সন্ন্যাসিনী ব্রত দান করতে রাজী করান। সেই বধি তাঁর নূতন নাম হয় "দয়ামাতা।" ইনিও ভালো ক্রিয়াবান। সর্বাপেক্ষা ল্লেখ্য যে, স্বামীজীর আমেরিকাবাসী সকল ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ালোবাসায় স্বামীজীকে আপন করে নিয়েছে। স্বামীজীর খুল্লতাত পুত্র এবং াগদা সৎসঙ্গের সহ-সভাপতি ৺প্রভাসচন্দ্র ঘোষ আমেরিকা ঘুরে এসে লছিলেন, "স্বামীজীকে কিভাবে দেবতার মতো ভক্তি, ভালোবাসা, যত্ন ও দ্ধায় তাঁরা রাখেন, না দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না।"

এক কথায় বলা যায় স্বামীজীর আমেরিকায় ক্রিয়াযোগ প্রদান বিফল নি; শিকড় নিশ্চয়ই গেড়েছে তবে স্বামীজীর অধ্যাত্মজ্যোতি সম্বলিত ক্তিত্বের অনুপস্থিতিতে প্রয়োজন ক্রিয়াযোগ বিষয়ে শাস্ত্রগত তথ্যের গতি এবং অনুশীলন। স্বামীজী তো শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের ক্রীড়নক ত্র ছিলেন। সুতরাং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে না। জমি তৈরী হয়ে আছে। গুরুপরম্পরায় নিশ্চয় কোন শক্তিশালী ভক্তের আবির্ভাব সময়ে নিশ্চয়ই

মহামুনি বাবাজী মহারাজ

ক্রিয়াযোগের আদিগুরু যোগীরাজ শ্যামাচরণের জন্মজন্মান্তরের গুরু বাবাজী মহারাজ এক অতি দুর্জ্ঞেয় এবং অলৌকিক মহাপুরুষ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কে ছিলেন, তাঁর কি নাম ছিল কেউ জানতে পারেননি। যোগীরাজ তাঁকে বাবাজী কিংবা বাবাজী মহারাজ বলেই অভিহিত করতেন। যোগীরাজের উন্নত শিষ্যেরাও তাঁকে বাবাজী নামেই চিহ্নিত করে এসেছেন। এ আধজন লেখক তাঁর নাম ত্রৈম্বক বাবা, মনোহর বাবা, শিব বাবা ইত্যাদি নামে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই। বর্তমানে হৈরাখান বাবা নামীয় এক মহাত্মাকে বাবাজী মহারাজ বলে প্রচার করা চেষ্টা চলেছে। পরমহংস যোগানন্দজী প্রণীত "এক যোগীর আত্মজীবনী (Autobiography of a Yogi)" প্রকাশিত হওয়ার পর যোগীরাজ শ্যামাচরণ তথা বাবাজী মহারাজের নাম সারা জগতে প্রচারিত হয়ে যায় তার ফলে সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির বাবাজী সাজার প্রলোভন হও অসম্ভব নয়। এইরূপ প্রচারের সঙ্গে বিদেশী লোকের আগ্রহাতিশয্য এ সন্দেহকে আরও দৃঢ় করতে সহায়তা করে। যাই হোক এই সকল হা অপপ্রচেষ্টায় আকৃষ্ট না হওয়াই উচিত। ভগবদ্‌কল্প অতিমানব বাবাজী মহারাজ ভক্তজনের চিরদিনের "বাবাজী"—মহামুনি বাবাজী মহারাজ। অ কোন নামে চিহ্নিত হতে পারেন না।

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী মহারাজের বাসগৃহে একমাত্র গুরু লাহিড়ী মহাশয়ে প্রতিকৃতি ব্যতিরেকে অন্য কোন মহাপুরুষ তথা অপর কোন ব্যক্তির কো ছবি থাকত না। ঠাকুর লাহিড়ী বাবার ছবিটিও বেশ ছোট ছিল। ছবিটি নীচে ছাপা অক্ষরে "শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী" নামের পূর্ব হস্তাক্ষরে "মুনিবর কথাটি লেখা ছিল। এই লেখা লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ আচার্য স্বা সত্যানন্দজী প্রথম বাবাজী মহারাজকে "মহামুনি বাবাজী" নামে লিখতে শুরু করেন। যোগানন্দজী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে যখন ভারতে আসেন তখ

ক্ত ও গুণগ্রাহীদের সমারোহে ভাষণ দানের পূর্বে "পরমব্রহ্ম পরমাত্মা" াকে শুরু করে বাবাজী মহারাজ ও গুরু পরম্পরা স্মরণ করে বক্তব্য আরম্ভ রতেন। এই প্রথাকে চির আচরণের উদ্দেশ্যে সত্যানন্দজী সভার পূর্বে াত্রের মত পাঠের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ছন্দায়িত প্রার্থনা গীত রচনা করেন।

"পরব্রহ্ম পরমাত্মা পূর্ণ ভগবান।
মহামুনি বাবাজী শ্রীশ্যামাচরণ;
শ্রীযুক্তেশ্বর স্বামী গুরু কর্ণধার।
প্রণমি তোমা সবে করুণা আধার॥"

সত্যানন্দজীর উল্লিখিত প্রার্থনা গীতিতে উক্ত "মহামুনি" আখ্যাই এই ন্থে অনুসৃত হয়েছে।

যোগীরাজ শ্যামাচরণের দীক্ষা প্রাপ্তির কাল হতেই প্রচার হয়ে আসছে বাজী মহারাজ বহুশত বৎসর আয়ুবিশিষ্ট। এও প্রচারিত হয়েছে যে বাজী মহারাজ কয়েকবার কায়কল্প প্রক্রিয়া সাধন করে দেহস্থ আছেন। াযোগী মহাপুরুষগণের এই প্রকার শত শত বৎসর জীবিত থাকার স্বীকৃতি াস্ত্রসম্মত; যদিও কোন মহাপুরুষের পক্ষে এত দীর্ঘকাল সশরীরে বর্তমান কার নজীর পাওয়া যায়নি। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে যোগীরাজ শ্যামাচরণের সঙ্গে থম মিলন হওয়ার ৮০।৯০ বৎসর পরেও বাবাজী মহারাজ কোন কোন াগ্যবান ক্রিয়া সাধককে দর্শন দান করে কৃতার্থ করার ঘটনাও জানা গেছে। । সকল তথ্য এ যাবৎ হস্তগত হয়েছে তদ্দারা অনুমান করা যায় বাবাজী হারাজ এখনও দেহস্থ আছেন, এবং বর্তমানে তাঁর বয়স ৫০০ বৎসরের মত। ার বয়স সম্বন্ধে যেমন, তিনি দেখতে কি রকম ছিলেন সে বিষয়েও বিভিন্ন তবাদ প্রচলিত। বলা বাহুল্য তাঁর এক প্রতিকৃতিও প্রকাশ করা হয়ে াছে। এই বিষয়ে অবশ্য গ্রন্থকারের কিছু তথ্য ব্যক্তিগত ভাবে জানা আছে, াগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল নরনারীর অবগতির নিমিত্ত নিম্নে কিছু নিবেদিত হচ্ছে।

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে যে স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্তেশ্বরজী অন্ততঃ ার বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভ করেছিলেন। একবার ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে য়াগক্ষেত্রে কুম্ভমেলায়, এবং দ্বিতীয়বার কৈবল্যদর্শন গ্রন্থ রচিত হওয়ার ক্ষণ পরে শ্রীরামপুরে গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাটে।—তখন ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ,

গ্রন্থকার বি-এস্-সি শ্রেণীর ছাত্র এবং রাঁচী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রাক্ত
ছাত্রসমিতি পরিচালিত কলিকাতাস্থ ছাত্রাবাসের পরিচালক। রাজা রা
মোহন রায় রোডে অবস্থিত সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভার ভাড়া করা এ
অংশে ছাত্রাবাসটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদিন দ্বি-প্রহরে হঠাৎ স্বামীজী মহারা
পূর্বে কোন খবর না দিয়েই ঐ ছাত্রাবাসে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যে এসে হাজি
হন। অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রীগুরুর দর্শন লাভে গ্রন্থকারের আনন্দের সীম
নেই; বেশ কিছু সময় বিশ্রামের পর গ্রন্থকারকে বলেন, "চল, একবা
গড়পার রোড়ে গোরার সঙ্গে দেখা করে আসি।" পরমহংস যোগানন্দে
তৃতীয় ভ্রাতা সনন্দলাল ঘোষের ডাক নাম ছিল "গোরা"; তিনি একজ
প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। রামমোহন রায় রোড হতে গড়পার রোডে
ব্যবধান অল্পই; সনন্দলালের পৈতৃক নিবাস ৪নং গড়পার রোড অনতিদূরে
অবস্থিত। যোগানন্দজীর পিতা ভগবতীচরণ ঘোষ তখনও জীবিত। বাড়ী
সম্মুখেই ফুটপাতে সনন্দলালের সঙ্গে স্বামীজী মহারাজের দেখা হয়
সনন্দলাল স্বামীজী মহারাজকে বাড়ির মধ্যে যাওয়ার অনুরোধ করলে
মহারাজজী বলেন "তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি, এখানে দাঁড়িয়ে
কথা হয়ে যাবে। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে এবং সেটা তুমি ঠিক
পারবে। লাহিড়ী মশাইএর যে ছবি আছে ঠিক অবিকল সেইরকম একটা
ছবি আঁকবে, তবে দাঁড় করিয়ে দেখাতে হবে, পরিধানের কাপড়টা উত্ত
ভারতীয় রাখালদের মত কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাত্র নামবে, ধুতির খুঁটা
বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে ডান হাতের নীচ দিয়ে গিয়ে বাঁ হাতের উপ
রক্ষিত হবে এবং বাঁ হাতটা কনুইএর কাছ থেকে অর্ধেক তোলা থাকবে
মুখের অবয়ব যেন কম বয়স দেখতে হয়, চুলগুলিও পেছন দিকে রাখালদে
মত একটু বড় এবং ঝুলে থাকবে। ঠিক যে রকম উত্তর ভারতীয় রাখালদে
হয়ে থাকে। ব্যস্—এই মাত্র। তুমি ঠিক পারবে। এই রকম একটি ছ
আমাকে করে দাও।" বিবরণ শুনে সনন্দলাল করজোড়ে নিবেদন ক
"স্বামীজী! আমার বড় ভয় হচ্ছে; শেষকালে কি আঁকতে কাকে এঁ
বসব! আমার দ্বারা এ সম্ভব হবে না। বড় ভয় হচ্ছে।" স্বামীজী মহারাজ এ
আপত্তি শুনে বলেন, "তুমি ঠিক পারবে; আমি বলছি তুমি পারবে।" ব

াহুল্য স্বামীজী মহারাজ মহামুনি বাবাজী মহারাজের এক প্রতিকৃতি অঙ্কনের ন্য সনন্দলালকে বোঝাচ্ছিলেন। এই কথোপকথনের সর্বক্ষণ গ্রন্থকার পস্থিত ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সনন্দলাল এই প্রতিকৃতি অঙ্কনের ভরসা ানেনি।

দ্বিতীয় তথ্য ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে যোগানন্দজীর ভারত আগমনের অল্প দিন রের ঘটনা। ঐ সময় ভারত ভ্রমণের সময়ে যোগানন্দজী ভারতীয় সাধু হাত্মাগণের জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন—তাঁর ভবিষ্যতে কাশিতব্য "এক যোগীর আত্মজীবনী" পুস্তকের জন্য। বাবাজী মহারাজকে তনি দেখেননি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সম্ভাব্য সকল তথ্য সংগ্রহে অত্যন্ত আগ্রহী লেন। একদিন খবর পাওয়া যায় যোগীরাজের অপর এক শিষ্য আচার্য পেন্দ্রনাথ সান্যাল কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন, এবং তাঁর এক ষ্য, তখনকার কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অরুণ মুখার্জীর বাড়ীতে বস্থান করছেন। পরদিন সকালে গ্রন্থকারকে সঙ্গে করে স্বামীজী ডাঃ রুণ মুখার্জীর বাড়ীতে আসেন। বেথুন কলেজের ঠিক পশ্চিমধার দিয়ে যে াস্তা উত্তর দক্ষিণে লম্বমান সেই রাস্তার উপরেই ডাঃ মুখার্জীর বাড়ী ছিল। াতলায় ছোট বসার ঘর ; এবং তৎসংলগ্ন ঠাকুরঘর। স্বামীজী গ্রন্থকারকে সঙ্গে রে যখন বসার ঘরে উপস্থিত হন সান্যাল মশাই তখন আহ্নিক ঘরে পূজায় ত। কম্বলের আসনে উপবেশন করে অল্পকাল অপেক্ষা করার পরই ঠাকুর-র থেকে আচার্য সান্যাল মশাই নির্গত হন। সুন্দর দুধে-আলতা রংএর রীরের বর্ণ, সৌম্যমূর্তি, সদ্য ধ্যানোত্থিত উজ্জ্বল সজল চক্ষু সান্যাল মহাশয় কোন দর্শকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করতেন। তাঁকে অভিবাদন করার সকলকে সামান্য জলপান দেওয়া হয় ; এবং খেতে খেতেই স্বামীজী জ্ঞাসা করেন, "আপনি কি বাবাজী মহারাজকে দেখেছেন ?" তিনি বাব দেন, "আমি নিজে বাবাজী মহারাজকে দেখিনি, তবে শুনেছি তিনি ক লাহিড়ী মশাইএর মত দেখতে ছিলেন। ক্রিয়ায় বেশ উন্নত হলে চেহারাও রকম হয়ে যায় শুনেছি।" স্বামীজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, "বাবাজী হারাজ কি এখনও দেহস্থ আছেন ?" স্মিতহাস্যে আচার্যজী উত্তর করেন, শুনেছি সাইবেরিয়ার উত্তর প্রান্তে কোন স্থানে ঠিক লাহিড়ী মশাইএর মত

দেখতে এক মহাত্মা আছেন।"—সান্যাল মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে লাহিড়ী মশাইএর পরিবারের বহুকালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—কেবল ক্রিয়াযোগ বিষয়ে নয়। লাহিড়ী মশাইএর প্রতি সান্যাল মশাইএর ভক্তি প্রজ্বলিত। বস্তু তাঁর এক কন্যার সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের এক পৌত্র—দ্বিতীয় পুত্র দুকা লাহিড়ী মশাইএর মধ্যম পুত্র পরমানন্দজীর সঙ্গে বিবাহ দেন। সুতরাং তাঁ অভিমতের ভিন্ন মূল্য আছে।

উল্লিখিত দুই বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাবাজী মহারাজ ঠিক যোগীরা লাহিড়ী মশাইএর মত দেখতে ছিলেন; তবে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর মতে বাবা মহারাজকে দেখতে ঐরকম মনে হলেও অনেক কম বয়সের মনে হত।

তৃতীয় তথ্যও যোগীরাজের আর এক সমর্থ শিষ্য পরমহংস স্বা প্রণবানন্দগিরি মহারাজ কথিত। এই তথ্য তাঁর প্রধান শিষ্য ৺জ্ঞানেন্দ্রনা মুখার্জী প্রকাশিত এবং তাঁরই দেওয়া ব্যাখ্যা সম্বলিত "প্রণবগীতার" ভূমিকা প্রদত্ত বিবরণী হতে প্রাপ্ত। এই বিবরণীতে পরমহংসজীর বাবাজী মহারাজে দর্শন এবং উভয়ের কথোপকথনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। "প্রণ গীতা" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে এবং উক্ত দর্শন হয় যোগীরাজে জীবিতাবস্থায় সম্ভবতঃ বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথম দিকে কোন সময়ে। ঘটনার পটভূমি নিম্নরূপ ঃ

একদিন যোগীরাজ শ্যামাচরণ শিষ্য প্রণবানন্দজীকে তাঁর গৃহে মধ্যা প্রসাদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান ও সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন যে ঐ সময়ে হয় বাবাজী মহারাজের দর্শন লাভও হতে পারে। প্রণবানন্দজী পরম শ্রদ্ধা আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এবং নির্দিষ্ট দিন মধ্যাহ্নের বহু পূর্বে গুরুগৃহে উপস্থিত হন। শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করার পর মাতাজীর সঙ্গে দেখা করে আসেন, এবং গুরুশিষ্য উভয়ে যোগীরাজের বসার ঘরে ব আলাপ করছিলেন। এক সময় লাহিড়ী মহাশয় শশব্যস্তে উঠে সম্মু গৃহ প্রাঙ্গণে এসে এক উত্তর ভারতীয় রাখালের বেশে এক যুবক আগন্তুকে পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। প্রণবানন্দজী শ্রীগুরুর পশ্চাৎ পশ্চা প্রাঙ্গণে এসে এই ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হয়ে যান। আপন শক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুকে এক সাধারণ রাখাল যুবকের প্রতি এই প্রকার ভা

প্রদর্শন করতে দেখে প্রণবানন্দজী বিস্মিত হন। অনতিবিলম্বে গুরুদেব গাত্রোত্থান করে শিষ্যকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, "প্রণবানন্দ! প্রণাম কর, ইনিই আমার গুরু বাবাজী!" শোনা মাত্র প্রণবানন্দজীও পরমগুরুর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। অতঃপর শিষ্য, গুরু, পরমগুরু তিন পুরুষের তিন মহাত্মা গৃহে প্রবেশ করেন। প্রণবানন্দজী পরমগুরুর সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করেন, এবং সোজাসুজি দু-একটা প্রশ্ন করেন। বাবাজী মহারাজও সেইসব প্রশ্নের জবাব দেন। প্রণবগীতায় প্রাপ্ত ঐ প্রশ্নোত্তরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

প্রঃ বর্তমানে আপনার বয়স কত?

উঃ সাধারণতঃ মানুষের আয়ুর পরিধি একশত কুড়ি (১২০) বৎসর; কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করলে—কায়কল্প দ্বারা এই আয়ু বর্ধিত করতে পারে। আমি তিনবার কায়কল্প করেছি, এবং বর্তমানে চতুর্থ কল্পের অর্ধেকের বেশী হয়ে গেছে।

প্রঃ আপনি কতকাল আর এই দেহে থাকবেন?

উঃ আরও কিছুকাল এই দেহ রাখব ভাবছি, কারণ কতগুলি জরুরি কাজ বাকী আছে।

এই বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের বিবরণ আছে। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে তার প্রয়োজন না থাকায় উদ্ধৃত করা হল না। উক্ত বিবরণ থেকে কয়েকটি বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম হল বর্তমানে বাবাজী দেহস্থ থাকলে তাঁর বয়স (৫০০) পাঁচশত বৎসরের মত হবে। দ্বিতীয় হল বাবাজী মহারাজকে দেখতে উত্তর ভারতীয় রাখাল যুবকের মত ছিল। এই তথ্য শ্রীযুক্তেশ্বরজীর বিবরণের অনুকূল; যদিও এই বিবরণে যোগীরাজ শ্যামাচরণের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যের কোন উল্লেখ নেই।

শেষ দুইটি তথ্য যোগীরাজের আর এক মহাযোগী শিষ্য কেশবানন্দ পরমহংসজীর উক্তি হতে প্রাপ্ত। কেশবানন্দজীর বাবাজী মহারাজের প্রায়ই দর্শন লাভ হত। সকল শিষ্যের মতই তিনি শ্রীগুরুচরণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। যোগীরাজের জীবনের অন্তিম সময়ে তিনিই গুরুভ্রাতাদের মধ্যে গুরুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিধিমতে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ

করেননি; ব্রহ্মচারী রূপেই জীবন কাটিয়ে গেছেন। সমগ্র উত্তরভারতে—বিশেষতঃ বৃন্দাবন, হরিদ্বার তথা ঋষিকেশে সকল পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীদের কাছে তিনি যতদিন দেহস্থ ছিলেন ততদিন অবশ্য-দর্শনীয় তীর্থকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাংলায় এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তাঁকে প্রায় সকলেই পশ্চিমদেশীয় সাধু বলেই মনে করতেন। দীর্ঘ জটাজুটধারী বিশালকায় এই মহাপুরুষ যোগীশ্বর যোগীরাজের সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন। বৃন্দাবনে এবং ঋষিকেশে কাত্যায়নী মন্দির স্থাপন করে ধর্মপ্রাণ হিন্দু জনগণের এক বিশেষ উপকার সাধন করে গেছেন।—সম্ভবতঃ ১৯৪১।৪২ খ্রীস্টাব্দ হবে, হরিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা সংঘটিত হচ্ছে। প্রতি কুম্ভমেলাতেই পরমহংস কেশবানন্দজীর পৃথক পৃথক তাঁবু স্থাপিত হত, এবারও হয়েছিল। গ্রন্থকারের দুই বন্ধু কলকাতার শ্রীতিনকড়ি দে—গ্রন্থকারের আবাল্য সহপাঠী এবং ৺নলিনীমোহন মজুমদার—স্বামী সত্যানন্দজীর পঞ্চম সহোদর এবং বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী—এই কুম্ভদর্শনে যায়। তিনকড়ি ক্রিয়াবান এবং যোগীরাজ পৌত্র ৺আচার্য আনন্দমোহনের বিশেষ কৃপাপাত্র। হরিদ্বার পৌঁছে খুঁজে খুঁজে কেশবানন্দজীর আখড়া পেতে কষ্ট হয়নি। উভয়ে রাঁচী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র; পরমহংস যোগানন্দজীর স্নেহধন্য এবং সর্বোপরি ক্রিয়াপথের পথিক শুনে মহাপুরুষ পরমস্নেহে তাঁদের আপ্যায়ন করেন। তিনকড়ি ভায়া একসময় মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করেন বাবাজী মহারাজ কুম্ভমেলায় এসেছেন কিনা। কেশবানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "অন্যান্য বার এরই মধ্যেই দর্শন পেয়ে থাকি; এবার এখনও দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়নি।" ভারতের চার পুণ্যস্থানে পর্যায়ক্রমে অর্ধকুম্ভ ও পূর্ণ কুম্ভের মেলা সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং ১৯৪১।৪২ খ্রীস্টাব্দের তিন চার বৎসর পূর্বেও কেশবানন্দজী বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভ করেছিলেন তাঁর উক্ত বিবরণই তার প্রমাণ। সে বারেও নিশ্চয় দর্শন পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই; তবে বন্ধুদ্বয় ততদিন অপেক্ষা করতে পারেননি।

বাবাজী মহারাজের দেহস্থ থাকার আর এক সঙ্কেত গ্রন্থকার অবগত হয়েছে উল্লিখিত ঘটনায় ২।৩ বৎসর পূর্বে। পরমহংস যোগানন্দজীর এক ক্রিয়া শিষ্য ছিলেন কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের ৺কুমুদ দত্ত; তাঁর সহ-

ধর্মিণীও পরমহংস যোগানন্দের শিষ্য ছিলেন। কুমুদবাবুর দূর সম্পর্কীয় এক ভ্রাতা—পিতামাতার একমাত্র সন্তান, কলকাতার এক সওদাগরী ব্যাংক-এ কর্মরত, সদ্য-বিবাহিত। কলকাতায় নিজ বাড়ী, ছোট সুখী সংসার। একদিন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরার আশ্বাস স্ত্রীকে দিয়ে যুবকটি অপরাপর দিনের মত অফিস চলে যায়। কিন্তু অফিসে পোঁছামাত্র খবর পায় তাকে তক্ষুণি বাড়ী ফিরতে হবে; তাঁর স্ত্রী সিঁড়িতে পা ফসকে পড়ে মাথায় শক্ত আঘাত পেয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী যখন পৌঁছাল তখন সব শেষ হয়ে গেছে—স্ত্রী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেছে। অল্প বয়সে এই নিদারুণ বিয়োগব্যথায় যুবক উন্মাদপ্রায়। সংসারের প্রতি সকল আকর্ষণ মন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে স্থির করল কোন মহাপুরুষ মহাত্মার চরণে আশ্রয় নেবে। মনের এই প্রকার অবস্থায় একদিন কুটুম্ব কুমুদ দত্তের বাড়ি বেড়াতে আসে। সেখানে যোগানন্দজী ভারত থেকে আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর আমেরিকার প্রধান কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সাময়িকী "ইনার কালচার" (Inner Culture) পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যা দেখতে পায়। এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে যোগীরাজ শ্যামাচরণ এবং তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যগণের চিত্র অতি সুন্দর নানা রংএ ছাপা হয়েছিল। ঐ সকল চিত্র দেখতে দেখতে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর চিত্র দেখিয়ে বলে ওঠে, "আমি এই মহাপুরুষের কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করতে চাই!" তখন স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী আর নরদেহে ছিলেন না; যোগানন্দজীর ভারতে অবস্থান কালে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে দোলপূর্ণিমার পর দ্বিতীয়া তিথিতে মহাপ্রয়াণ করে গেছেন। কুমুদবাবু ও তাঁর স্ত্রী এই সংবাদ দেওয়ায় যুবকটি মনক্ষুণ্ণ হল কিন্তু পরে কেশবানন্দজীর চিত্র দেখিয়ে বলে—তা হলে এঁর কাছেই দীক্ষা নেব, তোমরা ব্যবস্থা করে দাও। তাঁরা বলেন এবিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অক্ষম, তাঁদের—ঐ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। তবে তাঁরা গ্রন্থকারের নাম করে বলেন শৈলেনদার কাছে যাও তিনি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। ঐ দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক গ্রন্থকারের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় প্রদান করে নিজের দুঃখের বিষয় জ্ঞাপন করে, এবং অনুরোধ করে যেন কেশবানন্দজীকে একটি পরিচয়পত্র দেওয়া হয় তাঁকে ক্রিয়া দীক্ষা

দান করে আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। গ্রন্থকারের সঙ্গে কেশবানন্দজীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় ছিল না। সুতরাং তাঁকে কোন পত্র দেওয়া নিরর্থক কিন্তু যুবকের মানসিক অবস্থা এবং ক্রিয়া দীক্ষা প্রাপ্তির প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে একটি উপায় স্থির করা হল। যোগীরাজের পৌত্র আবাল্য ব্রহ্মচারী এবং পিতামহের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে সমর্পিতপ্রাণ গবেষক আচার্য আনন্দমোহন লাহিড়ী তখন রাঁচীতে পৃথক এক কুটীর নির্মাণ করে একান্ত জীবনযাপন করছেন। তিনি রাঁচী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে গ্রন্থকারের শিক্ষক ছিলেন এবং গ্রন্থকারকে বিশেষ স্নেহ করতেন। যোগীরাজের সকল সমর্থ শিষ্য তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাঁকেই একটা চিঠি লিখে দেওয়া হল যেন কেশবানন্দজীকে পত্র দিয়ে অনুরোধ করেন যুবকটিকে ক্রিয়া দান করে কৃতার্থ করেন। এই পত্র হাতে নিয়ে যুবকটি রাঁচী যাওয়ার রেলের সময় জেনে সঙ্গে সঙ্গে হাওড়াগামী এক বাসে চড়ে হাওড়া যাত্রা করে। বোঝা গেল পয়সা কড়ি সঙ্গে করে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। রাঁচীতে আনন্দ দাদার সঙ্গে দেখা করে, তাঁর এক পত্র সম্বল করে সোজা বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। পরের বৃত্তান্ত প্রায় দুই সপ্তাহ পরে যুবক নিজের মুখেই জ্ঞাপন করে যখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গ্রন্থকারের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

আনন্দ দাদার সুপারিশ পত্র নিয়ে যখন বৃন্দাবনে কাত্যায়নী মন্দিরে যুবক উপস্থিত হয়, তখন পরমহংসজী বৃন্দাবনে ছিলেন না; খবর পেল ঋষিকেশ আশ্রমে আছেন। যুবক কলকাতার ছেলে, পিতামাতার অতি আদরে লালিত; কোনদিন কলকাতা ছেড়ে কোথাও যায়নি। কিন্তু তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে ঋষিকেশ নিয়ে চলল। ঋষিকেশে কেশবানন্দজীর আশ্রম খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। অপরাহ্ন বেলায় আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায় একটি ঘরে মহাপুরুষ একটি কেদারায় কতিপয় ভক্ত শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট। দূর থেকেই মহাপুরুষের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে উপবিষ্ট সকলের পিছনে বসে পড়ে। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে; কিন্তু মনে সংশয় কি জানি যদি মহাপুরুষ আশ্রয়দানে অসম্মত হন। মহাপুরুষের সঙ্গে ভক্তদের কথোপকথন শেষ হয় যখন তখন সন্ধ্যা অতীত হয়ে গেছে। একে একে যখন সকলে চলে গেল

তখন যুবক কেশবানন্দজীর সম্মুখে একা উপবিষ্ট। কম্পিত হৃদয়ে উঠে মহাপুরুষের নিকটে গিয়ে চরণে লুটিয়ে পড়ল। তার দিকে তাকাতেই যুবক নিজ পরিচয় দান করে অন্তরের আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ করে যেন তাকে ক্রিয়া দান করে কৃতার্থ করেন। সব শুনে কেশবানন্দজী উত্তর করেন, "আমি তো আজকাল ক্রিয়া দিই না! ক্রিয়া পেয়ে কেউই ক্রিয়া করে না।" অদূরে আশ্রমবাসী অনেক পশ্চিমা সাধুবেশী তাঁর শিষ্যদের দেখিয়ে বলেন, "এই যে দেখছ—সব ভ্রষ্ট যোগী, কেউ ক্রিয়া করে না।" যুবকের সকল প্রত্যাশা যেন মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কিন্তু তার উদ্দেশ্যে সে অটল। অবশেষে মহাপুরুষকে প্রণাম করে বলে, "ক্রিয়া আমাকে পেতেই হবে। আমি এখান থেকে সোজা রাণীখেত যাব, বাবাজী মহারাজের সন্ধান করব। শুনেছি বন জঙ্গলের রাস্তা, বাঘ ভাল্লুকও থাকতে পারে। আশীর্বাদ করুন যেন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।" এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার মুখে শুনতে পায় কেশবানন্দজী বিড় বিড় করে বলছেন, "সেইত আমার কাছেই ফের আসতে হবে।" অতঃপর যুবককে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আগামীকাল সকালেই প্রস্তুত হয়ে এসো, তোমাকে ক্রিয়া দেব।" শুনে যুবকের আনন্দের সীমা নেই। পরদিনই প্রভাতে সে পরমহংস কেশবানন্দজীর দ্বারা ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হয়। এর পর এক জটাজুটধারী সাধু শিষ্যের সঙ্গে তাকে তিনদিন এক নির্জন গুহায় বাস করতে হয়। এই সময় শ্রীগুরুর বহু অলৌকিক শক্তিরও পরিচয় পেয়ে ধন্য হয়।

পরমহংস কেশবানন্দজী সম্পর্কে উক্ত ঘটনাদ্বয়ের এই কারণে উল্লেখ করা হল যে বাবাজী মহারাজ বর্তমান শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগেও দেহস্থ ছিলেন তার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে। যুবকটি রাণীখেতে গেলে যে কোন প্রকারে পুনরায় তাঁর কাছেই প্রেরিত হবে—তিনি জানান। ক্রিয়া-যোগের অন্যান্য গুরুদের বেলায়ও এই প্রকার অনেক ঘটনা ঘটেছে। বর্ধমান শহরের উন্নত সাধক যোগী, সুধাকর গ্রন্থাবলী প্রণেতা কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বারা ক্রিয়াযোগে আকৃষ্ট হন। ক্রিয়া দীক্ষা লাভের মানসে তিনি যোগীরাজ শ্যামাচরণকে কাশীধাম যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে পত্র দেন। যোগীরাজ উত্তরে জানান "তুমি পঞ্চাননের কাছে যেও।"

শোনা যায় আচার্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ও প্রায় বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভ করতেন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি কিছু লিখে বা বলে রেখে যাননি। দেওঘরে তাঁর প্রশস্ত ৫২ বিঘা উদ্যানের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর তৈরী করেছিলেন—মূল বাসগৃহ থেকে বেশ দূরে। শোনা যায় দিন বা রাত্রির যে কোন সময়ে ভট্টাচার্য মহাশয় একা ঐ কুটীরে চলে যেতেন এবং দীর্ঘ সময় কাটিয়ে আসতেন। কখনও কখনও নাকি নিম্নস্বরে কথোপকথনের আওয়াজও শোনা যেত। সেখানকার বসবাসকারী সকল শিষ্য মনে করতেন ঐ সময় আচার্যজী বাবাজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেন।

পরমহংস যোগানন্দজী বাবাজী মহারাজকে দর্শনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে এক প্রকার গুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলায় যান। কিন্তু বাবাজী মহারাজের দর্শনে বিফল মনোরথ হন। অবশ্য অন্য এক মহাক্ষতি হল এই যে কুম্ভমেলা থেকে ফিরে আর জীবিত অবস্থায় গুরুদেবকে দেখতে পাননি। পরে জানা যায় যোগানন্দজী দাবী করেছেন যে ধ্যান-সমাহিত অবস্থায় একবার বাবাজী মহারাজের মূর্তি দেখেছেন। এবং তাঁর ঐ বিবরণ অনুসারেই তাঁর ভ্রাতা সনন্দলাল এক চিত্র অঙ্কন করেন—যে চিত্র বাবাজী মহারাজের চিত্র বলেই প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু এই চিত্রের সঙ্গে উল্লিখিত শ্রীযুক্তেশ্বরজী, আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ তথা পরমহংস প্রণবানন্দজী প্রদত্ত বিবরণের সঙ্গে কোন মিল নেই।

যোগানন্দজীর আমেরিকাবাসী ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা রাণীখেতে এক যাত্রী নিবাসও স্থাপিত হয়েছে। বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভের মানসে দেশ ও বিদেশের বহু যাত্রী—ক্রিয়াযোগ ভক্ত—তথায় যান। এর মধ্যে কেউ কেউ—বেশীর ভাগই দেশী ব্যক্তি—বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভ করারও দাবী জাহির করেন। এই সকল দাবী যে খেলো এবং অভিসন্ধিমূলক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। একটি মূল কথা মনে রাখা দরকার যে কোন ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করার নিমিত্ত বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভ সম্ভব নয়; সাধকের প্রয়োজন বুঝেই কৃপাময় ত্রিকালদর্শী বাবাজী মহারাজ দর্শন দানে ধন্য করেন। কোন এক বাবাকে বাবাজী মহারাজ বলে যে

অপপ্রচার চলছে, কোন ভক্তিমান ক্রিয়াবানের তাতে উৎসুক হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই সব ভূয়া। এবং স্বার্থপ্রণোদিত অন্যায় পাপ প্রচার।

যোগীরাজের প্রাচীন শিষ্যদের মধ্যে যুগের বিখ্যাত সন্ত-ভক্ত কবীরের সঙ্গে যোগীরাজ শ্যামাচরণ তথা বাবাজী মহারাজের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু জল্পনা কল্পনা ছিল। বিশেষ লক্ষণীয় যে যোগীরাজ শ্যামাচরণই প্রথম মহাত্মা যিনি ভক্ত কবীরের দোঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে গেছেন। কবীর গীতারও গূঢ় আধ্যাত্মিক নির্দেশ বিষয়ে হিন্দিতে ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ঐ হিন্দি ব্যাখ্যা বাংলায় রূপান্তরিত করে ক্রিয়া সাধকগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। প্রাচীন উন্নত ক্রিয়াবানগণের অনেকেই মনে করতেন মহাত্মা কবীর মহারাজ বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎ শিষ্য অথবা গুরুভাই ছিলেন। অবশ্য এবিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য কিছু নেই। বাবাজী মহারাজ যে কবীর, নানক প্রভৃতি মহাজনগণের অন্ততঃ সমগোত্রীয় ছিলেন তাতে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ নেই। তৎ প্রদত্ত অমূল্য এবং অমোঘ *ক্রিয়াযোগ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের কল্যাণের জন্য* উদ্ভাবিত। তাঁর সম্বন্ধে হাল্কা মন্তব্য কেবল অমার্জনীয়ই নয় ক্ষতিকর—ক্ষতিকর অধিক তাদের পক্ষেই যারা এ কাজে হাত লাগাবে।

ত্রিকালদর্শী, সর্বশক্তিধর, মহাযোগী, মহামানব—অলোকসামান্য পুরুষ বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়,—নগণ্য, অধম, অকিঞ্চন এক অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রন্থকারের মত ভক্তের পক্ষে তো নয়ই। পরন্তু মহামুনি বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে যে সকল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি গাঁজাখোরী 'কহানী' প্রচার আরম্ভ করেছে—তার বিরুদ্ধেই এই সামান্য কয়েক পংক্তি লেখার উদ্দেশ্য। হে ক্রিয়াযোগের আদিগুরু, বিশ্বের আপামর জনগণের আধ্যাত্মিক জীবনের আলোকবর্তিকা, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিপালক—প্রভু ! তোমার দর্শনলাভ নাই বা হল—তুমি যে দেহস্থ থেকে আধ্যাত্মিক রশ্মি বিকিরণ করে সকল সাধককে সঞ্জীবিত রেখেছ—এই কৃপাই যেন চিরস্থায়ী হয়। তোমায় কোটি কোটি প্রণিপাত।

পুস্তক পরিচিতি (Bibliography)

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা : স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি প্রণীত।

২। „ „ „ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ „।

৩। „ „ „ ডাঃ ভগবান দাস ও এনিবেসান্ত।

৪। „ „ „ মতিলাল রায় „।

৫। কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন : সাংখ্যাচার্য শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্যক প্রণীত।

৬। পাতঞ্জল যোগদর্শন : ৺কালীবরবেদান্তবাগীশ „।

৭। কৈবল্যদর্শনম্-হোলিসায়েন্স : সাধু সভাপতি স্বামীজিউ মহারাজ।

৮। যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী : স্বামী সত্যানন্দ গিরি „।

৯। শ্রীমৎস্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি : „ „।

১০। প্রণব গীতা : পরমহংস স্বামী প্রণবানন্দ গিরি।

১১। যিশুখ্রীস্টের অপ্রকাশিত জীবন অধ্যায় তথা সন্তঈশার জীবনী } নিকোলাস নোটোবীচ „।

১২। হিন্দুধর্মের আমেরিকা অভিযান (Hinduism invades America) } ওয়েণ্ডেল টমাস „।

১৩। কাশ্মীর ও তিব্বতে : স্বামী অভেদানন্দ „।

১৪। মাসীহ হিন্দুস্তান মে : হজরত মির্জা গুলাম আহমদ „।

১৫। সপ্তশ্লোকী গীতা : পরমহংস স্বামী প্রণবানন্দ গিরি। (৺জ্ঞানেন্দ্রকুমার মুখার্জী কর্তৃক অনূদিত)

১৬। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—উত্তর গীতা

১৭। মনুস্মৃতি